প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

প্রকাশক :
ময়ুখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
শ্রীশিশির কুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০বি, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা-৭০০০০৭

গৌড়চন্দ্রিকা

বিশ্ববিখ্যাত সায়েন্স-ফিকশন গল্পকাহিনী বলতে কিন্তু শুধু এই সংকলনে প্রকাশিত সাতটি কাহিনীই নয়, বলা বাহুল্য সংখ্যায় তারা বহু। সাতটিকে চয়ন করা হয়েছে, ফ্রেঞ্চ, আমেরিকান, ইংলিশ এবং রাশিয়ান সাহিত্য থেকে, সায়েন্স-ফিকশন সাহিত্যকে পুষ্ট করেছেন এই সব দেশের গল্পকারেরাই।

তাই বিখ্যাত বিদেশী সায়েন্স-ফিকশনের অনুবাদের প্রয়োজন আছে—বিশেষ করে SF অর্থাৎ সায়েন্স-ফিকশন সম্বন্ধে যে দেশে কোনো সম্যক ধারণাই নেই, সেই দেশে।

পাঠকরা কিন্তু অনুবাদ সম্বন্ধে দু'ভাগ হয়ে গেছেন। একদল চান অনুবাদ। আর একদল অনুবাদকে দেখেন অচ্ছুতের মতই।

কিন্তু একথা মানতেই হবে যে ও দেশের বিজ্ঞান-কাহিনী যে আজ কতদূর অগ্রসর হয়েছে, তারই পরিচয় মেলে এক-একটি অনুবাদের মধ্যে। বিভিন্ন রসের বিভিন্ন আঙ্গিকের বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন নমুনা অনুবাদের মাধ্যমে রসিকজনের মধ্যে উপস্থাপিত হলে পাঠকমহল কল্পনা-সাহিত্যের হাজার রূপ দেখে বিস্ময়ে আনন্দে বিমুগ্ধ হয়ে যাবেন।

তবে হ্যাঁ, অনুবাদ খুবই স্বচ্ছন্দ, সুন্দর, অনাড়ষ্ট হওয়া চাই। বিভিন্ন সাহিত্যের মণিকোঠা থেকে বিচিত্র রত্নরাশি এদেশের সাহিত্যে এনে সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করে তোলার জন্যে অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি, তা আর না বললেও চলে। কিন্তু এই অনুবাদ সাহিত্যই এদেশে এত অবহেলিত বোধ করি ভালো অনুবাদ কাহিনী রচিত হয়নি বলে। যে সাহিত্যে পদে পদে হোঁচট খেতে হয়, সে সাহিত্য কখনই রসোত্তীর্ণ হতে পারে না। অনুবাদ করা কঠিন, কিন্তু সে তুলনায় বাহবা কম, কাজেই প্রতিভাধর কেউই এ পথে সাধনা করেন নি। তবে আশার কথা, ইদানীং যে ক'জনের প্রাণোজ্জ্বল লেখনী স্পর্শে ক্রমে ক্রমে সুন্দর স্বচ্ছ সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হচ্ছে আজকের অনুবাদ, অদ্রীশ বর্ধন তাঁদের অন্যতম।

ইনি নতুন এবং পুরোণো—দু'ধরনের লেখাই অনুবাদ করে দেখিয়েছেন যুগে-যুগে সায়েন্স-ফিকশন কিভাবে বিবর্তিত হয়ে চলেছে।

প্রকাশক

সূচীপত্র

ডক্‌টর জেকিল আর মিষ্টার হাইড

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

আইনবিদ মিষ্টার আটারসন অত্যন্ত নীরস প্রকৃতির মানুষ। রসকষহীন মুখে হাসির ছিটেফোঁটাও দেখা যায় না কস্মিনকালে। আবেগ অনুভূতির ছোঁয়াও তাঁর নিরুত্তাপ মুখের পরতে পরতে কোনোদিন লেগেছিল কিনা তা বলা মুস্কিল। তবুও কিন্তু ভালবাসতে ইচ্ছে যায় ভদ্রলোককে। সব রকম মানুষের সঙ্গে মানিয়ে চলার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল তাঁর। অবশ্য বন্ধুবান্ধবদের বেশীর ভাগই তাঁর পরিজন। অনেকের সাথে অন্তরঙ্গতাও দীর্ঘদিনের। আইভি লতার মতই সময়ের ওপর ভর দিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে তাঁর স্নেহ ভালবাসা। কাজে কাজেই মিষ্টার রিচার্ড এনফিল্ডের সাথে তাঁর বন্ধুত্বের মূলেও ছিল দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা। শহরে মিষ্টার এনফিল্ডকে চিনতেন না এমন লোক পাওয়া দুষ্কর।

দুজনের মধ্যে মিল ছিল না এতটুকুও। কোনো বিষয়েতেও একমত হতে পারতেন না দুজনে। অথচ প্রতি রোববার এই দুই ভদ্রলোক একসাথে বেরুতেন নতুন নতুন অভিযানে। বেড়াতে বেড়াতে চলে যেতেন অনেক দূর। একদিন এইভাবে ওঁরা এসে পড়লেন লণ্ডনের একটি কর্মব্যস্ত মহলের রাস্তায়। ছোট্ট রাস্তা, দিব্বি নিরিবিলি। হট্টগোলের নাম গন্ধও নেই। অথচ হপ্তার অন্যান্য দিনগুলোতে এইখানেই বসে যায় হরেকরকমের বেসাতের লেনদেন। বাসিন্দারা প্রত্যেকেই দু পয়সা করেছে। এবং সেই প্রাচুর্যের সম্ভার এমনভাবে থরে থরে সাজানো ছিল দোকানগুলোর সামনে যে দেখলেই মনে হয় যেন সারি সারি লাস্যময়ী সেল্‌স গার্লরা মদির হাসি ছড়িয়ে হাতছানি দিচ্ছে পথচারীদের।

কোণের দিক থেকে দুটো বাড়ী পেরিয়ে আসার পর বাঁ দিকের পুবমুখো সারিটা যেন হঠাৎ ভেঙে গেছে ছোট্ট একটা প্রাঙ্গনের অনধিকার প্রবেশের ফলে। আর সেই প্রাঙ্গনের ওপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে কুটিল চেহারার একটা বাড়ী। সামনের অংশটা যেন হুমড়ি খেয়ে পড়তে চাইছে চপলা রাস্তার ওপর। দোতলা বাড়ী। জানলা-টানলার বালাই নেই। নিচের তলায় একটা দরজা। আর ঠিক তার ওপরেই চ্যাটালো কপালের মতই একটা বিরঙ দেওয়াল ছাড়া আর কিছুই নেই। দীর্ঘদিনের অবহেলায় অগুন্তি ছাপ বুকে নিয়ে যেন আরও ভয়ংকর হয়ে উঠেছে তার ইট, কাঠ, পাথরের চেহারা।

রাস্তার অপর প্রান্তে দাঁড়িয়েছিলেন মিষ্টার এনফিল্ড এবং মিষ্টার আটারসন। প্রাঙ্গনের মুখোমুখি হতেই বেতের ছড়ি তুলে দরজাটা দেখিয়ে মিষ্টার এনফিল্ড বললেন, 'একটা অদ্ভুত কাহিনীর সঙ্গে জড়িত হয়ে দরজাটা আমার মনের মধ্যে গেঁথে গেছে।'

'বটে! কি কাহিনী শুনি?' বললেন মিষ্টার আটারসন।

'শীতকালের ভোর। প্রায় তিনটে বাজে। শহরের এমন একটা জায়গা দিয়ে বাড়ী ফিরছিলাম যে অঞ্চলে সরাসরি ল্যাম্পপোষ্ট ছাড়া আর বিশেষ কিছু দেখা যায় না। হঠাৎ দুটো মূর্তি দেখলাম। একজন খর্বাকার মানুষ হন্ হন্ করে এগিয়ে চলেছে পুবদিকে। আর একটা বছর আট-দশ বয়সের ছোট্ট মেয়ে পাশের সরু গলি থেকে তীর বেগে ছুটে আসছে। গলির মুখেই হুমড়ি খেয়ে পড়লো একজন আর একজনের ওপর। আর তারপরেই মশায় ঘটলো সেই ভয়ানক কাণ্ড। লোকটা দিব্বি শান্তভাবে মেয়েটাকে মাড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে গেল। আর তারস্বরে কান্না জুড়ে দিলে মেয়েটা।

'শুনে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু দেখেই আমার মাথায় রক্ত চড়ে গেল। এ কি মানুষ, না পশু? হুংকার দিয়ে তীরবেগে দৌড়ে গিয়ে কলার চেপে ধরলাম লোকটার! তারপর হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে এলাম মেঝের ওপর পড়ে থাকা মেয়েটির কাছে।

ইতিমধ্যে একটা ভীড় জমে গিয়েছিল মেয়েটির আশেপাশে। লোকটা কিন্তু বাধা দেবার এতটুকু চেষ্টা করলে না। হাবেভাবে উত্তেজনা উদ্বেগের ছায়াটুকুও দেখলাম না। তবে আমি কলার পাকড়ে ধরার পর আমার দিকে এমন এক ঝলক বরফ-ঠাণ্ডা চাহনি ছুঁড়লে যে কুল-কুল করে ঘাম দাঁড়িয়ে গেল কপালের ওপর। কি কুৎসিত সেই দৃষ্টি। যাই হোক, লোকজন যারা ভীড় করেছিল, তারা আত্মীয়-স্বজন। দেখতে দেখতে ডাক্তারও ছুটে এলেন অকুস্থলে। দেখা গেল, মেয়েটির তেমন কিছু চোট লাগে নি। শুধু যা দারুণ ভয়েতেই কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। ঘটনাটা এখানেই শেষ হওয়া উচিত ছিল।

'কিন্তু লোকটাকে প্রথমবার দেখার পর থেকেই ঘৃণায় গা রি রি করছিল আমার। মেয়েরাও ক্ষেপে গিয়েছিল। কি কষ্টে যে তাদের ঠেকিয়ে রাখতে হয়েছিল, তা ভগবানই জানেন। সুন্দর সুন্দর মুখে ঘৃণার এ রকম নিঃসীম অভিব্যক্তি আমি আর কখনো দেখিনি। ওদের ঠিক মাঝেই দাঁড়িয়েছিল সেই শয়তান লোকটা। নিরুত্তাপ নিরুত্তেজ মুখের পরতে পরতে জিঘাংসার ক্রুরতা। শয়তানই বটে। কেননা ভয় পেলেও সেরকম কোন চিহ্নই তার মুখে ফুটে উঠতে দেখলাম না। নির্বিকার ভাবে ঐ চেঁচামেচির মধ্যেই বলে উঠল সে—'যদি এই তালে দুপয়সা করে নিতে চান তো বলুন কত চাই।' মেয়েটির ফ্যামিলির তরফ থেকে আমরা একশো পাউণ্ড দাবী করলাম। লোকটি রাজী হলো সঙ্গে সঙ্গে। এর পর টাকা আদায় করার পালা। বলুন তো এবার সে কোথায় নিয়ে এল আমাদের? ঐ দরজার সামনে। পকেট থেকে ফস করে একটা চাবী বার করে দরজা খুলে গট গট করে ঢুকে গেল ভেতরে। কিছুক্ষণ পরেই বেরিয়ে এল। দশ পাউণ্ড নগদ দিলে। আর বাকীটা দিলে চেকে। চেকে যার নাম সই ছিল, তার নাম এখন আমি উল্লেখ করছি না, যদিও এই নামটাই আমার এই কাহিনীর

একটা বিরাট অংশ। সইটা জাল কি না সে বিষয়ে তীব্র সন্দেহ হলো আমার। লোকটা তখন নাক ঠোঁট নিষ্ঠুরভাবে কুঁচকে বললে তাকে যদি আমাদের অবিশ্বাস হয়, তাহলে সকালেই সে আমাদের সঙ্গে ব্যাঙ্কে যাবে। মেয়েটির বাবা আর তাকে নিয়ে আমি আমার চেম্বারে এলাম। বাকী রাতটা সেখানেই কাটানোর পর চেক নিয়ে সবাই মিলে ব্যাঙ্কে গেলাম। দেখলাম—না, জোচ্চুরি নয়। আসল লোক সই করেছেন।'

'ছিঃ, ছিঃ,' বলে উঠলেন মিষ্টার আটারসন।

মিষ্টার এনফিল্ড বললেন—'বুঝেছি, বুঝেছি, আপনি যা ভাবছেন, তা আমি বুঝেছি। সত্যিই খুব খারাপ গল্প। লোকটা কিন্তু এমনই কদর্য আর জঘন্য যে কেউই তাকে বিশ্বাস করে উঠতে পারত না। আর চেকে যিনি সই করেছেন, তিনি তো সমাজের একজন রীতিমত গণ্যমান্য ব্যক্তি। আমার তো মনে হয় ব্ল্যাকমেল। নিশ্চয় কোনো ছেলেমানুষি অন্যায়ের খেসারৎ দিতে হচ্ছে এখনও। সেই জন্যেই বাড়ীটার নাম দিয়েছি ব্ল্যাকমেল হাউস।'

'বাড়ীটা আমি এর আগেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি। বাড়ী বলে মনেই হয় না। আর কোনো দরজা নেই। আমার গল্পের সেই বিদিগিচ্ছিরি লোকটা ছাড়া ঐ দরজা দিয়ে আর কেউ যাওয়া আসাও করে না। জানালাগুলো যদিও বন্ধ, তবুও সবসময়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চিমনি থেকেও মোটামুটি ধোঁয়ার আভাস পাওয়া যায়। কাজে কাজেই ভেতরে নিশ্চয় কেউ থাকে।'

মিষ্টার আটারসন শুধোলেন—'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই আমি। বাচ্ছাটাকে যে পশুটা মাড়িয়ে গিয়েছিল, তার নাম কি?'

'হাইড।'

'হুম। দেখতে কিরকম?'

'বোঝানো মুস্কিল। চেহারার মধ্যে এমন একটা গলতি আছে, এমন একটা ঘৃণাকারজনক ভয়ানক কদর্যতা আছে যে বলে বোঝানো

যায় না। কোনো মানুষকে দেখে এমন ঘৃণা অনুভব করিনি আমি। তবুও লোকটার চেহারার বর্ণনা দিতে পারছি না আমি। না, না, স্মৃতিশক্তির অভাব নয়। কেন না, এই মুহূর্তেই মনের চোখে পরিষ্কার দেখছি তাকে।'

গুম হয়ে তাঁর চিরকুমার ভবনে ফিরে এলেন মিষ্টার আটারসন। সিন্দুক খুলে গোপনতম কন্দর থেকে বার করলেন একটা খাম। খামের মধ্যে ছিল একটা দলিল। ওপরে লেখা 'ডক্টর জেকিলের উইল'। ভুরু কপাল কুঁচকে দলিলটা বার করে পড়তে বসলেন তিনি। ডক্টর জেকিলের নিজের হাতের লেখা দলিল। কেন না, এ দলিল লিখতে এবং লেখায় সাহায্য করতে অস্বীকার করেছিলেন মিষ্টার আটারসন। দলিলে লেখা ছিল, হেনরী জেকিল, এম. ডি., ডি. সি. এল., এল এল. ডি., এফ. আর. এস ইত্যাদির মৃত্যুর পর তাঁর স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হবেন তাঁর পরম উপকারী বন্ধু এডোয়ার্ড হাইড। শুধু তাই নয় যদি কোনো রহস্যজনক কারণে তিন মাসের বেশী অন্তর্হিত হন ডক্টর জেকিল, তাহলেও আর অযথা দেরি না করে ডক্টর জেকিলের সব কিছুর মালিক হয়ে বসবেন এডোয়ার্ড হাইড। দীর্ঘদিন ধরেই এই দলিলটা মিষ্টার আটারসনের চোখের বালি হয়ে উঠেছিল।

'ভেবেছিলাম নেহাতই পাগলামো', মেজাজ-বিগড়ে-দেওয়া দলিলটা সিন্দুকের মধ্যে তুলে রাখতে রাখতে আপন মনেই বললেন উনি—'এখন তো দেখছি মান সম্মান রাখাই দায়।'

বলে ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিলেন মিষ্টার আটারসন। ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে নিয়ে রওনা হলেন ক্যাভেণ্ডিস স্কোয়ারের দিকে। লণ্ডন শহরের ওষুধকেন্দ্র এই অঞ্চলেই মস্ত ডাক্তার ল্যানিওনের চেম্বার এবং বাড়ী। ডক্টর ল্যানিওন তাঁর বন্ধু এবং এ ব্যাপারে আলোকপাত করতে পারেন একমাত্র তিনিই।

একলা বসে বসে মদ্যপান করছিলেন ডক্টর ল্যানিওন। প্রাণ-

খোলা জীবনীশক্তিতে ভরপুর মানুষটির চুল-টুল অকালেই পেকে শাদা হয়ে গিয়েছে। স্বাস্থ্যবান পুরুষ। লাল-লাল মুখ এবং দিব্বি আমুদে প্রকৃতি। দুহাত জড়িয়ে ধরে মিষ্টার আটারসনকে অভ্যর্থনা জানালেন তিনি।

মিষ্টার আটারসম বললেন—'ল্যানিওন, আমাদের দুজনেরই বন্ধু হেনরী জেকিল সম্পর্কে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। হাইড নামে ওর কোনো গলগ্রহের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে কি?'

'হাইড?' প্রতিধ্বনি করেন ল্যানিওন। 'না। কোনোদিন নামই শুনি নি। কিন্তু জেকিলের সঙ্গেও তো বহুদিন দেখা হয় নি আমার।'

এর বেশী আর খবর পাওয়া গেল না ল্যানিওনের কাছে। বাড়ী ফিরে এলেন মিষ্টার আটারসন। অনেক ভেবে চিন্তে স্থির করলেন এই হাইড লোকটার সাথে তাঁর একবার মোলাকাৎ হওয়া দরকার। নিদেন পক্ষে চেহারাটা তো দেখা দরকার।

সেইদিন থেকে শিকারী কুকুরের মত দোকান পশারীতে ভরা রাস্তার সেই দরজার ওপর নজর রাখলেন মিষ্টার আটারসন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পুরস্কারও পেলেন হাতে হাতে। দিব্বি পরিষ্কার রাত সেদিন। আচম্বিতে শোনা গেল দূর থেকে এগিয়ে আসা পায়ের শব্দ। মোড় ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে জোরালো হয়ে উঠল তা এবং মিষ্টার আটারসনের সামনে দিয়েই সাদাসিদে পোশাক পরা খর্বাকার একটি লোক হন হন করে এগিয়ে গেল সোজা সেই দরজার দিকে—যাবার সময়ে পকেট থেকে বার করলো একটা চাবি।

কয়েক পা এগিয়ে গেলেন মিষ্টার আটারসন—'মিষ্টার হাইড নিশ্চয়?'

সাপের মত চাপা শব্দে নিঃশ্বাস টেনে নিয়েই কেঁচোর মত কুঁচকে পিছু হটে গেল মিষ্টার হাইড। কিন্তু এ আতংক ক্ষণিকের জন্যে। পরমুহূর্তেই নিষ্কম্প স্বরে শুধালে সে—'আমার নাম। কি চান আপনি?'

'আমার নাম আটারসন—মিষ্টার জেকিলের একজন পুরোনো বন্ধু। তাঁর কাছেই শুনেছি আপনার কথা।'

'জেকিল?' দপ করে প্রচণ্ড রাগে জ্বলে উঠে চেঁচিয়ে উঠল মিষ্টার হাইড। 'কখনই বলে নি সে। বেরিয়ে যান আমার সামনে থেকে।'

গন গনে চোখের বন্য দৃষ্টির শলা দিয়ে যেন মিষ্টার আটারসনকে বিঁধে ফেলে মিষ্টার হাইড। তারপর এক ঝটকায় তাঁকে সরিয়ে দিয়ে সাঁৎ করে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় এগিয়ে গিয়ে চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলেই অদৃশ্য হয়ে গেল ভেতরে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন আইনবিদ মিষ্টার আটারসন। তারপর অশান্ত অন্তরে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেন মোড়ের দিকে। মোড়ের মাথাতে দাঁড়িয়েছিল একটা জুড়ি গাড়ী। বাড়ীগুলোও সেকেলে আমলের। একটা বিশেষ দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন মিষ্টার আটারসন। বৈভবের ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে বাড়ীটার সারা গায়ে।

টোকা মারতেই বাটলার উঁকি দিলে দরজার ফাঁক দিয়ে। মিষ্টার আটারসন শুধোলেন—'পল, মিষ্টার জেকিল বাড়ীতে আছেন? এইমাত্র তাঁর বন্ধু মিষ্টার হাইডকে পুরোনো শব ব্যবচ্ছেদ ঘরের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখলাম।'

'না স্যার, মিষ্টার জেকিল বাড়ী নেই। মিষ্টার হাইডের কাছে একটা চাবি আছে। উনি প্রায় আসেন কিনা।'

আর কোন কথা না বলে মনের ওপর বিশমণি বোঝা নিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা হলেন মিষ্টার আটারসন।

*   *   *

বছরখানেক পরে একটা অসাধরণ নৃশংস হত্যাকাণ্ডে চমকে উঠল গোটা লণ্ডন শহর। খুঁটিনাটি খুব বিশেষ না পাওয়া গেলেও যা শোনা গেল তাতেই বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। সে রাত্তে আকাশ

পরিষ্কার—মেঘের উপদ্রব মোটেই ছিল না। ওপর তলার জানলায় দাঁড়িয়েছিল একজন পরিচারিকা। আচমকা সে দেখলে একজন সাদা চুল বুড়ো মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে আর একজন বেজায় বেঁটে ভদ্রলোকের দিকে। শেষোক্ত ভদ্রলোকও বুড়ো মানুষটির দিকে যাচ্ছিলেন। কাছাকাছি হতেই বুড়ো মানুষটি কি জিজ্ঞেস করলেন —সম্ভবত পথের হদিস। বেঁটে ভদ্রলোকটিকে পরিচারিকা চিনতে পেরেছিল। নাম তার মিষ্টার হাইড। কর্তার কাছে একবার এসেছিল ভদ্রলোকটি। একটা ভারী বেতের ছড়ি ছিল তার হাতে। ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে পথ চলছিল মিঃ হাইড। বুড়ো মানুষটির অনুরোধ শুনে উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক, প্রচণ্ড রাগে নিমেষ মধ্যে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল সে এবং মাটির ওপর সজোরে লাথি মেরে বোঁ করে ছড়িটাকে ঘুরিয়ে নিলে মাথার ওপর।

বুড়ো মানুষটি আহত হয়েছিলেন এই রকম অভদ্র ব্যবহারে। এক পা পিছিয়ে এসে অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন তিনি মিঃ হাইডের দিকে। আর ঠিক তখনি যেন ক্ষেপে গেল মিঃ হাইড। দমাস করে ছড়ির এক ঘায়ে বুড়ো মানুষটিকে পেড়ে ফেললে মাটির ওপর। পরমুহূর্তে বানরের মত অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় লাফিয়ে উঠলেন ভূপতিত দেহটির ওপর এবং সেই অবস্থাতেই দেহের সমস্ত শক্তি উজাড় করে ছড়ি দিয়ে পিটিয়ে চলল বুড়ো মানুষটাকে। স্পষ্ট শোনা গেল লাথি আর লাঠির সেই প্রচণ্ড ঘায়ে মড় মড় করে ভেঙে যাচ্ছে দেহের হাড়গুলো। উঃ সে কি ভয়ানক দৃশ্য! পরিচারিকাটি আর সহ্য করতে পারলে না। এই পর্যন্ত দেখেই অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝের ওপর। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে আসার পর ডেকে পাঠালে পুলিশকে।

হত্যাকারী তখন অন্তর্হিত হয়েছে। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে থেঁতলানো লাশটি তখনো পড়েছিল। আর ছিল লাঠিটা—সমস্ত অংশটা নয়—খানিকটা ভাঙা টুকরো। হাতলের দিকটা খুনীর

হাতেই থেকে গিয়েছে। ভাঙা টুকরো থেকেই বোঝা গেল অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য আর শক্ত কাঠ দিয়ে তা তৈরী। নিহত বৃদ্ধের দেহের ওপর পড়েছিল আরও একটা জিনিস। একটা চিঠি। খামের ওপর নাম লেখা রয়েছে মিঃ আটারসনের। সম্ভবত ডাকবাক্সে ফেলার জন্যেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

আইনবিদ মিঃ আটারসনকে তলব করা হলো। মৃতব্যক্তিকেও সনাক্ত করা হলো। স্যার ড্যানভার্স ক্যারু—লণ্ডন শহরে হেন লোক নেই যে তাঁকে চেনে না এবং ভালবাসে না। পরিচারিকার কাছ থেকে হত্যাকারীর যে দৈহিক বর্ণনা পাওয়া গিয়েছিল, মিঃ আটারসন তা শুনলেন পুলিশ অফিসারের মুখে। তারপর ডক্টর জেকিলের উইল থেকে মিষ্টার হাইডের ঠিকানা বার করে পুলিশ অফিসারকে নিয়ে আইনবিদ রওনা হলেন সোহো অঞ্চলে সেই ঠিকানা মত বাড়ীতে হাজির হতে। লণ্ডন শহরের অত্যন্ত নোংরা দিক এই সোহো। অপরিচ্ছন্ন, বিষাদময়, কর্দমাক্ত এবং লোকজনও নীচু স্তরের। হোটেল রেঁস্তোরার শ্রী দেখেই গা শিউরে ওঠে, মনে হয় যেন দুঃস্বপ্নের রাজ্যে হাজির হয়েছি। ছেড়া ময়লা পোশাক পরে দরজার কাছে ভিড় করে দাঁড়ালো বিভিন্ন জাতির ছেলেবুড়োরা, মেয়েরাও হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল পুলিশ দেখে। খুঁজতে খুঁজতে একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন মিঃ আটারসন এবং পুলিশ অফিসার। এই হলো ডক্টর হেনরী জেকিলের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র এবং তাঁর আড়াই লক্ষ পাউণ্ডের একমাত্র উত্তরাধিকারী মিঃ হাইডের নিবাস।

দরজা খুলে দিল মুখে শয়তানি বুদ্ধি মাখা একজন স্ত্রীলোক। মিঃ হাইড বাড়ী নেই। অস্বাভাবিক কিছু নয়। লোকটার স্বভাবই নাকি এই রকম—ঘড়ি ধরে কোন কাজই সে করে না।

মিঃ আটারসন বললেন—'তাঁর ঘরটা আমরা দেখতে চাই। ইনি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টর নিউকম।'

দপ করে দুষ্ট আনন্দের আভায় নেচে উঠল স্ত্রীলোকটার কুৎকুতে চোখদুটো—'বটে। ঝামেলায় পড়েছে তাহলে। কি করেছে সে?'

ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে দৃষ্টি বিনিময় করলেন মিঃ আটারসন আর ইন্সপেক্টর নিউকম। বাড়ীর মধ্যে মাত্র দুটো ঘর নিয়ে থাকত মিঃ হাইড। দুটো ঘরই সুন্দরভাবে সাজানো! বিলাসবহুল আসবাবপত্রের মধ্যে সূক্ষ্ম রুচির ছাপ পাওয়া যায়। একটা আলমারী বোঝাই শুধু মদ। প্লেটগুলো রুপোর। কার্পেটের রঙ এবং বাহারের দিকে চোখ দিলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু সেই মুহূর্তে গোটা ঘরটার ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে। যেন অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে এলোপাতারি লুঠপাট চালিয়ে গিয়েছে একদল লুঠেরা। জামা কাপড় মেঝের ওপর ছড়িয়ে, ড্রয়ারগুলো খোলা, চুল্লীর মধ্যে পড়ে একগাদা ধূসর ছাই। অঙ্গারের ভেতর থেকে আধপোড়া একটা চেকবই টেনে বার করলেন ইন্সপেক্টর। দরজার পাল্লার পেছনে পাওয়া গেল একটা ভাঙা ছড়ির ওপরের দিকের আধখানা। ব্যাঙ্কে খোঁজ নিয়ে জানা গেল কয়েক হাজার পাউণ্ড জমা রয়েছে হাইডের খাতে।

খুশী হলেন ইন্সপেক্টর। বললেন—'মশাই, এবার পাওয়া গেছে লোকটাকে। টাকাই মানুষের জীবন। এখন শুধু চুপচাপ অপেক্ষা করা—একদিন না একদিন সে ব্যাঙ্কে আসবেই। তারপর লোহার বালা পরাতে আর কতক্ষণ!'

* * *

শেষ বিকেল। ডক্টর জেকিলের দরজা পেরানোর পর মিঃ আটারসনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল বাটলার পুল। রান্নাঘরের ভেতর দিয়ে উঠোন, তারপর শবব্যবচ্ছেদঘর। ঘরের প্রান্তে একসারি সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। সিঁড়ি শেষ হয়েছে লাল পর্দা ঢাকা একটা দরজার সামনে। পর্দা তুলে ডক্টরের ঘরে প্রবেশ করলেন মিষ্টার আটারসন। মস্ত বড় ঘর। দাউ দাউ করে

আগুন জ্বলছিল চুল্লীতে। উত্তাপের আমেজটুকু সারা অঙ্গ দিয়ে উপলব্ধি করার জন্যেই চুল্লীর একেবারে কাছটিতে বসেছিলেন ডক্টর জেকিল। বছর পঞ্চাশ বয়স তাঁর। মসৃণ ভারীমুখ। সে মুখে এখন যেন মৃত্যুর পাণ্ডাস রঙ নেমে এসেছে। আবেগহীন ভাবে হাত বাড়িয়ে মিঃ আটারসনকে অভ্যর্থনা জানালেন ডক্টর জেকিল। ভাবখানা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও অভ্যর্থনা জানাতে হচ্ছে।

পুল ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর মিঃ আটারসন শুধোলেন—'খবরটা শুনেছো ?'

থরথর কেঁপে উঠলেন ডক্টর। বললেন—'স্কোয়ারে এই নিয়ে চেঁচামেচি শুনলাম। ডাইনিং রুম থেকে শুনছিলাম আমি।'

'বটে', বললেন মিঃ আটারসন। ক্যারু আমার মক্কেল ছিলেন। তুমিও তাই! লোকটাকে আড়াল করে রাখাটা তোমার পক্ষে চূড়ান্ত পাগলামো হয় নি কি ?'

'আটারসন, ভগবানের নামে দিব্বি করে বলছি', অকস্মাৎ চীৎকার করে উঠলেন ডক্টর। 'ভগবানের নামে দিব্বি করে বলছি এ জীবনে তার মুখ দর্শন করবো না আমি। সব শেষ হয়ে গেছে। সব শেষ হয়ে গেছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমার কোনো সাহায্যও চায় না ও। এই চিঠিটা পড়লেই বুঝবে ও এখন মোটামুটি নিরাপদেই আছে—'

বলে মিঃ আটারসনের হাতে একটা চিঠি তুলে দিলেন ডক্টর। হাতের লেখাটা অদ্ভুত। খাড়াই অক্ষরগুলো যেন কষ্টেসৃষ্টে দাঁড়িয়ে আছে মাথা উঁচু করে। তলায় সই রয়েছে 'এডোয়ার্ড হাইড।' চিঠির বক্তব্য এই : উপকারী বন্ধুকে অনেক ধন্যবাদ। দীর্ঘদিন ধরে অনেক ভাবে তিনি উপকার করেছেন এক অযোগ্য বন্ধুকে। যাই হোক, হাইডকে নিয়ে আর তাঁকে ভয় পেতে হবে না। কেন না, সে যে গা ঢাকা দেবেই সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই।

'চিঠিটা এখানে এল কি ভাবে ?' শুধোলেন আইনবিদ।

'হাতে।' বললেন ডক্টর। তোমার কাছেই থাকুক ওটা। খুব শিক্ষা হয়েছে আমার—ভগবান কি শিক্ষাই দিলেন আমাকে!' মুহূর্তের জন্যে ছু হাতে মুখ ঢাকা দিলেন উনি।

বেরিয়ে আসবার সময়ে চিঠিটা সম্পর্কে বাটলারকে প্রশ্ন করলেন মিঃ আটারসন। কিন্তু সারাদিনে চিঠি দিতে কেউ আসে নি, সে বিষয়ে নিশ্চিত সে। বাড়ী ফিরে আসার পর চুল্লীর সামনে এসে বসলেন মিঃ আটারসন। ওঁর একান্ত অনুগত বিশ্বাসী হেডক্লার্ক মিষ্টার গেষ্ট-ও বসেছিলেন সেখানে। মিষ্টার গেষ্ট-এর কাছে প্রায় কোনো কিছুই গোপন রাখতেন না উনি। পৃথিবীতে আর কাউকে এতটা বিশ্বাস করতেন না মিঃ আটারসন।

সেদিনও গুম হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর মুখ খুললেন উনি—'স্যার ডানভার্সের এই ব্যাপারটা বাস্তবিকই বড় মর্মান্তিক ঘটনা।'

'যা বলেছেন স্যার। লোকটা নিশ্চয় বদ্ধ উন্মাদ।'

'তোমার অভিমতকে সমর্থন জানাতে পারলে খুশী হতাম আমি। লোকটার নিজের হাতে লেখা এই চিঠিটা পড়ে দেখো।'

চিঠি পড়লেন মিঃ গেষ্ট। তারপর মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন—'না, স্যার, উন্মাদ নয়—কিন্তু হাতের লেখাটা সত্যিই বড় অদ্ভুত, তাই নয় কি?'

কথাটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগুনের পাশে টেবিলের ওপর পড়ে চিঠির ওপর চোখ পড়লো হেড ক্লার্কের। কিছুদিন আগেকার একটা চিঠি—ডঃ জেকিল মিঃ আটারসনকে লিখেছিলেন। চিঠিটা তুলে নিলেন গেষ্ট। বললেন—'আশ্চর্য, স্যার, যতই দেখছি ততই অদ্ভুত লাগছে। ছুটো হাতের লেখার মধ্যেই একটা অদ্ভুত মিল রয়েছে। অনেক দিক দিয়ে ছুটো লেখাই হুবহু এক রকম। তফাতের মধ্যে একটা খাড়াই, আর একটা সামান্য হেলে রয়েছে।'

'বিচিত্র ব্যাপার!' বললেন আটারসন। 'কিন্তু এ চিঠি যে তুমি দেখেছো, তা আমি আর কাউকে বলছি না। গুড নাইট, গেষ্ট।'

শূন্য ঘরে নিজের চিন্তার অতলে তলিয়ে গেলেন মিঃ আটারসন। চিন্তা তো নয়, যেন হাজার হাজার বৃশ্চিকের বিষ-কামড়। 'হেনরী জেকিল কিনা একটা খুনের জন্যে জাল চিঠি লিখেছেন!' ভাবতে ভাবতেই হিম হয়ে এল তাঁর শিরা উপশিরার রক্ত প্রবাহ।

* * *

সময় বয়ে যায়। হাজার হাজার পাউণ্ডের পুরস্কারের ঘোষণা সত্ত্বেও মিঃ হাইড যেন পৃথিবীর বুক থেকে বেমালুম উধাও হয়ে গেল। তার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে ডঃ জেকিলও আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এলেন। ফিরে এল তাঁর পুরানো, মিশুকে স্বভাব সামাজিকতা-বোধ। এক কথায় যেন নিজের মধ্যেই আবার ফিরে এলেন ডঃ হেনরী জেকিল। অবসান ঘটলো তাঁর জীবনের নির্জন অধ্যায়ের। বন্ধু-বান্ধবের ঘরে অতিথি হয়ে কথাবার্তায় আমোদের ফুলঝুরি ছড়িয়ে আবার আগের দিনের মতই প্রিয় হয়ে উঠলেন তিনি।

জানুয়ারী মাসের আট তারিখে হেনরী জেকিলের বাড়ীতে একটা ছোট্ট পার্টিতে ডক্টর ল্যানিওনের সাথে মিলিত হয়ে ডিনার খেয়েছিলেন মিঃ আটারসন। কিন্তু বারো তারিখে জেকিলের বাড়ীতে তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হলো না। পর পর ছদিন এই কাণ্ড ঘটলো। তখন তিনি ডঃ ল্যানিওনের বাড়ী গেলেন।

সেখানে তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হলো বটে, কিন্তু ভেতরে এসেই দারুণ শক পেলেন ডাক্তারের চেহারার বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখে। মৃত্যুর পরোয়ানা যেন স্পষ্টাক্ষরে লিখে দেওয়া হয়েছে তাঁর মুখের ওপর। লাল টকটকে মুখের রঙ ছাইয়ের মন ফ্যাকাশে, গালের মাংস ঝুলে পড়েছে, আর দুই চোখের তারায় তারায় নিঃসীম আতংকের প্রতিচ্ছবি।

আটারসনকে দেখেই বলে উঠলেন উনি—'বড় জোর শক পেয়েছি আমি। এ ধাক্কা আর কোনোদিনই কাটিয়ে উঠতে পারবো না। কয়েক হপ্তা এইভাবেই যাবে।'

আটারসন বললেন—'জেকিলও অসুস্থ। ওর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে?'

সঙ্গে সঙ্গে পালটে গেল ল্যানিওনের মুখের চেহারা। কম্পমান হাত তুলে অকস্মাৎ ভাঙা ভাঙা গলায় অস্বাভাবিক জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি—'ভগবান করুন, জেকিলের সঙ্গে ইহ-জীবনে আমার যেন আর দেখা না হয়। ওর সঙ্গে আমার সব সম্পর্কই শেষ হয়েছে। তোমার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ—আমার চোখে যার মৃত্যু হয়েছে, ভবিষ্যতে তার নামটিও আমার কাছে উল্লেখ করো না।'

'ছি ছি! কি বলছো হে? আমরা তিনজনেই যে অনেক দিনের বন্ধু। আমার দ্বারা যদি কিছু হয় তো বলে ফেলো।'

'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, কিছু করতে পারো না তুমি।'

বাড়ী ফিরে এসেই জেকিলকে একটা চিঠি লিখলেন আটারসন। লিখলেন যে ল্যানিওনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদ কেন হলো এ সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্যে তিনি দেখা করতে চান। হেনরী জেকিল উত্তর দিলেন এবং সে চিঠির প্রতিটি শব্দই যেন অশ্রুসিক্ত। শুধু তাই নয়, এই করুণ শব্দমালাই মধ্যে মধ্যে মোড় নিয়ে হারিয়ে গিয়েছে রহস্যময় তমিস্রার অন্তরালে। ল্যানিওনের সঙ্গে বিবাদের মিটমাট ইহজীবনে আর হবে না। লিখেছেন—'আমাদের পুরোনো বন্ধুকে আমি এজন্যে দোষ দিচ্ছি না। কিন্তু এক দিক দিয়ে তাঁর সঙ্গে আমিও একমত—আমাদের আর দেখা সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল এবং ভবিষ্যতে হবেও না। এখন থেকে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে চাই আমি এবং আমার দরজা যদি হামেশাই তোমার সামনে বন্ধ থাকে তাহলে নিশ্চয় অবাক হবে না তুমি। আমার এই অপরিসীম অন্ধকারময় জীবনের বেদনায় আমাকে জ্বলতে দাও। আমি পাপী-শিরোমণি হয়েছিলাম—তাই আমার প্রায়শ্চিত্তের সীমা পরিসীমা নেই। শুধু একটা উপকার তুমি করতে পারো। আটারসন, আমার নীরবতাকে সম্মান দিও। একাকীত্ব ভঙ্গ করবার চেষ্টা করো না।'

হতভম্ব হয়ে গেলেন আটারসন। হাইডের কুপ্রভাব তাহলে শুরু হয়ে গেছে। হপ্তাখানেক পরেই শয্যা গ্রহণ করলেন ডঃ ল্যানিওন। দিন পনেরোর মধ্যেই মারা গেলেন তিনি। মৃত্যুকালে একটা গালামোহর করা খাম দিয়ে গেলেন আটারসনকে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হলে পর খামটা নিয়ে বসলেন আটারসন। খামের ওপরেই বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল 'গোপনীয়—কেবলমাত্র জে, জি, আটারসনের জন্যে। ডঃ হেনরী জেকিলের মৃত্যু বা অন্তর্ধানের আগে এ লেখাটা খোলা চলবে না।'

আবার সেই আশ্চর্য শব্দ—'অন্তর্ধান'। প্রথমবার এই শব্দ আছে জেকিলের ক্ষ্যাপাটে উইলে। এবার ল্যানিওনের নিজের হাতে লেখা। কিন্তু কেন? কেন? কেন?

* * *

সেদিন সন্ধ্যায় ডিনার পর্ব শেষ করে আগুনের পাশে বসে ছিলেন মিঃ আটারসন। এমন সময়ে পুলকে ঘরের মধ্যে দেখে অবাক হয়ে গেলেন তিনি।

'কি ব্যাপার পুল? কি মনে করে?' বেশ জোরেই বলে উঠলেন মিঃ আটারসন।

'মিঃ আটারসন, গতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না। ভয়ানক কিছু একটা হয়েছে!'

'ভয়ানক কিছু!' রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়ে আরও জোরে চেঁচিয়ে ওঠেন মিঃ আটারসন। 'কি বলতে চাও তুমি?'

'সে কথা বলার সাহস আমার নেই, স্যার। কিন্তু আপনি যদি দয়া করে আমার সঙ্গে আসেন তো দেখাতে পারি।'

আর একটি কথাও না বলে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ আটারসন। টুপী আর গ্রেট কোট নিয়ে পা বাড়ালেন চৌকাঠের বাইরে। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছিল বাইরে। রাতটাও বেশ দুরন্ত। মার্চের সেই অশান্ত কনকনে রাতে স্কোয়ারের বাড়ীতে এসে পৌঁছোলেন উনি।

ফিস্ ফিস্ করে বলে উঠল পুল—'পা টিপে টিপে আমার পিছু পিছু চলে আসুন, স্যার। নিজের কানেই শুনে যান।'

সার্জিক্যাল থিয়েটারের মধ্যে দিয়ে সিঁড়ির তলায় পৌঁছালো পুল। তারপর দ্বিধাগ্রস্তভাবে টোকা দিলে লালপর্দা ঢাকা দরজার ওপরে।

'স্যার, মিঃ আটারসন আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে চান।'

ভেতর থেকে একটা স্বর শোনা গেল—'বলে দাও এখন কারো সঙ্গে আমি দেখা করতে পারবো না।'

'ধন্যবাদ, স্যার' বললে পুল। তারপর মোমবাতিটা তুলে নিয়ে উঠোন পেরিয়ে বিরাট রান্নাঘরটায় এসে মিঃ আটারসনের চোখে চোখ রেখে মৃদুস্বরে বললে—'স্যার, এ স্বর আমার কর্তার নয়।'

কাগজের মত শাদা হয়ে গিয়ে মিঃ আটারসন জবাব দিলেন—'স্বরটা দারুণ পাল্টে গিয়েছে মনে হচ্ছে। কিন্তু, ইয়ে, যদি ডঃ জেকিল নিহতই হয়ে থাকে, তবে হত্যাকারী এখনও কেন ঘরের মধ্যে বসে থাকবে বলো তো ?'

পুল বললে 'মিঃ আটারসন, আপনাকে সন্তুষ্ট করা খুবই কঠিন। তবুও শুনুন। কর্তার স্বভাব আপনি জানেন। কাজেই পুরো হপ্তাটায় ঐ ঘরের মধ্যে চিরকুট লিখে হুকুম পাঠিয়েছেন তিনি আমাকে। প্রত্যেকবারে চিরকুটটা রেখে গেছেন সিঁড়ির তলায়। প্রতিদিন ছবার তিনবার আমাকে শহরের প্রত্যেকটা ওষুধের দোকানে যেতে হয়েছে একটি বিশেষ কেমিক্যালের খোঁজে। আর প্রত্যেক বারই একটা চিরকুট পেয়েছি কেমিক্যালটা ফেরৎ দিয়ে দেওয়ার জন্যে—কেন না তা খাঁটি নয়।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আটারসন—'আর কিছু আছে ?'

মাথা হেলিয়ে বললে পুল—'আছে। একবার আমি তাঁকে কাঁদতে শুনেছি। মেয়েমানুষের মত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন উনি। আর একদিন হঠাৎ এসে গিয়েছিলাম আমি। এসেই দেখলাম

সাজিক্যাল থিয়েটারের কাঠের বাক্সগুলোর ওপর একটা মূর্তি ঝুঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাকে দেখেই বানরের মত অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় সাঁ করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল সে। মিঃ আটারসন, আমি দিব্বি গেলে বলতে পারি, মিঃ হাইডই সেদিন আমাকে দেখে অমনভাবে পালিয়েছিল কর্তাবাবুর ঘরে।'

সিধে হয়ে দাঁড়ালেন মিঃ আটারসন। 'পুল, একটা কুড়ুল এনে দাও আমাকে। দরজা ভেঙে আমরা দেখতে চাই ভেতরে কে আছে।'

এক গাদা খড়ের ভেতর থেকে একটা কুড়ুল বার করলো পুল। তারপর রুদ্ধশ্বাসে তুজনে এগিয়ে গেল লালপর্দা ঢাকা দরজার সামনে।

জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন মিঃ আটারসন—'জেকিল, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই—এখুনি।' থামলেন উনি—কিন্তু কোনো উত্তর এলো না। 'আমি তোমাকে আগে থেকেই সাবধান করে দিচ্ছি, নিজে থেকে যদি বেরিয়ে না আসো তো জোর করে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকবো আমরা।'

'আটারসন, ভগবানের দোহাই, দয়া করো আমাকে।' একটা স্বর শোনা গেল ভেতর থেকে।

'আ! এ গলা জেকিলের নয়—হাইডের।' চীৎকার করে উঠলেন আটারসন। 'পুল, দরজা ভেঙে ফেলো।'

বোঁ করে কুড়ুলটাকে ঘুরিয়ে মাথার ওপর তুলে ফেলল পুল, প্রচণ্ড আঘাতে থর থর করে কেঁপে উঠল সারা বাড়ী, তালা আর কব্জার বাঁধন থেকে লাফিয়ে উঠল লাল পর্দা ঢাকা দরজাটা। নিঃসীম হতাশায় ভরা জানোয়ারের মত একটা চীৎকারে গম্ গম্ করে উঠল ঘরটা। আবার মাথার ওপর উঠলো কুড়ুলটা, আবার মড় মড় করে উঠলো তক্তাগুলো। তারপরের আঘাতেই তালা উপড়ে নিয়ে দরজাটা হুড়মুড় করে ছিটকে পড়লো ভেতরের দিকে।

হাঙ্গামার তুমুল হট্টগোলের পরেই থমথম স্তব্ধতায় ক্ষণেকের জন্যে

থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন আটারসন আর পুল। পরক্ষণেই ভেতরে উঁকি মারতে চোখে পড়ল চুল্লীর গনগনে আগুনের মধ্যে বসানো একটা কেটলি। সঙ্গীতের মত শব্দে বাষ্পের রেখা উঠে যাচ্ছে ওপরে। ঘরের ঠিক মাঝখানে পড়ে রয়েছে একটা দেহ—তখনও অপরিসীম যন্ত্রণায় দুমড়ে মুচড়ে ছটফট করছিল সে দেহ। পা টিপে টিপে কাছে এগিয়ে গেলেন আটারসন। চিৎ করে শুইয়ে দিতেই চিনতে পারলেন এডোয়ার্ড হাইডকে। পরনের পোশাক খুবই ঢিলে ঢালা। অনেক বড় মাপের—ডক্টরের মাপ বলেই মনে হয়। সে দেহে জীবনের সাড়া আর ছিল না। হাতে ধরা ছিল একটা ভাঙা শিশি—আরকের তীব্র গন্ধ উঠছিল শিশি থেকে। এডোয়ার্ড হাইড আত্মহত্যা করেছে।

কঠিন গলায় বললেন আটারসন—'বড় দেরীতে এলাম আমরা। হাইড তার হিসেব নিকেশ মিটিয়ে নিলে। এখন তোমার কর্তাবাবুর লাশটা খুঁজে বার করতে হবে।'

গোটা বাড়ীটার বেশীর ভাগ অংশই জুড়েছিল থিয়েটারটা। নিচে ছিল মদ রাখার ঘুপসি কুঠরি। সেখানে হানা দিয়ে গাদা গাদা বিদঘুটে আকারের আসবাবপত্র ছাড়া ডক্টর হেনরি জেকিলের কোনো চিহ্নই পাওয়া গেল না।

ঘরে ফিরে এসে মিঃ আটারসন বললে—'কর্পূরের মতই বেমালুম উবে গেছে জেকিল।' টেবিলের ওপর একটা খাম পাওয়া গেল। ডক্টর জেকিল নিজের হাতেই নাম লিখেছেন আইনবিদ মিঃ আটারসনের।

সন্তর্পণে খামটা খুলে ফেললেন মিঃ আটারসন। ভেতরে পাওয়া গেল আরও একটা প্যাকেট, আর একটা ছোট্ট চিরকুট :

মাই ডিয়ার আটারসন,

এ চিঠি যখন তোমার হাতে পড়বে, তখন আমি অদৃশ্য হয়ে গেছি। কি পরিস্থিতিতে আমি অন্তর্হিত হবো, তা আমি দিব্যচক্ষু

মেলে দেখতে পারছি না—দেখার ক্ষমতাও নেই। শুধু এইটুকুই জানি যে শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে এবং তা রোধ করার ক্ষমতা কারোর নেই। যে নামহীন পরিস্থিতির মধ্যে আমার দিন কাটছে, তা থেকেই বুঝেছি, সেই অন্তিম মুহূর্তের আর বেশী দেরি নেই। সেই কারণেই তুমি এখুনি বাড়ী যাও। ল্যানিওন আমাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিল তোমার হাতে সে একটি বিবৃতি তুলে দেবে এবং যে বিবৃতিটি এখন তোমার হেপাজতেই রয়েছে—আর কোন কিছু করার আগে এখুনি তা পড়ে ফেলো। তার পরেও যদি তোমার মন চায় তো তোমার অসুখী এবং অযোগ্য এই বন্ধুটির স্বীকারোক্তি পড়তে পার।

হেনরী জেকিল

প্যাকেট আর চিরকুটটা পকেটে রাখলেন মিঃ আটারসন। তারপর দরজায় তালা দিয়ে দুজনেই বেরিয়ে এলেন বাইরে।

মিঃ আটারসন বললেন—'বিবৃতিটা পড়বার জন্যে আমি এখন অফিসে যাবো। ফিরে আসবো রাত বারোটার আগেই। পুলিশে খবর পাঠাবো তখনই।'

*　　　*　　　*

চারদিন আগে গত ৯ই জানুয়ারী সন্ধ্যের দিকে আমার সহকর্মী এবং স্কুলের সহপাঠী হেনরী জেকিলের কাছ থেকে একটা রেজিষ্টার্ড খাম পেলাম। বলা বাহুল্য, খামটা পেয়ে অবাক হলাম খুবই। কেন না, গত রাতেই জেকিলের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। এক সাথে ডিনারও খেয়েছি। আমি তো ভেবেই পেলাম না আমাদের কথাবার্তার মধ্যে এমন কি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যার জন্যে সকাল হতে না হতেই এ রকম আনুষ্ঠানিকভাবে রেজিষ্টার্ড চিঠি পাঠানোর দরকার হয়ে পড়ল। বিস্ময় বৃদ্ধি পেল চিঠির বিষয়বস্তু পড়ে। চিঠিটা নিচে দিলাম:

ডিসেম্বর ১০, ১৮—

প্রিয় ল্যানিওন,—

তুমি আমার পুরোনো বন্ধু। অনেক বৈজ্ঞানিক সমস্যা নিয়ে তোমার সঙ্গে অতীতে আমার বহুবার মতবিরোধ ঘটেছে, তবুও জানোই তো চিরকালই আমার সর্বস্ব দিয়েও তোমাকে আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত। ল্যানিওন, আজ রাত্রে আমার জীবন, আমার মান সম্মান, আমার যুক্তিবুদ্ধি, সব কিছুই নির্ভর করছে তোমার দয়ার ওপর। নিশ্চয় নিষ্ঠুর হবে না তুমি।

আমি চাই আজ রাতে সব কাজ সরিয়ে রাখো তুমি। সম্রাটের শয্যার পাশে হাজির হওয়ার ডাক এলেও আজ তুমি আমার বাড়ী ছাড়া আর কোথাও যেও না। এই চিঠি সমেত একটা ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে সিধে চলে এস আমার বাড়ীতে। আমার বাটলার পুলকে জানিয়ে দিয়েছি তাকে কি করতে হবে না হবে। তুমি গেলেই দেখবে একজন তালাচাবির মিস্ত্রীকে নিয়ে তোমারই প্রতীক্ষায় রয়েছে সে। এরপর আমার ঘরের দরজার তালা মিস্ত্রীকে দিয়ে খুলে তুমি একা ভেতরে যাবে। 'E' অক্ষর মার্কা ড্রয়ারটা মালপত্র সমেত টেনে বার করবে—ভেতরকার জিনিসপত্র একদম নাড়াচাড়া করো না। আমার একান্ত অনুরোধ, এই ড্রয়ারটা নিয়েই তুমি ক্যাভেণ্ডিশ স্কোয়ারে ফিরে আসবে।

এই গেল প্রথম পর্ব—এবার দ্বিতীয়। রাত বারোটার অনেক আগেই তোমার ফিরে আসা উচিত—তবুও তোমার হাতে বেশ খানিকটা সময় দেব আমি। রাত বারোটার সময় তোমার কনসাল্টিং রুমে তুমি হাজির থেকো এবং আমার নাম নিয়ে যে লোকটি হাজির হবে, নিজের হাতে তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে নিও। তারপর ঘর থেকে যে ড্রয়ারটা বয়ে নিয়ে যাবে, সেই ড্রয়ারটা তুলে দিও তার হাতে। এই পর্যন্ত করতে পারলেই চিরজীবন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো আমি। পাঁচ মিনিট পরে যদি এ সব কাণ্ড কারখানার কি মানে,

তা জানবার জন্যে ঝুঁকে বসো, তা হলেই বুঝবে কতখানি গুরুত্ব লুকিয়ে রয়েছে এত আয়োজনের পেছনে, বুঝবে বিদঘুটে, বেয়াড়া, চমকপ্রদ হলেও অযৌক্তিক কিছুই নয়।

আমি জানি আমার অনুরোধ তুমি রাখবেই রাখবে। গ্র্যানাইট কঠিন প্রত্যয় সত্ত্বেও না রাখার সম্ভাবনা ভাবলেও আমার বুক দুলে উঠছে, হাত কেঁপে যাচ্ছে নিঃসীম বিভীষিকা কল্পনায়। এই মুহূর্তে আমার অবস্থাটা একবার কল্পনা করো, ল্যানিওন ; কল্পনা করো এক বিচিত্র অদ্ভুত জায়গায় দুর্দশার নিরন্ধ্র তমিস্রায় কি অপরিসীম কষ্ট পাচ্ছি আমি—বিশ্বাস করো, আমার বর্ণনায় অতিরঞ্জনের ছিটে-ফোঁটাও নেই। কিন্তু এই অবর্ণনীয় দুরবস্থাও বলে ফেলা গল্পের মতই অন্তর্হিত হবে সেই মুহূর্তে যখনই তুমি আমার অনুরোধ মত প্রতিটি কাজ করবে। মাই ডিয়ার ল্যানিওন, দয়া করো, সাহায্য করো, আমাকে বাঁচাও—

তোমার বন্ধু—
এইচ. জে

এই চিঠি পড়েই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেল পাগল হয়ে গেছে আমার সহকর্মী। তা সত্ত্বেও যতক্ষণ না আমার এই বিশ্বাস সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ হচ্ছে, ততক্ষণ তার অনুরোধমত কাজ করাই সঙ্গত মনে করলাম। এই জগাখিচুড়ি ব্যাপারের মূল তাৎপর্য বুঝেছিলাম খুবই অল্প, তাই গুরুত্বটুকুও মোটেই আমার মাথায় ঢোকে নি। তবুও টেবিল ছেড়ে উঠে চিঠিখানা পকেটে পুরে রাস্তায় একটা ভাড়াটে গাড়ী নিয়ে গেলাম জেকিলের বাড়ীতে। আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল বাটলার। আমি যে ডাকে চিঠি পেয়েছি, সেই একই ডাকে পুলও একটা রেজিষ্টার্ড চিঠি পেয়ে তৎক্ষণাৎ একজন তালাচাবির মিস্ত্রী ডেকে এনেছিল। ঘণ্টা দুয়েক খুটখাট করার পর জেকিলের প্রাইভেট ঘরের দরজা খুলে গেল। 'E' মার্কা

ড্রয়ারটা টেনে বার করে খড় দিয়ে ভরাট করে কাগজ দিয়ে মুড়ে নিলাম। তারপর ফিরে এলাম ক্যাভেণ্ডিশ স্কোয়ারে।

বাড়ী ফিরে এসে ভেতরকার জিনিসগুলো নাড়াচাড়া করে দেখলাম। গুঁড়ো পদার্থগুলো বেশ পাকা হাতেই তৈরী। একবার দেখলেই অনায়াসেই বোঝা যায় তা জেকিলের হাতেই বানানো। একটা মোড়ক খুলে একরকম সাদাটে নুনের মত কৃষ্ট্যাল দেখলাম। এরপর চোখে পড়ল একটা শিশি। রক্তরাঙা তরল পদার্থে অর্ধেক ভরা ছিল শিশিটা, খুলতেই উৎকট ঝাঁঝালো গন্ধে মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। মনে হলো, ফসফরাসের সঙ্গে খানিকটা উদ্‌বায়ী ইথার মিশোনো রয়েছে। অন্যান্য উপকরণগুলো দেখে কিছুই বুঝতে পারলাম না। একটা বই পেলাম। দীর্ঘ কয়েকটি বছরের ওপর ছড়ানো সারি সারি তারিখ ছাড়া বইটিতে আর কিছুই নাই। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম। তারিখমালা শেষ হয়েছে প্রায় বছর খানেক আগে—আচমকা যেন থমকে দাঁড়িয়ে গেছে তারিখের কুচকাওয়াজ। তারিখ তালিকার গোড়ার দিকে এক জায়গায় লেখা আছে—'সম্পূর্ণ ব্যর্থতা !!!' এ সব দেখে আমার কৌতূহল বহুগুণে বৃদ্ধি পেলেও মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। বুঝলাম না আমার বাড়ীতে এ সব জিনিস হাজির থাকলে কিভাবে বন্ধুবর জেকিলের সম্মান আর মস্তিষ্কের সুস্থতা রক্ষা পাবে। যতই মনে মনে এ নিয়ে তোলাপাড়া করতে লাগলাম, ততই মনের মধ্যে ধারণাটা শেকড় ছড়িয়ে দৃঢ়মূল হয়ে যেতে লাগল—নিশ্চয়ই মগজের রোগ দেখা দিয়েছে বন্ধুবর জেকিলের। চাকরকে শুতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। এখন একটা পুরোনো রিভলবারে কার্তুজ পুরে তৈরী হয়ে নিলাম বেগতিক অবস্থার জন্যে।'

সারা লণ্ডনে রাত বারোটা বাজা তখনও শেষ হয়েছে কি হয় নি, এমন সময়ে খুব আলতোভাবে খুট খুট করে নড়ে উঠল আমার দরজার কড়া। নিজেই দরজা খুলে ধরতেই দেখলাম, পোর্টিকোর

অন্ধকারে থামের গায়ে শুঁড়ি মেরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছোটখাটো একটা লোক।

শুধোলাম—'ডক্টর জেকিলের কাছ থেকে আসছেন কি?'

মাথা হেলিয়ে সায় দিলে সে। ভেতরে নিয়ে এলাম তাকে। আমার পিছু পিছু কনসাল্টিং রুমে এল সে। তখনই তাকে ভাল করে দেখার সুযোগ পেলাম। এর আগে যে কস্মিনকালেও তাকে আমি দেখিনি, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই ছিল না আমার। আগেই বলেছি আকারে সে বামন বললেই চলে। সবচেয়ে অবাক হলাম তার চোখ-মুখের বুক কাঁপানো ভাবব্যঞ্জনা আর ঢিবি-ঢিবি মাংস-পেশীর চমকপ্রদ তৎপরতা দেখে। শরীরের কাঠামো অতি বদখৎ—বিধাতার নিষ্করুণ কার্পণ্যে রীতিমত কুৎসিত।

লোকটার জামাকাপড় দেখলে যে কেউ হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়বে। পোশাক যদিও মহার্ঘ এবং রুচিসম্মত স্নিগ্ধ সুন্দর—কিন্তু তার চেহারার অনুপাতে তা বেজায় বড়। ট্রাউজারের পা দুটো তো লটপট করে এতখানি ঝুলে পড়েছে যে তা গুটিয়ে তুলে রাখতে হয়েছে মাটি থেকে উঁচুতে। কোটের কোমরটা নেমে এসেছে পাছারও নিচে। কাঁধের ওপর হাঁ হয়ে ছড়িয়ে রয়েছে কলারটা।

এত খুঁটিনাটি লিখতে অনেকটা সময় লাগলেও দেখতে সেকেণ্ড কয়েকের বেশী লাগেনি। নিদারুণ উত্তেজনায় গনগনে অঙ্গারের মতই যেন আগুন ছড়াচ্ছিল সে।

ঘরের মধ্যে এসেই চিৎকার করে উঠল অদ্ভুত চাপা গলায়, 'পেয়েছেন? পেয়েছেন?' এমনই অধৈর্য হয়ে উঠেছিল সে, বলতে বলতে আমার হাত চেপে ধরলে ঝাঁকানি দেবার জন্যে: ঠেলে সরিয়ে দিলাম তাকে। কেন জানি দেহে ওর স্পর্শ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন কনকনে বরফের যন্ত্রণাময় কামড় অনুভব করলাম আমার শিরা উপশিরায় রক্তের প্রবাহে।

তারপরেই আমার দয়া হলো। দয়া হলো ওর উদ্বেগ দেখে। কিছুটা আমার উত্তরোত্তর বর্ধিত ঔৎসুক্যের জন্যেও বটে।

টেবিলের পাশেই মেঝের ওপর কাগজ ঢাকা অবস্থায় পড়েছিল ড্রয়ারটা। দেখিয়ে দিয়ে বললাম—'ঐ তো ওখানে।'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল সে। পরমুহূর্তেই থমকে গিয়ে বুকের ওপর হাত রাখলে। শুনতে পেলাম তার চোয়াল জোড়ার অদম্য বিকৃত লাফালাফির ফলে দাঁত কপাটির মুহুর্মুহু খটখটানি। সেই সাথে পাণ্ডাসপানা রক্তহীন মুখে মৃত্যুর এমনই বীভৎসতা নেমে এল যে ভয় পেয়ে গেলাম, বুঝিবা এবার ওর প্রাণটাই বেরিয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম—'সামলে নিন নিজেকে।'

মুখের ওপর ভয়াবহ বিকট হাসি নিয়ে আমার পানে ফিরে দাঁড়ালো সে। তারপর যেন নিরাশার নিতল পাতাল গুহার কিনারা থেকে এক ঝটকায় নিজেকে সরিয়ে এনে টান মেরে সরিয়ে দিলে ড্রয়ারের কাগজের আচ্ছাদনটা। ভেতরকার জিনিসপত্রগুলোয় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে পাঁজর খালি করা দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে হাঁফ ছাড়তে গিয়ে সে সশব্দে এমনভাবে ফুঁপিয়ে উঠল যে আতংকে অবশ হয়ে ধপ করে বসে পড়লাম আমি। পরের মুহূর্তেই অনেকটা সংযত কণ্ঠে শুধোলে সে—'দাগ দেওয়া গেলাস আছে?'

একরকম জোর করেই টেনে তুললাম নিজেকে। এনে দিলাম সে যা চাইছে তাই।

হাসি মুখে মাথা হেলিয়ে সে আমাকে ধন্যবাদ জানালে। তারপর খানিকটা লাল টিংচার মেপে নিয়ে একটা গুঁড়ো মিশিয়ে দিলে গেলাসের মধ্যে। জ্বলজ্বলে হয়ে উঠতে লাগল মিশ্রণ পদার্থটা, ভস ভস করে সজোরে বুদবুদ কাটা শুরু হলো—বেরিয়ে এল বাষ্পের অল্প অল্প ধোঁয়া। বুদ বুদ কটা মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত চুপ করে রইল খর্বকায় মানুষটি। তারপর ফিরে দাঁড়ালো আমার পানে। ধারালো দুই চোখে দেখলাম আশ্চর্য এক চাপা দ্যুতি।

বলল—'এবার বাকিটুকু শেষ করে ফেলার পালা। কি করতে চান আপনি? হঠাৎ বিজ্ঞ হয়ে যেতে চান কি? যুক্তিবুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে এর পরের মুহূর্তগুলো বিবেচনা করে দেখতে চান কি? আপনি কি চান আর ঝামেলা না বাড়িয়ে এই গেলাস হাতে গুটি গুটি সরে পড়ে আরও কষ্টভোগ করি? না কি, কৌতূহলের প্রলোভনে ছটফটিয়ে মরছেন আপনি? উত্তর দেওয়ার আগে ভাল করে ভেবে দেখুন। কেন না, এর পরেও যদি আমায় থাকতে বলেন তো এমন এক দৃশ্য দেখবেন, যার বিপুল ভয়াবহতার প্রচণ্ড আঘাত শয়তানের অবিশ্বাসকেও লণ্ডভণ্ড করে ছাড়বে।'

অতি কষ্টে শান্ত থাকবার চেষ্টা করলাম। প্রাণপণ চেষ্টায় নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললাম—'মশায়, আপনি বড় বাড়িয়ে বলছেন। কিন্তু আমি এত বেশী দেখে ফেলেছি যে এ ব্যাপারের শেষ না দেখে আর ছাড়ছি না।'

'ভাল কথা। ল্যানিওন, তোমার শপথ মনে রেখ। এরপর যা ঘটবে, তা আমাদের পেশার গালামোহরে লুকিয়ে থাকবে লোকচক্ষুর অন্তরালে। তবে ছাখো।'

ঠোঁটের কাছে গেলাসটা তুলে নিয়ে এক ঢোকেই সবটা আরক গিলে নিলে সে। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বাতাস চিরে গেল বিকট এক চিৎকারে। তারপরেই সে গাড়য়ে পড়ল মেঝের ওপর, আছাড়ি পিছাড়ি খেয়ে পাকসাট খেতে লাগল এদিকে সেদিকে, অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় বেদনা অবশ দুই মুঠি দিয়ে আঁকড়ে ধরলে টেবিলটা, সূচীবিদ্ধ বিস্ফারিত দুই চোখ মেলে তাকিয়ে রইল আমার পানে, হাঁ করে খাবি খেতে লাগল ঘন ঘন, জিব বেরিয়ে পড়ল, লালা গড়িয়ে পড়ল ঠোঁটের কোণ দিয়ে—মনে হলো মৃত্যুর নিষ্পেষণে ফেটে পড়তে চাইছে তার ফুসফুস—আর তারপরেই এল একটা পরিবর্তন—আশ্চর্য পরিবর্তন—মনে হলো যেন ফুলে উঠেছে সে—আচম্বিতে কালো হয়ে গেল তার মুখ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মনে হলো যেন গলে গলে নতুন রূপ নিচ্ছে—পরের

মুহূর্তেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পিছিয়ে গেলাম আমি—দেওয়ালের গায়ে পিঠ দিয়ে আড়ষ্ট হাত তুলে যেন বাধা দিতে চাইলাম সামনের সেই অকল্পনীয় অবর্ণনীয় ভয়াবহ বীভৎসতাকে—নিতল আতংক দরিয়ায় নিমজ্জিত হয়ে হাঁকপাঁক করে উঠল আমার সারা অন্তর।

আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম—'ওঃ ভগবান! ভগবান!' আমার অবশ কণ্ঠের অলিন্দ বেয়ে বার বার বেরিয়ে এসেছিল সেই আর্ত চিৎকার—কেন না চোখের সামনেই অর্ধ-অচেতন, সেই বিচিত্র মূর্তিটার দেহে সমুদ্র সৈকতে ঢেউ আসার মতই আসছিল পর পর পরিবর্তনের ঢেউ, আপাদমস্তক থর থর করে কাঁপছিল সে, রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার চামড়া আর তারপরেই যেন মৃত্যুর গহ্বর থেকে দুই হাতে লড়াই করতে করতে টলতে টলতে আমার সামনে উঠে দাঁড়াল যে—সে হেনরি জেকিল!

এর পরের ঘণ্টায় আমাকে সে যা বলেছিল, তা কাগজে লিখে যাওয়ার মত আমার মনের অবস্থা নেই। যা দেখবার আমি তা দেখেছি, যা শোনবার আমি তা শুনেছি—আমার পরমাত্মা পর্যন্ত ককিয়ে কেঁদে উঠে স্তব্ধ হয়ে গেছে নিঃসীম আতংকে। আমার জীবনের মূল পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে এ ব্যাপারে। চোখ থেকে ঘুম পালিয়েছে। দিনরাতের প্রতিটি ঘণ্টায় একাধিক নরকের পুঞ্জীভূত বিভীষিকা মৃত্যুসমান শীতলতা নিয়ে বসে থাকে আমার আশেপাশে। বেশ বুঝছি, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। আমি এবার মরবো এবং সে মৃত্যু হবে অবিশ্বাস্য। আটারসন, আরও একটা কথা বলব তোমাকে। সেদিন রাত্রে যে প্রাণীটি আমার বাড়ীতে প্রবেশ করেছিল, জেকিল নিজের মুখেই স্বীকার করেছে, তার নাম হাইড- -কারুর হত্যাপরাধে গোটা দেশময় তন্নতন্ন করে খোঁজা হচ্ছে যাকে।

হেস্টি ল্যানিওন

* * *

আমার জন্ম ১৮—সালে। রুপোর চামচ মুখে দিয়ে পৃথিবীর

আলো দেখেছিলাম। বিত্ত ছিল প্রচুর, উত্তরাধিকার সূত্রে অনেক সদগুণও পেয়েছিলাম। ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। তার চেয়েও বড় কথা, আমার সম্মানজনক আর খ্যাতিময় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংশয় ছিল না কারো অন্তরে। কিন্তু যতই দিন যেতে থাকে, ততই যতকিছু অলৌকিক তান্ত্রিক মতবাদকে কেন্দ্র করে দানা বেঁধে উঠতে থাকে আমার চিন্তাধারা আর পড়াশুনা। ফলে, মানুষের মনের মধ্যে সু আর কু-এর যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব চলেছে তা ধীরে ধীরে দিনের আলোর মতই সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল আমার পর্যবেক্ষণের আওতায়। এক একটা দিন যেতে থাকে—আমি আমার ধীশক্তির নীতিগত আর বুদ্ধিগত দিক দিয়ে বিচার করে করে এগিয়ে আসতে থাকি এমন একটি মহাসত্যের দিকে—যার কিছুটা অংশ আবিষ্কার করেই আজ আমার এই ভয়াবহ পরিণতি হয়েছে। সে সত্য এই : কোনো মানুষই একক নয়—আসলে তারা দুজন। কুমেরু সুমেরুর মত অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত এ যেন যমজ ভাই—একই মানুষের ভেতরে ক্রমাগত লড়াই করে চলেছে তারা। তাদের একজন কু, আর একজন সু। আচ্ছা, এই দেবতা-প্রকৃতি থেকে কি দানব-প্রকৃতিকে আলাদা করা যায় না ?

এইসব চিন্তা নিয়ে আমি যখন খুবই ব্যস্ত, ঠিক তখনই ল্যাবোরেটরির টেবিল থেকে আরও একটা নতুন রশ্মিরেখা এসে পড়ল বিষয়টির ওপর। নতুন আভায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠল মূল চিন্তাধারাটি। দেহ নামধারী যে কঠিন 'পরিচ্ছদে'র মধ্যে আমাদের এই সত্তাগুলি নিয়ে আমরা হেঁটে বেড়াচ্ছি, তারই শিহরণ জাগানো অপার্থিবতা আর কুয়াশার মত অস্পষ্ট অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর একটি নতুন অনুভূতি আস্তে আস্তে দৃঢ়মূল হয়ে বসে যেতে লাগল আমার মনের মধ্যে। এমন কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ আমি আবিষ্কার করলাম যা এই মাংসল আচ্ছাদনকেই জোর করে ফিরিতে আনতে পারে। তারপর অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর এটা-ওটা মিশিয়ে এমন একটা ভেষজ তৈরী

করলাম যা খাইয়ে এই দুই আত্মাকে মুক্ত করা সম্ভব। সিংহাসনে বসে মাথা উঁচিয়ে যে প্রকৃতিটি অপরটিকে পদানত করে রেখেছে তাকে সিংহাসনচ্যুত করে কোণঠাসা প্রকৃতিটিকে সিংহাসনে বসানোর ক্ষমতা রইল সেই আশ্চর্য ভেষজের। অন্তত আমার তো তাই মনে হয়েছিল।

থিওরীকে কার্যকর করার আগে অনেক দ্বিধা করলাম। ভাল-ভাবেই জানতাম মৃত্যুর সঙ্গে পাশা খেলতে বসেছি। কিন্তু আবিষ্কারের প্রলোভন এমনই প্রবল আর আতীব্র হয়ে উঠল যে শেষ পর্যন্ত বিপদের ড্রিমিড্রিমি ডম্বরু সংকেতও তুচ্ছ হয়ে গেল। টিংচারটা অনেক আগেই তৈরী করে রেখেছিলাম। তখুনি একটা পাইকারী ওষুধের দোকান থেকে প্রচুর পরিমাণে বিশেষ একটা সল্ট কিনে আনলাম। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানতাম, যে মিশ্রণ আমি তৈরী করতে বসেছি, এই সল্টটিই তার সর্বশেষ উপাদান। তারপর এক অভিশপ্ত রাত্রে মৌলিক উপাদানগুলো একে একে মিশিয়ে তৈরী করলাম সেই মিশ্রণটি। বুনসেন বার্ণারে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে তা ঢেলে নিলাম একটা গেলাসে। গাঢ় ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে লাগল টগবগে তরল পদার্থটি থেকে। আস্তে আস্তে কমে এল উত্তাপ, মিলিয়ে গেল বুদবুদ-ওঠা। তারপর প্রচণ্ড সাহসে বুক বেঁধে এক নিঃশ্বাসে গিলে ফেললাম সেই বিচিত্র রঙের ভয়াবহ পানীয়।

শুরু হলো এক কল্পনাতীত নিদারুণ যন্ত্রণা। মনে হলো, দেহের প্রতিটি অস্থি যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে; প্রচণ্ড বমনোদ্রেকে সারা অঙ্গ গুলিয়ে উঠল—মনে হলো পাকস্থলী অন্ত্র সবকিছুই যেন উঠে বেরিয়ে আসতে চাইছে মুখ দিয়ে। উঃ সে কি যন্ত্রণা! সেই সাথে শুরু হলো আর একটা নতুন বিভীষিকা—আত্মার অভ্যুত্থানের বিভীষিকা—ভাষায় তা বোঝানো যায় না, জন্ম অথবা মরণের মুহূর্তেও এ রকম নিঃসীম বেদনা বুঝি কোনো মানুষ পায় না। তারপর এক সময়ে সীমাহীন, ভাষাহীন, তুলনাহীন এই যন্ত্রণাও কমে এল অত্যন্ত

দ্রুত হারে, ঠিক যেন কালব্যাধির খপ্পর থেকে বের হয়ে এলাম আমি এবং আমার আত্মা। মনে হলো যেন বয়সে অনেক ছোট হয়ে গিয়েছি আমি, আর সুখের অবধি নেই আমার অন্তরে। সেই সঙ্গে অনুভব করলাম একটা হাল্কা একগুঁয়ে বেপরোয়া ভাব যেন আমার সত্তায় সত্তায় মিশে গেছে। নতুন জীবনের প্রথম নিঃশ্বাস প্রশ্বাস শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি জেনেছিলাম আগের চাইতে দশ গুণ বেশী বদমাস হয়ে গিয়েছি আমি—আমার মূল কু-প্রকৃতির কাছে ক্রীতদাসের মতই বিকিয়ে দিয়েছি আমাকে—আমার পুরোনো সু-আত্মাকে। তারপর যখন হুটো হাত সামনে প্রসারিত করলাম, চমকে উঠলাম আমার দেহগত পরিবর্তন দেখে।

ঘরে আয়না ছিল না। তাই পড়ি কি মরি করে ছুটলাম বাড়ীর ভেতরে। আর তখনই, সেই প্রথম, দেখলাম এডোয়ার্ড হাইডের মূর্তি। আমার প্রকৃতির শয়তানি অংশটা নেহাতই অল্প, শীর্ণ আর অনুন্নত বলেই বোধ হয় এই বৈশিষ্ট্যটুকু প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছিল এডোয়ার্ড হাইডের খর্বকায় আর অল্পবয়েসী চেহারার মধ্যে। তা সত্ত্বেও আয়নার ভেতরে তাকিয়ে সেদিন সারা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলাম নিখাদ শয়তানি আর কু দিয়ে গড়া এডোয়ার্ড হাইডের মূর্তিকে।

তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এলাম। আর একবার সেই ভয়ানক টলটলে পানীয় তৈরী করে এক চুমুকে নিঃশেষ করে দিলাম। আর একবার ভোগ করলাম লক্ষ বৃশ্চিকের কামড়ের মত সেই নারকীয় যাতনা—ধীরে ধীরে এডোয়ার্ড হাইড যেন গলে গলে মিলিয়ে গেল হেনরী জেকিলের মধ্যে। ফিরে এল জেকিলের চেহারা, চরিত্র আর মুখ।

এইখানেই যদি থেমে যেতাম, তাহলে কারোরই কোন ক্ষতি হতো না। কিন্তু আমার প্রকৃতির লঘু দিকের কৌতুক প্রবণতাই আমার সর্বনাশ করলে। একই 'আমি'র হুটি সম্পূর্ণ পৃথক চরিত্র সম্বন্ধে আরও

অনেক কিছু জানার আগ্রহই আমাকে নিবৃত্ত হতে দিলে না। তাই—সোহোতে সেই বাড়ীটা নিয়ে আসবাবপত্র দিয়ে সাজিয়ে রাখলাম। এডোয়ার্ড হাইডের নামে একজন গৃহকর্ত্রীও নিয়োগ করলাম। স্ত্রীলোকটিকে আগে থেকেই জানতাম আমি। চুপচাপ থাকা আর অসাধুতাই হলো তার চরিত্রের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এরপর উইল তৈরী করে ফেললাম আমি। ডক্টর জেকিল থাকার সময়ে দৈবাৎ যদি কিছু অঘটন ঘটে যায়, তাহলে যেন এডোয়ার্ড হাইডের রূপ ধারণ করে আর্থিক ক্ষতিকে এড়িয়ে যেতে পারি।

ছদ্মরূপ ধারণের পর যে সব আনন্দের আস্বাদ পাওয়ার জন্যে চনমন করতাম আমি, তা হেনরী জেকিল হিসেবে কোনোদিন কল্পনাতেও আনতে পারতাম না। কিন্তু এডোয়ার্ড হাইডের হাতে পড়ে এই আনন্দই পরিণত হলো দানবিক উল্লাসে। বহুবার অবাক হয়ে ভেবেছি কেন আমার দ্বিতীয় প্রকৃতির চরিত্রে এত উচ্ছৃঙ্খলতা, এত নিষ্ঠুরতা। একটা দুর্ঘটনার কথাই বলি। ছোট্ট একটা মেয়ের ওপর আমার অকারণ নির্মমতায় ক্রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন একজন পথচারী। পরে অবশ্য জেনেছিলাম ভদ্রলোক তোমারই একজন জ্ঞাতি। যাই হোক, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্যে ওদেরকে নিয়ে এলাম এডোয়ার্ড হাইডের বাড়ীতে। ভেতর থেকে এনে দিলাম হেনরী জেকিলের সই করা চেক। এডোয়ার্ড হাইডের নামে আর একটা ব্যাঙ্কে তহবিল খুলে রেহাই পেয়েছিলাম এ জাতীয় বিপদের হাত থেকে। উল্টো দিকে হাত টেনে হেলিয়ে হেলিয়ে আমার দ্বিতীয় সত্তাকে যখন সই করতেও শেখালাম, তখনই বুঝেছিলাম, নিয়তির ধরা ছোঁওয়ার বাইরে চলে এসেছি আমি।

স্যার ড্যানভার্স নিহত হওয়ার মাস দুয়েক আগে অ্যাডভেঞ্চার শেষ করে বাড়ী ফিরে এসেছিলাম। নিজের ঘরে ঘুম ভাঙ্গার পরেই বিচিত্র একটা অনুভূতির অস্বস্তি জাগলো আমার দেহে, মনে। আসবাবপত্র, পর্দা চিনতে পারলাম বটে, কিন্তু দারুণ চমকে উঠলাম

নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে। সরু সরু আঙুল, দড়ির মত ঠেলে ওঠা শিরা, ইয়া মোটা মোটা হাড়ের গাঁট আর কুচকুচে কালো কর্কশ লোমের জঙ্গলে ঢাকা সে হাত এডোয়ার্ড হাইডের!

বোধ করি পুরো আধ মিনিট বিস্ফারিত চোখে তাকিয়েছিলাম সেদিকে। তারপরেই ঝনাৎ শব্দে আচমকা বেজে ওঠা করতালের মতই বুকের মধ্যে লাফিয়ে উঠল অপরিমেয় আতংক। লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে ছুটলাম আয়নার দিকে। আয়নায় যার প্রতিবিম্ব দেখলাম, তাকে দেখেই যেন জল হয়ে গেল দেহের রক্ত, শিরা উপশিরায় যেন কনকনে বরফের স্রোত অনুভব করলাম। হেনরী জেকিলরূপে ঘুমিয়েছিলাম আমি—কিন্তু ঘুম ভেঙেছে এডোয়ার্ড হাইডের। এ কি করে সম্ভব হলো?

চটপট জামাকাপড় পরে নিয়ে নিচে নেমে এলাম আমি, পা টিপে টিপে ঢুকে পড়লাম ঘরে। দশ মিনিট পর স্বমূর্তি নিয়ে বেরিয়ে এল ডক্টর জেকিল। ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছিলাম আমি। বেশ বুঝেছিলাম, বড় ভয়ানক জায়গায় এসে পৌঁচেছি আমি। বেশ কিছুদিন ধরে নিজের অজ্ঞাতসারেই এক নাগাড়ে ভেবে এসেছি, ধীরে ধীরে পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটছে এডোয়ার্ড হাইডের। আর এখন তো মনে হচ্ছে, আকারে না হোক ক্ষমতায় সে হেনরী জেকিলের সমান সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামনে দুটি পথ খোলা রয়েছে। উৎকট গোপন আনন্দে উল্লসিত এই দানবের সব রকম প্রভাব থেকে নিজেকে বিমুক্ত করে এনে জীবনে সফল চিকিৎসকের নিরালা অথচ অসুখী জীবন যাপন করা। অথবা, চিরকালের মত এডোয়ার্ড হাইডের খপ্পরে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া।

প্রথম পথই বেছে নিলাম আমি। প্রথম দুটো মাস মনের সঙ্গে দিবারাত্র প্রচণ্ড লড়াই করে প্রবল প্রলোভনকেও দূরে সরিয়ে রাখলাম। শুরু হলো বিবেকের আত্মপ্রশস্তি। অবশ্য তখনও আমি এডোয়ার্ড হাইডের জামাকাপড় বিসর্জন দিই নি। সোহোর বাড়ীটাও ছেড়ে দিই

নি। তারপরেই আবার শুরু হলো মুক্তির জন্যে হাইডের সংগ্রাম আতীব্র বেদনায় আকুঞ্চিত হয়ে হয়ে উঠল আমার অন্তর—মুক্তি চাই, মুক্তি চাই···তারপর এক দুর্বল মুহূর্তে আবার সেই মিশ্রণটা তৈরী করে গিলে ফেললাম।

দীর্ঘদিন খাঁচায় বন্দী হয়ে ছিল আমার শয়তান। তাই উপবাসী শার্দুলের মতই সে গর্জন করে জিঘাংসা-নিষ্ঠুর মন নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল বাইরে। আরকটি পান করার সময়েই সজাগ হয়ে উঠেছিলাম আরও বল্গাহীন, আরও ভয়ানক কু-প্রবণতা সম্বন্ধে। আমার মনে হয়, হতভাগ্য বৃদ্ধের বিনয় বচন শোনবার সময়ে এই ঝোঁকটাই ছটফটিয়ে উঠেছিল, দুরন্ত অসহিষ্ণুতার তুফান অনুভব করেছিলাম শিরা উপশিরার রক্তে, প্রচণ্ড আলোড়ন উঠেছিল আমার উপোসী আত্মার অতৃপ্তিতে। তাই খোকাখুকুরা খেলার জিনিস যেমন আছড়ে ভেঙে ফেলে, আমিও অনেকটা সেই ভাবেই প্রথম আঘাতটা হেনেছিলাম। পরমুহূর্তেই ঘুম ভেঙে গেল শয়তানটার—হুংকার দিয়ে লাফিয়ে উঠল সে আমার মধ্যে। নিষ্ঠুর আনন্দে যেন উন্মাদ হয়ে গেলাম আমি। আঘাতের পর আঘাত হেনে চললাম শিথিল অবশ দেহটার ওপর এবং প্রতিটি আঘাতের মধ্যে আস্বাদ পেলাম অপরিসীম উল্লাসের। মারতে মারতে যখন বেদম হয়ে পড়েছি, উন্মত্ততা যখন চরমে পোঁচেছে, ঠিক তখনি কনকনে হিমস্রোতের মতই আতংকের প্রবাহে অবশ হয়ে এল আমার হৃৎপিণ্ড। সরে গেল কুয়াশার আবরণ; দিব্য চোখে দেখতে পেলাম আমার জীবনের এই ব্যর্থতা। কাঁপতে কাঁপতে অকুস্থল ছেড়ে তখনি ছুটে পালিয়ে গিয়েছিলাম আমি। পরিতৃপ্ত হয়েছিল আমার কু-কাজ প্রবণতা এবং আরও উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল আমার কু-আসক্তি, কানায় কানায় ভরে উঠেছিল জীবনের প্রতি আমার ভালবাসা। এক দৌড়ে সোহোর বাড়ীতে পৌঁছে দরকারী কাগজপত্র যা পেলাম, সব পুড়িয়ে ছাই করে দিলাম। সেইরাত্রে আরকটি তৈরী করার সময়ে আনন্দ সঙ্গীতে মুখর হয়ে উঠেছিল হাইডের অন্তরাত্মা,

পান করার সময়ে জয়ধ্বনি করেছিল নিহতকে উদ্দেশ করে। রূপান্তরের সেই অবর্ণনীয় বেদনা তাকে অনুভব করতে হয় নি যতক্ষণ না বাষ্পাচ্ছন্ন চোখে হেনরী জেকিল ফুটে উঠেছিল তার অপসৃয়মান অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। জানু পেতে বসে করজোড়ে অনুতাপ আর কৃতজ্ঞতার অশ্রুসিক্ত নয়নে ঈশ্বরের কাছে সেদিন সে আকুল প্রার্থনা জানিয়েছিল। আপাদমস্তক আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল আত্ম-ধিক্কারের আবরণে। গোটা জীবনটাকে চোখের সামনে দেখতে পেয়েছিলাম আমি। ইচ্ছে হয়েছিল গলা ছেড়ে কাঁদি, চিৎকার করে সবাইকে জানাই কি ভয়ানক বিষময় পরিণতির মধ্যে এসে পড়েছি আমি। বীভৎস মূর্তি আর বিকট শব্দে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল আমার স্মৃতি—চোখের জলের মধ্যে দিয়ে ভগবানের কাছে বারবার প্রার্থনা জানিয়েছি এই ভয়াবহ জনতার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার শক্তি লাভের জন্যে। ধীরে ধীরে অনুতাপের তীব্রতা কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে একটা নতুন আনন্দের অনুভূতিতে অনেকখানি জ্বালা জুড়িয়ে এল। আমার দ্বৈত আচরণের যে সমস্যা, এতদিনে তার সমাধান পাওয়া গেল। এই কাণ্ডর পর থেকে হাইড অসম্ভব। আমি চাই আর না চাই, আমার ভাল দিক নিয়েই এবার থেকে আমায় থাকতে হবে। ওহো, কি বিপুল আনন্দই অনুভব করেছিলাম এই চিন্তায়।

পরের দিন হত্যার খবর আর হাইডের কুকাজের বিবরণ ছড়িয়ে পড়ল সারা দুনিয়ায়। এবার জেকিলের প্রতিশোধ নেওয়ার পালা। মুহূর্তের জন্যেও বাইরের জগতে উঁকি মারলেই শত শত নাগরিকের হাতে সাড়ম্বরে শেষ হবে হাইড-নিধন-পর্ব।

আমার ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর মধ্যেই অতীতের প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন করলাম। মিথ্যে বলবো না, এর ফলে আমার কিছুটা উপকার হয়েছিল। তুমি তো জানোই গত বছরের শেষ ক'টা মাস আত্ম-যন্ত্রণাকে প্রশমিত করার জন্যে কি পরিশ্রমটাই না করেছি আমি। কিন্তু আমার দ্বৈত সত্তার অভিশাপ থেকে তবুও মুক্তি পেলাম না।

অনুতাপ আর প্রায়শ্চিত্ত পর্বের প্রথম ঝোঁকটা ঝিমিয়ে আসতেই দীর্ঘদিন ধরে প্রশ্রয়-পাওয়া অথচ সম্প্রতি শেকল বাঁধা নিকৃষ্ট সত্তাটা আবার গজরাতে শুরু করলো। মুক্তি চাই, মুক্তি চাই। হাইডকে আমার বাঁচিয়ে তোলার কথা কিন্তু স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না আমি। মনের মধ্যে এ-ধরনের চিন্তার ছায়া পড়লেও ক্ষিপ্তের মত অস্থির হয়ে উঠতাম আমি। না, না, বিবেকের সঙ্গে আত্মার লড়াইয়ের এ রকম অভিজ্ঞতা পৃথিবীর মানুষের জীবনে এই প্রথম এবং বোধ করি এই শেষ।

সব কিছুরই শেষ আছে। আমার কু-সত্তার এই অবদমন শেষ পর্যন্ত আমার আত্মার ভারসাম্যও নষ্ট করে দিলে। তবুও ভয় পেলাম না আমি। মনের এই অধোগতিও কিন্তু নিতান্তই স্বাভাবিক বলেই মনে হলো। এই আবিষ্কারের আগে সব কিছুই যেমন স্বাভাবিক ছিল, মনে হলো ঠিক যেন সেই রকমটিই আছি।

জানুয়ারীর এক দুপুরে রিজেন্ট পার্কে রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে বসেছিলাম আমি। আকাশ পরিষ্কার ঝলমলে, নির্মেঘ। বাতাসে বসন্তের মনমাতানো সৌরভ। মাটিতে ছড়িয়ে তুলোর মত তুষার—পা পড়লেই তা জলে পরিণত হচ্ছে। আমার ভেতরকার জানোয়ারটা লোলুপ জিহ্বা মেলে লেহন করে চলেছিল সুখময় স্মৃতিকে! একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল আমার আত্মিক প্রকৃতি - অনুতাপের দহনও আগের চেয়েও অল্প। ভাবছিলাম, আর যাই হোক, আমি তো আমার প্রতিবেশীদের মতই—। ভাবতে ভাবতে আপন মনেই হাসতে লাগলাম আমি। অন্যান্যর সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে, তাদের অবহেলার অলস নিষ্ঠুরতার সঙ্গে নিজের যশের তুলনা করে আপন মনেই হাসতে লাগলাম আমি।

ঠিক এই মুহূর্তে, দাম্ভিক এই চিন্তাধারার শুরুতেই, আচম্বিতে আমি অভিভূত হয়ে গেলাম একটা আশ্চর্য বিবমিষায়। ভয়ংকর বমনোদ্রেকে অন্ত্রপাকস্থলী ঠেলে আসতে চাইল—মৃত্যু-সমান কাঁপুনিতে

খিল লেগে গেল হাতে-পায়ে। অল্পক্ষণের মধ্যেই অন্তর্হিত হলো এই বিচিত্র যন্ত্রণাবোধ, জ্ঞানশূন্য হয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল ; মনের কুয়াশা থিতিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করলাম পরিবর্তন এসেছে আমার চিন্তাধারার মেজাজে, অধিকতর বলিষ্ঠতা আর বিপদের প্রতি অবজ্ঞা মিশানো ঘৃণায় ভরে উঠেছে সারা অন্তর। চোখ নামালাম আমি। দেখলাম, সঙ্কুচিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর বেঢপ হয়ে ঝুলছে আমার পোশাক। আর, হাঁটুর ওপর রাখা দুহাতে যেন মন্ত্রবলে দেখা দিয়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ লোম আর দড়ির মত শিরা উপশিরা। আমি আবার এডোয়ার্ড হাইড হয়ে গিয়েছি।

মানুষ আমাকে খুঁজছে ফাঁসিকাঠে তোলার জন্যে। আমি গৃহহীন, বন্ধুহীন, হত্যাকারী। আমি সমাজের শত্রু, মানবতার শত্রু। আমি নিষ্ঠুর, নির্মম, নির্দয়।

টলমল করে উঠলো আমার যুক্তিবুদ্ধি—কিন্তু লোপ পেল না কিছুই। একাধিক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি, যখনই আমার দ্বিতীয় চরিত্র জাগ্রত হয়, তখনই আতীব্র হয়ে ওঠে আমার উপস্থিত বুদ্ধি, সাহস আর শক্তি। মগজ ধারালো হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যেন আসুরিক উদ্দীপনার প্লাবন বয়ে যায় আমার অন্তরে। এবারও তার ব্যতিক্রম হলো না। এ রকম পরিস্থিতিতে হেনরী জেকিল একেবারেই ভেঙে পড়তো। এডোয়ার্ড হাইড কিন্তু তৎক্ষণাৎ তৎপর হয়ে উঠলো। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত—এখন মুষড়ে পড়লে চলে কি। আমার ক্যাবিনেটেরই একটা ড্রয়ারে আছে আরক তৈরীর উপাদানগুলো কি করে পৌঁছোনো যায় সেখানে ? নিজেই সমাধান করতে বসলাম এই সমস্যার। ল্যাবোরেটরির দরজা বন্ধ করে চিরকালের মত তালা ঝুলিয়ে দিয়েছি। বাড়ীতে ঢুকতে গেলে আমার চাকরবাকরেই আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে ছাড়বে। ভেবে দেখলাম, অন্য কাউকে নিয়োগ করা দরকার। তখনই ল্যানিওনের কথা মাথায় এলো

আমার। তার কাছে যাওয়া যায় কি করে? কি করেই বা বুঝবো তাকে? রাস্তায় না হয় সবার চোখ এড়িয়ে গা বাঁচিয়ে তার বাড়ী পর্যন্ত পৌছোনো গেল, তারপর? তার সামনে হাজির হওয়াই কি এতই সোজা? অপরিচিত বিকট চেহারার একজন আগন্তুক কিভাবে তার মত একজন বিখ্যাত চিকিৎসকের সামনে হাজির হয়ে সহকর্মী ডক্টর জেকিলের ভাগ্য নিয়ে আলোচনা করবে? এর পরেই মনে পড়লো আমার আদৎ চরিত্রের একটা অংশ তো এখনও থেকে গিয়েছে: আমি এখনও আমার পুরোনো ঢংয়েই লিখতে পারি। মতলবটা বিদ্যুৎ চমকের মত মাথায় খেলে যেতেই আমার পরবর্তী কর্মপন্থার গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত দিনের আলোর মতই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল মগজের কোষে কোষে।

জামাকাপড় গুটিয়ে যতখানি সম্ভব ভদ্র হলাম। তারপর একটা চলন্ত ঘোড়ার গাড়ী ডেকে পোর্টল্যাণ্ড ষ্ট্রীটের একটা হোটেলে গেলাম। হোটেলের নামটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার। আমার চেহারা দেখে গাড়োয়ানের মুখে কৌতুক উপচে পড়ল। কিন্তু ওর মুখের সামনে মুখ নিয়ে গিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে উঠতেই উবে গেল ওর কৌতুক। আমার দাঁতপেশা বীভৎস ক্রোধ আর নারকীয় নিষ্ঠুরতা দেখেই ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল ও। তাইতেই বেঁচে গিয়েছিল হতভাগা। আমিও বেঁচে গিয়েছিলাম। কেন না, পরের মুহূর্তেই ওকে আমি আসন থেকে টেনে আনতাম নিশ্চয়। হোটেলে ঢোকবার সময়ে এমন ঘোর মুখ নিয়ে আশে পাশে তাকিয়েছিলাম যে পরিচারক-গুলো তাই দেখেই ঠকাঠক কাঁপতে শুরু করে দিল। আমার সামনে দৃষ্টি বিনিময় করার সাহসও ওদের ছিল না। মাথা নিচু করে আমার হুকুম তামিল করেছে, পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে একটা প্রাইভেট কক্ষে, এনে দিয়েছে চিঠি লেখার কাগজ কলম। বিপদে পড়ে পশু হাইডের আর একমূর্তি দেখলাম সেদিন। বিপদের মধ্যে এ এক সম্পূর্ণ নতুন মূর্তি। অকারণ ক্রোধে কম্পমান, খুনের নেশায় পাগল, আঘাত

হেনে যন্ত্রণা সৃষ্টির দুর্বার প্রবণতায় উন্মাদ। কিন্তু তবুও গ্র্যানাইট মূর্তির মতই অটল সে। প্রচণ্ড আত্মশক্তি বলে এমন দুরন্ত বীভৎস আক্রোশকেও সে কঠিন নিগড়ে বেঁধে রেখে দিলে। আ-কাঁপা হাতে লিখে ফেলল দু'দুটো গুরুত্বপূর্ণ চিঠি। একটা ল্যানিওনের নামে, অপরটা পুলের নামে। চিঠি দুটো যে ডাকে গেছে তার অকাট্য প্রমাণ দেখার আয়োজনও হলো। নির্দেশ রইল, দুটো চিঠিই যেন রেজিষ্টার্ড পোষ্টে যায়।

তারপর সারাটা দিন সে প্রাইভেট রুমে আগুনের ধারে বসে বসে দাঁত দিয়ে নখ খুঁটতে লাগল। সেইখানেই রাতের খাওয়া শেষ করে একলা বসে রইল নিজের আতংক নিয়ে। ওর চোখে চোখ পড়তেই ওয়েটার বেচারী ভয়ে এতটুকু হয়ে প্রতিবারই সরে পড়লো ঘর ছেড়ে। তারপর রাত যখন আরো গভার হলো, হোটেল ছেড়ে বেরোলো সে বাইরে। চারদিক বন্ধ একটা ভাড়াটে গাড়ীর এক কোণে বসে লক্ষ্য-হীনভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল শহরের রাস্তায় রাস্তায়। আমি 'সে' বলছি—'আমি' বলব না, বলতে পারি না। নরকের এই দূতের মধ্যে মানবতার ছিটেফোঁটাও ছিল না। আতংক আর ঘৃণা ছাড়া আর আর কোনো ভাবই স্থায়ী হতে পারে নি তার অন্তরে। শেষ কালে গাড়োয়ানও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল এই এলোমেলো ছুটোছুটি দেখে। গাড়ী ছেড়ে দিয়ে এবার সে পায়ে হেঁটেই রওনা হলো। সারা অঙ্গে ঝুলতে লাগল বিদঘুটে বেঢপ পোশাক, যা দেখলেই লোকের হাসি পায়, সন্দেহ হয়। এই নিয়েই নৈশ পথচারীদের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে এগিয়ে চলল সে। বুকের মধ্যে তুফানের মত গর্জে ধেয়ে চললো আতীব্র দুটি আবেগ—আতংক আর ঘৃণা।

ভয় যেন কুকুরের মত তাড়া করে নিয়ে চলল তাকে। আপন মনেই বিড় বিড় করতে করতে দ্রুত পায়ে সে এগিয়ে চলল অপেক্ষাকৃত জনহীন পথ বেয়ে। চোরের মত ঘাপটি মেরে যেতে যেতে বারবার সময় দেখে হিসেব করতে লাগল মাঝরাতের আর কত দেরী। একবার

একজন স্ত্রীলোক সম্ভবত একবাক্স বাতি বিক্রী করার জন্যে তার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল, কিন্তু গালের ওপর এক চপেটাঘাতেই চোঁ চাঁ দৌড় দিলে সে।

ল্যানিওনের বাড়ী এসে আশ্বস্ত হবার পর, বন্ধুবরের আতংক যেন আমাকেও পেয়ে বসল। ফেলে আসা ঐ কটা ঘণ্টার কথা ভেবে ঘৃণায় আমার গা রি-রি করে উঠেছিল। নিজের মধ্যেই একটা পরিবর্তন অনুভব করছিলাম। না, ফাঁসিকাঠের বিভীষিকা নয়, হাইডের আগমন সম্ভাবনার চিন্তাই যেন উন্মাদ করে তুলল আমাকে। যেন স্বপ্নের মধ্যেই ল্যানিওনের ধিক্কার শুনেছিলাম। যেন স্বপ্নের মধ্যেই নিজের বাড়ী ফিরে এসে গা এলিয়ে দিয়েছিলাম শয্যায়। সারাদিনের অমানুষিক উদ্বেগ-উত্তেজনা-পরিশ্রমের পর মড়াই মতই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি। অতি বড় দুঃস্বপ্নেরও সাধ্য ছিল না সে ঘুম ভাঙানোর। ভোরবেলা ঘুম ভাঙলো। গতদিনের দুর্যোগে হৃদয়ের মূল পর্যন্ত মুচড়ে গিয়েছিল বটে, অন্যান্য দিনের চাইতে নিজেকে বড় দুর্বল মনে হচ্ছিল বটে, তবুও গাঢ় সুপ্তির পর অনেকটা ঝরঝরে বোধ করলাম নিজেকে। আমার ভেতরকার কুচক্রীক্রূর পশুটাকে ভয় করতে আরম্ভ করেছিলাম, ঘৃণাও ছিল প্রচুর। গত-দিনের ভয়ানক বিপদও ভুলতে পারছিলাম না কিছুতেই। একমাত্র সান্ত্বনা, অমন বিপদের মধ্যে থেকেও ফিরে এসেছি আমি আমার নিজের প্রকোষ্ঠে, আরক আর উপাদানের একেবারে কাছটিতেই রয়েছি বসে। সুতরাং আর ভয় কিসের? আশার আলোয় ধীরে ধীরে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে লাগল আমার অন্ধকারময় অন্তর।

প্রাতরাশ খাওয়ার পর উঠোনে আস্তে আস্তে পায়চারী করছি, সারা অঙ্গ দিয়ে উপলব্ধি করছি বাতাসের হিম-হিম আমেজটুকু, ঠিক এই সময়ে আবার ফিরে এল সেই অবর্ণনীয় অনুভূতি- -যে অনুভূতির পরেই আবির্ভাব ঘটে হাইডের। নরকের আগুন অন্তরে নিয়ে হাইড ফুঁসে ওঠার আগেই কোনমতে পড়ি কি মরি করে এসে পৌছোলাম

আমার ঘরে। এবার দ্বিগুণমাত্রার আরক পান করে আবার ফিরে পেলাম স্বমূর্তি। কিন্তু হায় রে! ছ'ঘণ্টা পরে বিমর্ষচোখে আগুনের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকার সময়ে আবার ফিরে এল সেই যন্ত্রণা-অনুভূতি। আবার পান করতে হলো আরকটি। সংক্ষেপে, সেই দিন থেকে কেবলমাত্র প্রবল ইচ্ছাশক্তি বলে আর আরকের প্রভাবে জেকিলের খোলসকে টিঁকিয়ে রাখতে হয়েছে আমাকে। দিনরাতের সব সময়েই থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠতাম আমি। মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইত বন্দী দানবটা। এমন কি, যখনই ঘুমোতাম অথবা চেয়ারে বসে মুহূর্তের জন্যেও ঢুলতাম—প্রত্যেক বারই সজাগ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কার করতাম হাইড ফিরে এসেছে। বিরামবিহীন বিভীষিকা আর বিষাদের অসম্ভব প্রচাপ আর নিদ্রাহীনতার ফলে, আমার যে কি হাল হয়েছে, তা বলে বুঝানো যাবে না। ঘুমকে আমি চোখ থেকে তাড়িয়েছি। যেন জ্বরের উত্তাপে পুড়ে যাচ্ছে সারা গা, হেনরী জেকিল হয়ে বসে আছি বটে, কিন্তু ভেতরটা যেন ফোঁপরা হয়ে গিয়েছে। শরীর আর মনে শক্তির কণামাত্রও নেই। একটি মাত্র চিন্তাই আমাকে ছেয়ে রয়েছে—আমার আরেকটি সত্তার বিভীষিকা।

কিন্তু ঘুমের সময়ে অথবা আরকের প্রভাব যখন মিলিয়ে যেতে থাকে, তখনই প্রায় আচমকাই জেকিলকে সরিয়ে দিয়ে ফুটে বেরুতে থাকে হাইড। প্রতিদিনই রূপান্তরের সময় যে নিদারুণ বেদনা প্রথম প্রথম অনুভব করেছিলাম, দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা ক্রমশই মৃদু হয়ে আসছিল। শেষকালে যন্ত্রণা অনুভব করার আগেই রূপান্তর সম্পূর্ণ হয়ে যেত। আতংকের প্রতিচ্ছবি, আর কারণবিহীন ঘৃণায় টগবগিয়ে ফুটে উঠত আমার অন্তরাত্মা। জীবনের ফুটন্ত এনার্জিকে ধরে রাখার পক্ষে নিতান্তই কৃশকায় অশক্ত মনে হতো শরীরটাকে। জেকিলের শারীরিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যেন আরও ফুলে ফুঁসে উঠেছিল হাইডের শক্তি। যে ঘৃণার প্রাচীর পৃথক করে রেখেছিল দুজনকে,

দুজনের মনেই তা সমপরিমাণে ছড়িয়ে পড়েছিল। জেকিলের পক্ষে তা সহজাত এবং স্বাভাবিক। দানবটার স্বরূপ তো সে দেখেছে, মৃত্যুর পরোয়ানা একজনের শিরে নেমে এলে অপরজনকেও তার অংশীদার হতে হবে। তারই মাংসের মধ্যে বন্দী সেই হিংস্র দৈত্যটার দাপাদাপি, গজরানি প্রতি মুহূর্তে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে জেকিলের কানে। দুর্বলতার মুহূর্তে অথবা সুপ্তির অনবধানতায় সে লাফিয়ে বেরিয়ে আসত বাইরে—জেকিলকে পাঠিয়ে দিত তারই মাংস-মেদ-মজ্জার কারাগারে।

জেকিলের প্রতি হাইডের ঘৃণা কিন্তু অন্য ধরনের। ফাঁসির মঞ্চের বিভীষিকাই ক্রমাগত ওকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে সাময়িক আত্মহত্যার দিকে—জেকিলের মধ্যে ঘাপটি মেরেছে শুধু এই কারণেই। কিন্তু অন্তর থেকে সে ঘৃণা করে এই ছদ্মরূপকে। জেকিলের এই নিঃসীম নৈরাশ্যকেও সে ঘৃণা করে সারা অন্তর দিয়ে। জেকিলের ওপর তার সব চাইতে বেশী আক্রোশ। কেন না জেকিল হাইডকে দুচক্ষে দেখতে পারে না। কাজেই মাংসপিঞ্জরে বন্দী থেকেও বাঁদরামোর অন্ত ছিল না তার। আমারই বইয়ের পাতায় আমারই হাত দিয়ে বিদিগিচ্ছিরি মূর্তি আঁকা আর হিজিবিজি কাটা, পাতা ছিঁড়ে পুড়িয়ে ফেলা, আমার বাবার ছবির দফারফা করা ইত্যাদি যত রকম নষ্টামি তার পক্ষে সম্ভব, কিছুই বাদ দিলে না সে। সত্যি কথা বলতে কি, তার নিজের মৃত্যু ভয় না থাকলে অনেক আগেই শুধু আমাকে এ দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্যে নিজের চারিদিকে চরম বিপদ জড়ো করতেও দ্বিধা করতো না সে। কিন্তু আশ্চর্য তার জীবনের প্রতি মমতা। ওর কথা বেশী ভাবলেই আমার বুকের রক্ত জমে যায়, সহস্র বৃশ্চিক নৃত্য করে ওঠে মগজের কোষে কোষে। অথচ যখনই ভাবি যে একদিক দিয়ে আমাকে সে ভয় করে, সে জানে আত্মহত্যা করে তার লীলাখেলাও সাঙ্গ করে দেওয়ার ক্ষমতা আমার আছে। একথা ভাবলেই ওর প্রতি অনুকম্পায় নরম হয়ে আসে আমার উদ্‌ভ্রান্ত মন।

বৃথাই এত কথা লিখছি। বৃথাই এত বর্ণনা দিয়ে সময় নষ্ট করছি। শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, যে যন্ত্রণা আমি দিবানিশি ভোগ করছি, যে মানসিক উৎপীড়নে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে আমার অন্তর—তা ইতিপূর্বে কোনো মানুষ ভোগ করে নি। বার বার ব্যবহার করার ফলে ফুরিয়ে এসেছিল সল্টটা। নতুন সল্ট আনিয়ে আরক তৈরী করে পান করলাম। কিন্তু কোনো ফল হলো না। পুলের কাছেই তুমি শুনবে, কিভাবে গোটা লণ্ডন শহর তোলপাড় করে ফেলেছি ঐ বিশেষ সল্টটির জন্যে। কোন লাভ হয় নি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভেজাল মিশানো ছিল প্রথমবারের সল্টেই এবং আরকের যা কিছু গুণবত্তা, তা এই বিমিশ্র সল্টের জন্যেই।

এক হপ্তা কেটে গেছে। কুড়িয়ে কুড়িয়ে পুরোনো পাউডারের যেটুকু পেয়েছি, তাই দিয়ে বানানো আরকের প্রভাব থাকতে থাকতেই শেষ করে আনছি এই লোমহর্ষক বৃত্তান্ত। এই শেষবারের মত দর্পণের বুকে হেনরী জেকিল তার নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছে, চিন্তা করছে নিজেরই চিন্তা। আহা রে, বিষাদমাখা মুখটায় কি অসম্ভব পরিবর্তনই না এসেছে! আশ্চর্য! সবই আশ্চর্য। বিবরণের অন্তে পৌছোতে আর বেশী দেরি করবো না। খানিকটা বিচক্ষণতা আর ভাগ্য নেহাতই সুপ্রসন্ন থাকার ফলে এতদিন ধরে লেখা এই রিপোর্ট নষ্ট হয়ে যায় নি। লিখতে লিখতে যদি পরিবর্তনের ধাক্কা আসে, তাহলেই পলক ফেলার আগেই সব কিছুই কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলবে হাইড। কিন্তু তার বেশ কিছুক্ষণ আগেই যদি কাগজগুলো সরিয়ে রাখতে পারি, তাহলে হয়তো ওর বিস্ময়কর স্বার্থপরতা আর সেই মুহূর্তের সীমাবন্ধনের সুযোগে মূল্যবান পুঁথির মতই এই বিবরণ তার বানরসুলভ নষ্টামির হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবে।

বাস্তবিকই যে বিষাদাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের ছায়া এর মধ্যে আমাদের দুজনের ওপরেই ঘনিয়ে এসেছে, তাইতেই প্রায় ধ্বংস হয়ে এসেছে

সে। তখন থেকে ঠিক আধঘণ্টা পরে যখন আবার আমাকে ঘাড় ধরে ফিরিয়ে নেওয়া হবে আমারই সেই ঘৃণ্য ব্যক্তিত্বে, আমি জানি তখন কি ভাবে এই চেয়ারেই বসে ঠক ঠক করে কাঁপবো আমি, অথবা কাঁদতে থাকবো অঝোরধারে। আমি জানি তখন কিভাবে নিঃসীম আতংকে উৎকর্ণ হয়ে, অপরিসীম উদ্বেগে প্রতিটি স্নায়ু টান-টান করে এই ঘরেই পিঞ্জরাবদ্ধ শার্দুলের মতই পায়চারী করতে থাকবো এমোড় থেকে ওমোড় পর্যন্ত। এই ঘরই আমার সর্বশেষ পার্থিব আশ্রয়। এই ঘর থেকেই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিটি নিরীহ শব্দের মধ্যে মৃত্যুর ডম্বরু সংকেত শুনে আঁৎকে উঠবো বারবার। ফাঁসির দড়িতেই কি তাহলে প্রাণ দিতে হবে হাইডকে? এমনও তো হতে পারে যে শেষ মুহূর্তে নিজেকে খালাস করে নিয়ে উধাও হওয়ার মত যথেষ্ট সাহস এসে যাবে তার মুমূর্ষু অন্তরে? ভগবানই জানেন কি হবে। আমিও বেপরোয়া। এই হলো আমার মরণের সত্যিকারের মুহূর্ত। এরপরে যা হবে, তার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই। তাই লেখনী নামিয়ে রেখে এই রোমাঞ্চকর স্বীকারোক্তি গালামোহর করার আগে ভাগ্যহীন দুঃখ জর্জরিত হেনরী জেকিলের শোচনীয় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাচ্ছি।

খুনে মেশিন

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

খোঁচা খোঁচা ধারালো পাথরের ওপর পা রেখে রেখে অত্যন্ত নার্ভাসভাবে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠেছে একজন রাশিয়ান সোলজার। হাতের বন্দুক উদ্যত। মুহূর্তের নোটিসে অগ্নিবর্ষণ করতে প্রস্তুত। বিষম আতংকে মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গিয়েছে লোকটার, টিপটিপ করছে বুক। জুলজুল করে তাকাচ্ছে ডাইনে বাঁয়ে পেছনে। মাঝে মাঝে দস্তানা পরা হাত দিয়ে মুছছে ঘাড়ের ঘাম। জিভ বুলিয়ে নিচ্ছে শুকনো ঠোঁটে। শক্ত হয়ে উঠেছে চোয়ালের হাড়।

ভিউ সাইটে সেই চেহারা দেখে কর্ণেল লিয়োনের পানে ফিরে তাকাল এরিক।

বলল—'বলুন কি হুকুম। আপনি খতম করতে চান তো করতে পারেন। নয় তো বলুন আমিই শুইয়ে দিচ্ছি।'

দ্বিধায় পড়ল লিয়োন। রাশিয়ান সোলজার ততক্ষণে অনেক কাছে এসে গিয়েছে। প্রায় দৌড়োচ্ছে বললেই চলে। চোখ মুখের ভয়-তরাসে ভাবটা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে কাঁচের পর্দায়।

বলল—'খবরদার, এখন ফায়ার নয়।'

'কেন, কর্ণেল ?'

'দরকার হবে বলে মনে হয় না', অদ্ভুত স্বর লিয়োনের।

দ্রুত পা চালাচ্ছে রাশিয়ান। লাথি মেরে সরিয়ে দিচ্ছে ছাই আর আবর্জনার স্তূপ। উঠে এসেছে পাহাড়ের মাথায়। হাঁপাচ্ছে। বড় বড় চোখে দেখছে এদিক ওদিক।

মাথার ওপরে নীল আকাশে ভাসছে ধূসর মেঘ। ধূসর পদার্থ-কণিকায় বোঝাই বলেই এ-মেঘের রঙও ধূসর। গাছগুলো ন্যাড়া বোঁচা চেহারা নিয়ে কবন্ধ ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে আশে পাশে।

জমিতে ঘাস পাতার চিহ্নমাত্র নেই। ধরিত্রী যেন বন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে দিগন্ত পর্যন্ত। দু'চারটে বাড়ী এখনো দাঁড়িয়ে আছে মহাশ্মশানে হলুদ করোটির মত।

কিছুতেই সহজ হতে পারছে না রাশিয়ান সোলজার। ছটফট করছে আত্যন্তিক উত্তেজনায়। বেশ বুঝছে, কোথায় যেন একটা গোলমাল হয়েছে—কিন্তু ধরতে পারছে না সেটা কি। উসখুস করতে করতে এসে দাঁড়াল বাঙ্কারের একদম সামনে।

মটমট করে আঙুল মটকে রিভলবার লোফালুফি করে নিল এরিক। তাকাল কর্ণেলের পানে। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। ভাবখানা— 'আর কেন? হুকুম দিন, উড়িয়ে দিই রাশিয়ানের কলজেটা।'

এরিকের ছটফটানি লক্ষ্য করে বললেন কর্ণেল—'অত ধড়ফড় করার কি আছে? আমাদের কিছু করারও দরকার হবে না—ওরাই করবে!'

'যদি না করে? দেখছেন না কদ্দুর এগিয়ে এসেছে?'

'বাঙ্কারের চারধারে গিজ গিজ করছে ওরা। ঠিক সেইখানেই পা দিতে চলেছে তোমার টার্গেট। দেখই না কি হয়।'

রাশিয়ান সোলজার এবার যেন পালাতে পারলে বাঁচে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝেছে নিশ্চয় জায়গাটা নিরাপদ নয় মোটেই—অদৃশ্য আতংক ওৎ পেতে রয়েছে চারধারে।

তাই হড়কে পাহাড় বেয়ে নেমে এল খানিকটা। বুটের লাথিতে ছড়িয়ে গেল স্তূপাকৃতি ছাই—বন্দুকটি কিন্তু বাগিয়ে রয়েছে আগের মতই শক্ত হাতে।

আচমকা ফিল্ডগ্লাস চোখে লাগাল রাশিয়ান। মুহূর্তের জন্য স্থাণু হয়ে দূরবীন ফেরালো বাঙ্কারের দিকেই।

বাঙ্কারের মধ্যে থেকেও ফিসফিস করে উঠল এরিক—'দেখতে পেয়েছে আমাদের! দেব নাকি মাথাটা উড়িয়ে?'

জবাব দিল না লিয়োন। রাশিয়ান এগিয়ে আসছে এই দিকেই।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চোখ দুটো—ঠিক যেন একজোড়া নীল পাথর। মুখটা অল্প হাঁ করা। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি—সাবান-বুরুশ-ক্ষুরের ছোঁয়া লাগেনি অনেকদিন। হাড় বার করা একটা গালে চৌকোনা টেপ—কিনারায় নীল দাগ। ছত্রাকের আক্রমণ নিশ্চয়। কোট কর্দমাক্ত এবং শতচ্ছিন্ন। একটা হাতা নিপাত্তা। ছোটার তালে গায়ের ওপর বার বার আছড়ে পড়ছে কোমরের বেল্ট কাউন্টার।

সহসা এরিকের বাহুস্পর্শ করল লিয়োন—'আসছে!'

তখন ভরদুপুর হলেও সূর্যের আলোয় সে তেজ নেই। ম্যাড়মেড়ে আলোয় সহসা ছাইয়ের আড়ালে ঝলসে উঠল ক্ষুদ্রকায় একটা ধাতুর জিনিস। একটা বল। ধাতব গোলক। রাশিয়ান পাহাড় বেয়ে ছুটছে ওপরে—ধাতুর বলটাও ছুটে আসছে পেছন পেছন। ছোট্ট বল; শিশুবল বললেই চলে—বয়স্ক নয়। আকারেও তেমন বড় নয়! দু'টো থাবা ক্ষুদে ক্ষুরের মত বেরিয়ে আছে বলের বাইরে। প্রচণ্ড বেগে পাকসাট খাওয়ার ফলে আবছা মত সাদাটে ইস্পাতটুকুই কেবল দেখা যাচ্ছে—জোড়া ক্ষুর বলে মনেই হচ্ছে না।

ছাই উড়িয়ে বনবন করে ঘুরতে ঘুরতে অনেকটা পথ উঠে আসতেই শব্দটা কানে গেল রাশিয়ানের।

থমকে দাঁড়িয়েই ফিরে তাকালো পেছনে। নীল পাথরের মত চোখ দুটো বিস্ফারিত হল পলকের জন্যে। পরের মুহূর্তেই গর্জে উঠল হাতের বন্দুক। রেণুরেণু হয়ে মিলিয়ে গেল বর্তুলটা। ততক্ষণে কিন্তু আবির্ভূত হয়েছে আর একটা বর্তুল—পাছু নিয়েছে প্রথমটির। ফের ফায়ার করল রাশিয়ান।

পলক ফেলার আগেই তৃতীয় বর্তুলটা যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এসে বাঁই বাঁই করে ঘুরতে ঘুরতে লাফ দিয়ে পড়ল রাশিয়ানের পায়ের ওপর—সড় সড় করে উঠে গেল ঘাড়ের কাছে এবং চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেল কণ্ঠনালীর মধ্যে।

এতক্ষণে যেন দমবন্ধ করেছিল এরিক। এখন পাঁজর খালি করে

বেরিয়ে এল নিঃশ্বাসের ঝড়। শিথিল হল উৎকণ্ঠ টনটনে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

বলল সহজ গলায়—'অলুক্ষুনে বলগুলো দেখে দেখে চোখ পচে গেল। তবুও প্রত্যেকবার হাড় পর্যন্ত হিম যায়। বেশ ছিলাম আগে—খাল কেটে কুমীর ডেকে এনে কি বিপদই না করলাম।'

ডাকাবুকো লিয়োনের পর্যন্ত গা শিরশির করছে সেই দৃশ্য দেখে। কাঁপা আঙুলে সিগারেট ধরিয়ে বললে—'দোষটা এখন আমাদের ঠিকই—কেন মরতে বানাতে গিয়েছিলাম সর্বনেশে বলদের। কিন্তু একটা কথা খেয়াল রেখো, আমরা না বানালেও ওরাই বানিয়ে নিত নিজেদের।' একটু থেমে—'কিন্তু রাশিয়ানটা একা এদিকে এল কেন বুঝছি না। কোনোদিন তো আসে না। পেছনেও কাউকে দেখলাম না।'

টানেলের মধ্যে দিয়ে বাঙ্কারে উঠে এলেন লেফটেন্যাণ্ট স্কট।

'ব্যাপার কি? কাকে দেখলে স্ক্রীনে?'

'একটা রাশিয়ানকে।'

'একটাই?'

ভিউ স্ক্রীন ঘুরিয়ে চারদিক দেখল এরিক। স্কট চেয়ে রইল। পর্দার দিকে। না, আর কেউ নেই। শুধু সেই রাশিয়ানটা চিৎপাত হয়ে পড়ে ছাই আর রাবিশের মধ্যে। অসংখ্য ধাতব বর্তুল কিল বিল করছে দেহের ওপর। ঘূর্ণ্যমান ব্লেডের ফুরফুর শব্দ শোনা যাচ্ছে, ধাতুতে ধাতুতে ঠোকা ঠুকির টুংটাং আওয়াজ হচ্ছে। বল, বল, শুধু বল। রাশিয়ানের রক্তমাংসের দেহটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলেরাই।

'খাবার কি আর শেষ নেই!' নিজের মনেই বললেন স্কট।

'যা বলেছেন। মাছির মত ভন ভন করে আসে পালে পালে। হন্যে হয়ে ঘোরে শিকারের খোঁজে। কিন্তু শিকার আর নেই—সবশেষ।'

স্ক্রীনটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বিরক্ত কণ্ঠে স্কট বললেন—'এখানে আসার কি দরকার ছিল বুঝি না। জানে তো থাবা পরিবৃত হয়ে রয়েছি।'

পুঁচকে বর্তুলদের ওপর মাতব্বরি করতে এল একটা বড় রোবট। তার হুকুমেই দ্রুত এগিয়ে চলল মাংস কাটার পালা। এ-রোবটটার গা থেকে একটা লম্বা নল বেরিয়েছে—নলের ডগায় দু'দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখ। চোখ না বলে যান্ত্রিক চোখ বলাই সঙ্গত। আই-পীস। ওর একার তত্ত্বাবধানে দেখতে দেখতে শুধু হাড় কখানা পড়ে রইল রাশিয়ান সোলজারের। সেগুলোও মাথায় বয়ে নিয়ে বর্তুলাকার থাবারা দলে দলে নামছে পাহাড়ের গা বেয়ে।

লিয়োন বললে—'স্যার, হুকুম করুন বাইরে যাবো।'

'বাইরে যাবে? কি দরকার?'

'রাশিয়ান সোলজার নিশ্চয় অকারণে আসেনি। সঙ্গে কিছু এনেছে কিনা দেখতে চাই।'

ক্ষণেক ভাবলেন স্কট। তারপর—'ঠিক আছে, যাও। কিন্তু সাবধান!'

কোমরে লাগানো চ্যাটালো চৌকোণা ধাতব তাবিজের মত একটা বস্তুর ওপর হাত বুলিয়ে নিয়ে লিয়োন বললে—'ট্যাব রয়েছে যখন তখন কাউকে ডরাই না। ওরা নাগাল ধরতেও পারবে না।'

রাইফেল তুলে নিয়ে বাঙ্কারের মুখের কাছে উঠে গেল লিয়োন। সিঁড়ির দুপাশে কংক্রীটের চাঁই আর ইস্পাতের আঁকশি। বাঙ্কারের বাইরেও সেই অবস্থা। হাওয়া কনকনে ঠাণ্ডা। সন্তর্পণে পা ফেলে চোখা চোখা পাথর আর ইস্পাতের ধারালো আঁকশির মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে পৌঁছোলো রাশিয়ানের সামনে। নরম ছাইয়ের ওপর লম্বমান কঙ্কালের গায়ে তখনও বনবন করে পাক খাচ্ছে অগুন্তি মেট্যাল বল। মুখের ওপর ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা লাগছে—সেইসঙ্গে উড়ে আসছে ছাই। চোখের মধ্যেও ঢুকে যাচ্ছে ধূসরকণিকা।

খাবার দল সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে ওর আবির্ভাবে। মাংস কাটা শিকেয় উঠেছে—তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছে অগুন্তি মাছির মত বর্তুলগুলো—তারপরেই শুরু হল পাছু হটে যাওয়া। লিয়োন এক পা এগোয় তো, ওরা এক পা পেছোয়। পেছোতে হবেই। ট্যাব স্পর্শ করল লিয়োন। বেচারা রাশিয়ান যদি এই ট্যাব সঙ্গে রাখত, এরকম শোচনীয় ভাবে মরত না। আঙুল দিয়ে ছুঁতেই ট্যাব থেকে ঠিকরে গেল ক্ষুদ্র তরঙ্গের শক্তিশালী বিকিরণ—সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল বর্তুলগুলোর যন্ত্র—নিউট্রাল হয়ে গেল মেশিন। এমন কি জোড়া চোখওলা বড় রোবটটাও যেন আদাব করতে করতে সসম্ভ্রমে পাছু হটে অদৃশ্য হয়ে গেল ছাইয়ের আড়ালে।

হেঁট হল লিয়োন। রাশিয়ান কঙ্কালের আঙুলের হাড়গুলো তখনও মুঠো শক্ত করে রয়েছে। হাড়ের ফাঁক দিয়ে কি যেন দেখা যাচ্ছে ভেতরে। চকচক করছে বস্তুটা। হাড় সরিয়ে জিনিসটা তুলে নিল লিয়োন। মুখ বন্ধ একটা আধার। অ্যালুমিনিয়ামের। চকচক করছে এখনও।

ডিবেটা পকেটে পুরে পেছন ফিরল লিয়োন। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেল খচমচ খচমচ আওয়াজ হচ্ছে পেছনে, আবার টুং টাং শব্দে ঠোকাঠুকি লাগছে ধাতুতে ধাতুতে, আবার ফুর-ফুর করে ঘুরছে ক্ষুরের মত জোড়া ব্লেড।

সচল হয়ে গিয়েছে ক্ষুদে বিভীষিকারা। ঘাড় না ফিরিয়েও অনুভব করল লিয়োন, ছাইয়ের আড়াল থেকে পিল পিল করে বেরিয়ে এসে ওরা আবার লাফিয়ে পড়েছে রাশিয়ান কঙ্কালের ওপর। হাড়মাস সবকিছুই নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে পৃথিবীর বুক থেকে।

দীর্ঘ নিঃশ্বাসটা বুকের মধ্যেই আটকে রাখল লিয়োন। ওদেরকে তৈরীই করা হয়েছে পৃথিবীর বুক থেকে মানুষের চিহ্ন মুছে দেওয়ার জন্যে। হাড় খাবে, মাস খাবে—চামড়াশুদ্ধ খাবে—ডুগডুগি বাজানোর দরকার কি?

বাঙ্কারে ঢুকল লিয়োন। অ্যালুমুনিয়ামের ডিবেটা বার করে রাখল টেবিলের ওপর।

খর চোখে তাকিয়ে ছিলেন স্কট। বললেন—'রাশিয়ানের কাছে ছিল?'

'হাতের মুঠোয় ছিল', ডিবের ঢাকনি খুলতে খুলতে বললে লিয়োন। 'দেখা যাক ভেতরে কি আছে।'

স্কট ডিবেটা নিয়ে উপুড় করলেন হাতের তেলোয়—গড়িয়ে এল চার ভাঁজ করা এক টুকরো সিল্কের কাগজ। আলোর সামনে বসে ভাঁজ খুললেন স্কট।

উদগ্রীব হয়ে শুধোলো এরিক—'কি লিখছে স্যার?' টানেল বেয়ে ভূগর্ভকক্ষ থেকে উঠে এল আরো ক'জন অফিসার। আবির্ভূত হলেন মেজর হেনড্রিক্স।

স্কট বললেন মেজরকেই—'দেখুন।'

'হ্যাঁ। একজনেই এনেছে। রাশিয়ান।'

'কোথায় সে?'

'থাবাদের খপ্পরে পড়েছে।'

চোয়াল কঠিন হল মেজরের। চিরকুটটা সঙ্গীদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—'এই আশাতেই এতদিন বসে থাকা। কিন্তু বড় দেরী করল রাশিয়ানরা।'

কথাটার মানে বুঝলেন স্কট। ভুরু কুঁচকে বললেন—'মতিগতি ফিরেছে এতদিনে! সন্ধির ইচ্ছে হয়েছে। আপনার কি ইচ্ছে? ওদেরকেও নিয়ে যাবেন মুন-বেস-য়ে?'

'সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার আমার ওপর নেই', চেয়ার নিয়ে বসলেন হেনড্রিক্স। 'কমিউনিকেশনস্ অফিসার কোথায় গেল? ডাকো এখুনি। মুন-বেস-য়ের সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

হাঁক ডাক শুনে দৌড়ে এল অপারেটর। বসে গেল কলকব্জার সামনে। বাঙ্কারের ছাদের ফুটো দিয়ে অ্যাণ্টেনা উঠে গেল রাশিয়ান

উড়ো জাহাজের সন্ধানে। চাঁদের ঘাঁটির সঙ্গে বাক্যালাপ চলার সময়ে শত্রু সান্নিধ্য নিরাপদ নয়।

এরিক বললে—'থাবাদের মতিগতি সুবিধের মনে হচ্ছে না। মাঝে মাঝে হঠাৎ যেন উবে যায়।'

'উবে আবার যাবে কোথায়', বললেন হেনড্রিক্স—'নিজেদের বাঙ্কারে গিয়ে বসে থাকে।'

'লম্বা চোখওলা সেই রোবটটার কাণ্ড শুনবেন? এই সেদিন ঢুকেছিল রাশিয়ান বাঙ্কারে। বেচারারা ঢাকনি বন্ধ করারও সময় পায়নি। গোটা বাহিনীটা সাবাড় করে দিয়েছে থাবার দল।'

'তুমি খবর পেলে কি করে?'

'রোবটদের চেহারা দেখে। রক্তে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল প্রত্যেকেই—বয়ে আনছিল রাশি রাশি মাংসর টুকরো।'

'স্যার, মুন বেস এসে গেছে', কমিউনিকেশনস্ অফিসারের গলা শোনা গেল কোণ থেকে।

পর্দার ওপর ভাসছে চান্দ্র-মনিটরের চকচকে মুখ। লোকটার গায়ে ইস্ত্রী করা পাটভাঙা ইউনিফর্ম। পক্ষান্তরে, বাঙ্কারের মধ্যে যে-কজন রয়েছে, তাদের ইউনিফর্মের অবস্থা দেখলে মনে হয় যেন হাঁড়ির মধ্যে থেকে বার করে আনা হয়েছে। পাট নেই, ধোপার বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্কও নেই। বাঙ্কারের পাতালগহ্বরের জীবনযাপন বড় কষ্টের। এমন কি দাড়ি কামানোর মত মনের অবস্থা থাকে না বাঙ্কারবাসীদের। ওদিকে চান্দ্র-মনিটর দিব্বি দাড়ি কামিয়ে ফুলবাবুটি সেজে বসে আছে স্ক্রীনের সামনে।

মেজর হেনড্রিক্স সামনে এসে দাঁড়াতেই ভরাট গলায় বললে মনিটর—'মুন বেস।'

'জেনারেল থমসনকে খবর পাঠান। পৃথিবী থেকে বলছি। ফরোয়ার্ড কম্যাণ্ড। এল—হুইসল।'

ধীরে ধীরে যেন গলে মিলিয়ে গেল মনিটরের ফিটফাট মুখচ্ছবি।

সে জায়গায় ভেসে উঠল একটা রাশভারী মুখ। জেনারেল থমসন। ভ্রূকুটি করে বললেন—'কি খবর মেজর ?'

'আমাদের থাবা এইমাত্র খতম করেছে একজন রাশিয়ানকে। একা আসছিল বাঙ্কারে। কাছে একটা চিঠি পেয়েছি। বুঝতে পারছি না আগের মতই ফাঁদ পাতার মতলব কিনা।'

'কি আছে চিঠিতে ?'

'রাশিয়ানরা আমাদের সঙ্গে সন্ধি করতে চায়। কথা বলতে চায়। একজন অফিসার যাবে আমাদের তরফ থেকে—তাদের ঘাঁটিতে। কনফারেন্স হবে সেইখানেই। কনফারেন্সে কি কথা আলোচনা হবে, তা লেখেনি। শুধু লিখেছে, বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এমন একজন অফিসারের যাওয়া দরকার যিনি সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম এবং যিনি রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর প্রতিনিধি।'

'দেখি চিঠি !'

সিল্কের কাগজটা স্ক্রীনের সামনে মেলে ধরলেন মেজর। চোখ বুলিয়ে নিলেন জেনারেল।

পড়া শেষ হলে শুধোলেন মেজর—'এখন বলুন কি করা উচিত।'

'পাঠিয়ে দিন কাউকে।'

'যদি ফাঁদ হয় ?'

'হলেও হতে পারে। তবে ফরোয়ার্ড কম্যাণ্ডের ঠিকানাটা ভুল নয়। কাজেই কপাল ঠুকে দেখা যেতে পারে।'

'তাহলে তাই হবে। পাঠিয়ে দিচ্ছি একজন অফিসারকে। ফলাফল জানিয়ে দেব সে ফিরে এলেই।'

'অলরাইট, মেজর,' কানেকসন কেটে দিলেন থমসন। অন্ধকার হয়ে গেল পর্দা। বাঙ্কারের ওপরে সাপের ফণার মত দোদুল্যমান অ্যাণ্টেনা ধীরে ধীরে ফুটো দিয়ে নেমে এল বাঙ্কারের মধ্যে।

হেনড্রিক্স কাগজটা হাতে নিয়ে ভাঁজ করতে করতে কি যেন ভেবে নিলেন।

লিয়োন বললে—'স্যার, আমি যাই ?'

'না,' ভাবনা শেষ করে বললেন হেনড্রিক্স। 'ওরা এমন একজনকে ডেকেছে যে সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, পলিসি নির্ণয় করতে পারবে। মাসকয়েক হল বাইরে বেরোই নি আমি। স্থতরাং আমিই যাব— বাইরের হাওয়ায় শরীরটাকে একটু চাঙা করাও হবে।'

'ঝুঁকি নেওয়াটা কি ঠিক হবে ?'

তক্ষুনি কোনো জবাব দিলেন না হেনড্রিক্স। ভিউসাইট উঠিয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন বাইরে। রাশিয়ানের দেহাবশেষ পুরোপুরি সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে ঘূর্ণ্যমান থাবা-বাহিনী। একটি মাত্র থাবাকে দেখা যাচ্ছে, ফের মুড়ে নিচ্ছে নিজেকে—ক্ষুর ছুটো ভাঁজ করে ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে অবিকল কাঁকড়ার মতই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ভস্মস্তূপে। কাঁকড়াই বটে। যান্ত্রিক কাঁকড়া। কদর্য। কুৎসিত।

লিয়োনের পানে তাকালেন হেনড্রিক্স। বিশেষ ধরনের কব্জিঘড়িতে টোকা মেরে বললেন রহস্য-মন্থর কণ্ঠে—'লিয়োন, এ-জিনিস যতক্ষণ আমার কাছে আছে, কাউকে ডরাই না। ঝুঁকি নিতেও ভয় পাই না। তবে কি জানো, কেবলি মনে হয় থাবা-বাহিনী আবিষ্কার না করলেই ভাল করতাম। আমাদের রক্ষক ওরা, তবুও ওদের দেখলেই গা ঘিন ঘিন করে আমার, লোমকূপ পর্যন্ত শিউরে ওঠে। খালি মনে হয়, একটা কিছু গোলমাল ঘটেছে ওদের চালচলনে। ওদের হাবভাব আর স্থবিধের নয় মোটেই—'

'স্যার, আমরা আবিষ্কার না করলেও রাশিয়ানরা করত।'

ভিউসাইট ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হেনড্রিক্স বললেন 'সে যাই হোক, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে জিতে গেলাম মনে হচ্ছে।'

'আপনার উল্লাস দেখে রাশিয়ানদের উল্লাসের কথা মনে পড়ছে।'

চকিত চাহনি নিক্ষেপ করলেন হেনড্রিক্স। কিন্তু কোনো মন্তব্য করলেন না। বিশেষ প্যাটার্নের কব্জিঘড়ির পানে তাকিয়ে শুধু

বললেন—'দেরী হয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যের আগে ফিরতে হলে এখুনি যাওয়া দরকার।'

গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে মেজর হেনড্রিক্স পা বাড়ালেম বাঙ্কারের অন্ধকূপের বাইরে। সেখানে বদ্ধ বাতাস নেই—কিন্তু আছে হাড় হিম করা দৃশ্য। পায়ের তলায় ধূসর রাবিশের স্তূপ। একটা সিগারেট ধরিয়ে থমকে দাঁড়ালেন মেজর। নির্নিমেষে দেখলেন আশপাশের দৃশ্য। কি ছিল পৃথিবী, কি হয়েছে এখন। গড়ে ছিলেন প্রকৃতি, ভেঙেছে মানুষ। দিগন্ত পর্যন্ত শুধু মৃতের রাজ্য—প্রাণের স্পন্দন নেই কোথাও। নেই সবুজের সমারোহ। কোথাও কিছু নড়ছে না—নেই বিন্দুমাত্র স্পন্দন, চাঞ্চল্য, জীবনের চিহ্ন। মাইলের পর মাইল জুড়ে কেবল এই দৃশ্য। ছাই আর গলিত ধাতু, ইমারতচূর্ণ আর কলকব্জার ধ্বংসাবশেষ। দু'একটা গাছ মাঝে মাঝে মাথা ভাঙা প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে হেথায় সেথায়—অপরিসীম ধিক্কারে যেন মূক হয়ে গিয়েছে তারা। শুধু গুঁড়িই আছে—আগুনে ঝলসানো গুঁড়ি—পাতা, ডাল সব হয়েছে উধাও। সবার ওপরে পুঞ্জ পুঞ্জ ধূমল বর্ণের মেঘ পাক খাচ্ছে সূর্য ,আর পৃথিবীর মাঝে।

পা চালালেন মেজর হেনড্রিক্স। কি যেন সড়সড় করে সরে গেল বাঁ দিকে। চোখের কোণ দিয়েই দেখতে পেলেন মেজর। গোলাকার চকচকে একটা ধাতুর বল অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় মসৃণ গতিবেগে ধাওয়া করেছে একটা ইঁদুরের পেছনে !

শেষ পর্যন্ত ইঁদুরকেও টার্গেট করেছে থাবার দল। কি আর করবে। মানুষ মারার জন্যে সৃষ্টি ওদের—কিন্তু মানুষ আর কোথায় ? তাই নেই কাজ তো খই ভাজ। নিষ্কর্মা বসে না থেকেই ধেড়ে ইঁদুর থেকে আরম্ভ করে নেংটি ইঁদুর পর্যন্ত জবাই করার সুযোগ পেলে আর ছাড়ে না থাবা-বাহিনী।

টিলার ওপরে উঠে এসে দাঁড়ালেন মেজর। মাইল কয়েক যেতে হবে—রাশিয়ান ফরোয়ার্ড কম্যাণ্ড শুরু হয়েছে তারপর। রাশিয়ান

রানার বার্তা নিয়ে এসেছিল সেই ঘাঁটি থেকেই।

পাশ দিয়ে কবন্ধভূতের মত একটা কদাকার রোবট চলে গেল দুটো শুঁড় দিয়ে বাতাস হাতড়াতে হাতড়াতে। ধড়ের চিহ্ন নেই। মাথা বলতে একটা হাঁড়ি—তার মাঝে জ্বলছে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি। এ মডেল এর আগে দেখেন নি মেজর। এমনি আরো অনেক অজানা অচেনা মডেল আজকাল চোখে পড়ছে। মাটির তলায় রোবট কারখানায় তৈরী হয়ে উঠে আসছে ওপরে। রোবটরাই এখন রোবট বানাচ্ছে। নিত্য নতুন ভ্যারাইটি জন্ম নিচ্ছে পাতাল কারখানায়।

বীভৎস রোবটটা অন্তর্হিত হল একটা ধ্বংসাবশেষের আড়ালে।

একটু দাঁড়িয়ে গেলেম মেজর হেনড্রিক্স। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে পা চালালেন টিলার নীচের দিকে। যুদ্ধ যে এই ভাবেই শেষ হবে কে জানত। শুরু হয়েছিল কিন্তু অভিনব ভাবে। সূচনাটা ইন্টারেস্টিং। রোবট দিয়ে লড়াই। কৃত্রিম সৈনিক দিয়ে শত্রু নিধনের আশ্চর্য এই পরিকল্পনার প্রথম কৃতিত্ব কিন্তু রাশিয়ানদেরই। হৈ-হৈ ফেলে দিয়েছিল সারা পৃথিবীতে। অজেয় বাহিনী দিয়ে জিতে গেছে একটার পর একটা যুদ্ধে। ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল মার্কিন মুলুক। নর্থ আমেরিকার প্রায় সবটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল ম্যাপ থেকে।

তারপরেই শুরু হল প্রতিহিংসা নেওয়ার পালা। আমেরিকানরা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকার পাত্র নয়। তাদেরও বৈজ্ঞানিক প্রতিভা আছে। সুতরাং আকাশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে এল উড়ন্ চাকতির দল।

এতদিন কত জল্পনাকল্পনাই না ছিল এই উড়ন্ চাকতিদের নিয়ে। রাশিয়ানরা গোড়া থেকেই সন্দেহ করে এসেছে, ফ্লাইং সশাররা অন্য গ্রহের মহাকাশযান নয় মোটেই—এই পৃথিবীর কারখানাতেই তৈরী—মার্কিন যুদ্ধবাজদের উড়ন্ত অস্ত্র। পাল্টা প্রচার চালিয়েছে

আমেরিকানরা—দোষটা রাশিয়ানদের ঘাড়ে চাপিয়ে। উড়ন্ চাকতি নাকি রাশিয়ানদের উড়ন্ত গোয়েন্দা!

উড়ন্ চাকতি যে আসলে কি, তা জানা গেল রাশিয়ানরা রোবট বাহিনী ছেড়ে আমেরিকাকে মরণ মার দিতেই। এতদিন যারা লুকিয়ে ছিল, পৃথিবীর বুকেই বনেজঙ্গলে পাহাড়ে পর্বতে গিরিকন্দরে গোপন ঘাঁটিতে ওৎ পেতেছিল, সহসা তারা যান্ত্রিক নির্দেশে একযোগে উঠে পড়ল আকাশে এবং আকাশ অন্ধকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল সারা রাশিয়ার ওপর।

সেই নারকীয় যজ্ঞের বর্ণনা ভাষায় অসম্ভব। উড়ন্ চাকতিরা আসলে উড়ন্ত অ্যাটম বোমা—তা জানা গেল রাশিয়ানরা যখন বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত—ঠিক তখনি।

কিন্তু তাতেও কি সুবিধে করতে পেরেছিল আমেরিকানরা? পারেনি। ওয়াশিংটন প্রথম চালে বাজিমাৎ করতে গিয়েও পারেনি। গো-হারান হেরে গিয়েছে রাশিয়ান রোবট বাহিনীর হাতে।

শেষকালে পৃথিবী ত্যাগ ছাড়া আর উপায় রইল না। প্রথম বছরেই আমেরিকান ব্লক গভর্ণমেণ্ট পালিয়ে গেল চাঁদের ঘাঁটিতে। চন্দ্রবিজয় নিয়ে এত বছরের মাতামাতি এবং রেষারেষির রহস্য এতদিনে পরিষ্কার হল বিশ্ববাসীর কাছে।

বিশ্ববাসী বলতে যদিও তখন আর বিশেষ কেউ ছিল না। ইউরোপ মহাদেশ পুরোপুরি মুছে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে। সারা ইউরোপে কেবল গলিত ধাতুর জমাট পাহাড়, ছাই, হাড় আর ইমারতচূর্ণ। উত্তর আমেরিকার অবস্থাও তথৈবচ। বসবাস তো দূরের কথা, ঘাস পাতা পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়েছে সেখানকার মাটি থেকে। দূর ভবিষ্যতে সেখানকার মাটিতে কোন ফসল আর ফলবে না, সেখানকার জল খেয়ে কোনো মানুষ আর বাঁচবে না।

কয়েকলক্ষ বিত্তবান আমেরিকান পালিয়ে গিয়েছিল কানাডা আর দক্ষিণ আমেরিকায়। কিন্তু যুদ্ধের দ্বিতীয় বছরে সেখানেও সোভিয়েত

ছত্রীবাহিনীর অবতরণ শুরু হল। আকাশ থেকে তারা নেমে এল দলে দলে। প্রত্যেকের গায়ে মাথায় অলপ্রুফ অ্যান্টি-র‍্যাডিয়েশন বর্ম। সুতরাং মার্কিন দেশটার চরম অবলুপ্তি রোধ করার জন্যেই মুষ্টিমেয় আমেরিকানরা চাঁদে পালিয়ে গেল গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে।

গেল না কেবল সৈন্যবাহিনী। গোপন বিবরে লুকিয়ে রইল তারা সাপ আর ছুঁচো-ইঁদুরের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে। কিন্তু কেউ জানল না তাদের ঠিকানা। দলবদ্ধভাবে থাকার সাহস ছিল না কারোরই। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে তারা ঘাপটি মেরে রইল পাতাল বিবরে, ধ্বংসস্তূপের আড়ালে, নর্দমার মধ্যে। রাতের অন্ধকারে তারা বেরিয়ে আসত বাইরে পেঁচা আর ছুঁচোর মত—অতি ভয়ে ভয়ে। যুদ্ধ করার মত মনোবল ছিল না কারোরই। যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছে—জিতেছে রাশিয়ানরা। তা সত্ত্বেও প্রতিদিন এক ঝাঁক মিসাইল-বোমা উড়ে আসত চাঁদ থেকে—ফাটত লক্ষ্যহীনভাবে পৃথিবীর ওপরে। ভাবখানা যেন, কে বললে আমরা হেরেছি? দেখছো না এখনো কেমন বোমা ফাটিয়ে চলেছি?

রাশিয়ানরা তাতে ঘাবড়ায় নি। আমেরিকানদের তারা ঠেঙিয়ে পৃথিবী ছাড়া করেছে, এর চাইতে বড় কথা আর কি আছে?

প্রথম থাবাবাহিনীর আবির্ভাব ঘটল ঠিক এই সময়ে। রাতারাতি পালটে গেল যুদ্ধের চেহারা।

রাশিয়ানরা প্রথমটা তোয়াক্কা করেনি থাবাদের। রেণু রেণু করে উড়িয়ে দিয়েছে তাদের অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র দিয়ে। কিন্তু থাবারাও কম যায় না। দলে দলে গুঁড়ো হয়েছে, কিন্তু রক্তবীজের ঝাড়ের মত পিল পিল করে উঠে এসেছে পাতাল কারখানা থেকে। যত ধ্বংস হয়েছে, ততই তাদের ধূর্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা যে রোবট, ইলেকট্রনিক অণু-মগজ নিয়ে তাদের জগৎ। বুদ্ধিবৃত্তিতে কম যায় না মোটেই। তাই এক-একটা বাহিনী সাবাড় হয়েছে, পরের বাহিনী জন্ম নিয়েছে উন্নত যান্ত্রিক মগজ নিয়ে। রাশিয়ান আর্মি লাইনের

পেছনে, পৃথিবীর সর্বত্র ভূগর্ভ ফ্যাক্টরীতে তারা দিনরাতের প্রতিটি মুহূর্তে তৈরী হয়ে চলেছে। এককালে এইসব কারখানায় তৈরী হত অ্যাটমিক প্রোজেকটাইল। তারপর শেষযুদ্ধের দামামা বাজাতেই বিস্মৃত হয়েছিল সেইসব পাতাল কারখানার অস্তিত্ব। এখন রোবটরাই রোবট বানিয়ে চলল সেই আণ্ডার গ্রাউণ্ড ফ্যাক্টরীতে। শ'য়ে শ'য়ে, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে!

চান্দ্রঘাঁটিতে বসে সেরা যন্ত্রবিদরা নিত্য নতুন নক্সা বানিয়ে চললেন থাবাদের। তাঁদেরই নক্সামত নতুন নতুন থাবা বাহিনী জন্ম নিতে লাগল পৃথিবীর পাতাল কারখানায়। প্রতিটি আগেরটির চাইতে দ্রুতগতিসম্পন্ন, আগেরটির চাইতে বৃহদাকার। কেউ কেউ শিখল নিজে থেকে ছাইয়ের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে লুকিয়ে থাকতে—ওৎ পেতে বসে থাকার অপূর্ব টেকনিক যন্ত্রবিদরাই বপন করে দিলেন তাঁদের কমপিউটর ব্রেনে। কারো কলকব্জা হল অত্যন্ত জটিল ধরনের, আবার কেউ হল নমনীয়। ইচ্ছে মত সাপের মত দুমড়ে মুচড়ে সরীসৃপ গতিতে যে কোনো রন্ধ্রপথে যেন হানা দিতে পারে শত্রুঘাঁটিতে। প্রায় অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এই থাবাবাহিনীদের সামলাতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে গেল রাশিয়ানরা।

ছাইয়ের মধ্যে ওৎ পেতে লুকিয়ে থাকতে যারা শিখেছিল, এবার তারা শিখল রাশিয়ান বাঙ্কারে ঢুকে পড়ার কৌশল। বদ্ধ বাতাস বার করে দিয়ে টাটকা বাতাস বাঙ্কারে আনার জন্যে দিনান্তে একবারের জন্যে খোলা হত বাঙ্কারের ঢাকনি। সুরুৎ করে ছাইয়ের ফোকর থেকে একটা থাবা ঢুকে পড়ত ঢাকনির ফাঁক দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে যেন ছুরীর ভাঁজ খুলে যেত, বর্তুলের গা থেকে বেরিয়ে আসত একজোড়া ধারালো ক্ষুর। ঘুরত বনবন করে, কচুকাটা হয়ে যেত রাশিয়ানরা। একা রামে রক্ষে নেই, সুগ্রীব দোসর। বাঙ্কারের অন্ধকারে একটা থাবাই যে নরমেধ যজ্ঞ করত, তুলনা নেই তা'র। তার পরেও কিন্তু ঢাকনির ফাঁক দিয়ে লাইন দিয়ে ঢুকত আরো থাবার দল। মানুষের

মাংস কাটার জন্যেই তাদের সৃষ্টি। সুতরাং মড়া মানুষগুলোকেই কুচি কুচি করে কেটে নিয়ে যেত ছাইয়ের আড়ালে, অথবা আপন আলয়ে—ভূগর্ভ বাঙ্কারে।

এ-হেন যুদ্ধাস্ত্র সমরে অবতীর্ণ হলে যুদ্ধ বেশীদিন চলে না, চলতে পারে না। তাই বোধহয় অবশেষে শেষ হল এই শেষের যুদ্ধ। সন্ধিসর্তে আবদ্ধ হতে চলেছে রাশিয়ানরা। সুবুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে থাবাবাহিনীর হাতে কচুকাটা হওয়ার পর।

খুব সম্ভব এই খবরই এখুনি শুনতে হবে রাশিয়ান দলপতির কাছে। হয়ত পলিট ব্যুরো শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ থামানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু বড় দেরীতে নেওয়া হচ্ছে এই সিদ্ধান্ত। টনক নড়া উচিত ছিল আরো আগে। ছটি বছর ধরে কি কাণ্ডই না চলল পৃথিবী জুড়ে। দীর্ঘ ছটি বছরে আবিষ্কৃত হল মানুষ মারার কত কল। আমেরিকানরা আকাশ থেকে নামাল উড়ন্ চাকতি-বোমা। হাজারে হাজারে—প্রতিহিংসা-পাগল অটোমেটিক চাকতিরা বন বন করে ঘুরতে ঘুরতে নেমে এল আকাশ অন্ধকার করে। তারপর এল ব্যাকটিরিয়া কৃস্ট্যাল। সোভিয়েট বাহিনী ছাড়ল গাইডেড মিসাইল—বাতাস চিরে তীব্র শিস দিয়ে উড়ন্ত আতংকরা প্রলয়ংকর ধ্বংস ডেকে আনল গোটা আমেরিকায়। তারপর এল চেন-বম্ব। সবশেষে রোবট, থাবা······

থাবা কিন্তু অন্যান্য অস্ত্রের মত নির্জীব নয়, নিষ্প্রাণ নয়। ওরা জীবন্ত, প্রাণময়। শত্রুশিবির মানতে চাক আর না চাক, থাবারা মেশিন নয়। আর পাঁচটা জীবের মতই তারা জীবন্ত। চর্কিপাক দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে তারা বিপুল বেগে ছুটতে জানে, ভয় পেলে পিছু হটতে জানে, শত্রুর গন্ধ পেলে ছাইয়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে জানে, শত্রুর আবির্ভাবে মুহূর্তের মধ্যে ছাই ঝেড়ে ফেলে লাফ দিয়ে শত্রুর পায়ের ওপর পড়তে জানে এবং সড় সড় করে গা বেয়ে উঠে গিয়ে টুঁটি কাটতে জানে। ওদের ডিজাইনটাই ঐ রকম। টুঁটি কাটার

জন্যেই ওঁদের সৃষ্টি। মাংস নিয়ে খোড় কুচি করার জন্যেই ওদের জন্ম। ওদের জীবন্ত দেহযন্ত্রের মধ্যে সেই নক্সাই এঁকেছেন মুন-বেসয়ের যন্ত্রবিদ বিজ্ঞানীরা।

সুতরাং তাদের যা কাজ, তা তারা করে চলল অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। বিশেষ করে, ইদানীং কালে যে সব ডিজাইন এসেছে, তারা টেক্কা দিয়েছে অতীতের সব ডিজাইনকে। এখনকার থাবারা নিজেরাই নিজেদের মেরামত করতে জানে। মানুষের তোয়াক্কা করে না। মানুষ আর আণ্ডারগ্রাউণ্ড ফ্যাক্টরীর ধারেকাছেও যায় না। যাওয়াটা অতিশয় বিপজ্জনক। মাটির ওপরে যারা আছে, মানে যারা রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীভুক্ত, তাদের প্রত্যেকের কোমরে বা কব্জিতে বাঁধা আছে ট্যাব। বিকিরণ শক্তির উৎস। রক্ষাকবচ বললেই চলে। একমাত্র এই বিকিরণকেই সমীহ করে দুর্দান্ত ধুরন্ধর এই থাবাবাহিনী—তোয়াক্কা করে না আর কোনো কিছুর। ট্যাব সঙ্গে থাকলে নিরাপদ—না থাকলে ছেড়ে দেবে না থাবারা। ইউনিফর্ম দেখে খাতির করবে না। চক্ষের নিমেষে থোড়কুচি করে মাটিতে মিশিয়ে দেবে আস্ত একটা দেহকে। যতই দিন যাচ্ছে, ততই উন্নতি ঘটছে ডিজাইনের। ক্রমশঃ আরো সূক্ষ্ম, আরও জটিল হচ্ছে থাবা-নক্সা। আরো চতুর, আরো ক্ষিপ্র, আরো নৃশংস হচ্ছে ওরা।

সুতরাং যুদ্ধের শেষ এসে গিয়েছে বললেই চলে। জিতেছে আমেরিকানরা।

ফের সিগারেট ধরালেন মেজর হেনড্রিক্স। নিসর্গ দৃশ্য গুরুভার পাথরের মত চেপে বসছে বুকের ওপর। যেদিকে দু'চোখ যায়, ছাই আর ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। দিগন্তব্যাপী এই মহা-শ্মশানের মধ্যে জীবন্ত মানুষ বলতে শুধু তিনিই—একেবারে একা। ডানদিকে একটা শহরের ধ্বংসাবশেষ। এককালে আকাশছোঁওয়া সৌধশ্রেণী চুম্বন করত মেঘলোককে—এখন তা পাহাড়প্রমাণ রাবিশের আকারে চিহ্নিত করছে অতীত গৌরবের। কিছু কিছু দেওয়াল

হাওয়ায় টলছে টলমল করে—কখনো বা ভেঙে পড়ছে হুড়মুড় করে।

নেভা কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দ্রুত পা চালালেন মেজর। কিন্তু কয়েক পা গিয়েই আচম্বিতে দাঁড়িয়ে গেলেন পাথরের মত, টান টান হয়ে উঠল শরীরের প্রতিটি স্নায়ু আর মাংসপেশী, চক্ষের পলকে এক ঝটকায় কাঁধের রাইফেল নামিয়ে আনলেন হাতে—আঙুল চেপে বসল ট্রিগারে···

ভাঙাচোরা বাড়ীর দেওয়ালের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা মূর্তি। ধীর চরণে তাঁরই দিকে আসছে—দ্বিধায় যেন পা জড়িয়ে যাচ্ছে···যেন ভেবে ঠিক করে উঠতে পারছে না আসাটা উচিত হবে কিনা।

'স্টপ!' বজ্রকণ্ঠে হুংকার দিলেন মেজর।

দাঁড়িয়ে গেল ছেলেটা। বছর আস্টেক বয়স। নেহাতই বাচ্চা। গায়ে রঙ ওঠা নীল সোয়েটার। ছেড়া এবং কাদামাখা। হাফ প্যান্ট। ঝাঁকড়া চুল তেলহীন এবং জট পাকানো। লম্বা চুলে কপাল এবং কান ঢাকা। দুহাতে কি একটা বুকের কাছে ধরে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে হেনড্রিক্সের পানে।

বেচারা! বৃষ্টির মত পারমাণবিক বোমা ফেটেছে পৃথিবীর ওপর। সর্বনেশে বিকিরণে মানুষ জাতটার অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে দেশে দেশে—যারা বেঁচে গিয়েছে তারাও আর ঠিক মানুষ নেই··· জড়ভাব হয়ে গিয়েছে। যেমন এই ছেলেটা! ফ্যালফেলে বোকা বোকা নির্ভাষ চাহনি। বুদ্ধির স্ফুলিঙ্গ করোটির মধ্যে জ্বলছে বলে মনেই হয় না। সব শিশুরই হয়েছে এই অবস্থা—যারা বেঁচে আছে।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে শুধোলেন হেনড্রিক্স—'বুকের কাছে ওটা কি?···'

দু'হাত বাড়িয়ে ধরল ছেলেটা। একটা খেলনার ভালুক-বাচ্চা। ভাসা ভাসা চোখে ছেলেটি কিন্তু শুধু চেয়েই রইল। কথা বলল না। চোখের মধ্যেও কোনো ভাব কি ভাষা ফুটল না। যেন একটা জড় পদার্থ।

এতক্ষণে কাঠ হয়ে ছিলেন হেনড্রিক্স। এবার সহজ হলেন। বললেন—'রাখো তুমি—আমার দরকার নেই।'

ভালুক-বাচ্চাকে আমার বুকের কাছে জড়িয়ে ধরল ছেলেটা।

'কোথায় থাকো?' শুধোলেন হেনড্রিক্স।

'ঐ ওখানে।'

'ভাঙা বাড়ীতে?'

'হ্যাঁ।'

'মাটির তলায়?'

'হ্যাঁ।'

'কতজন আছো সেখানে?'

'কতজন?'

'তোমরা সবশুদ্ধ কতজন?'

চুপ করে রইল ছেলেটা।

ভুরু কুঁচকে বললেন হেনড্রিক্স—'একলা নিশ্চয় নেই? কে দেখাশুনা করে?'

এবারও চুপ করে রইল ছেলেটা।

'খেতে পাও?'

'পাই।'

'কি খাবার?'

'অন্য খাবার।'

তীক্ষ্ণ চোখে ছেলেটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিরীক্ষণ করে শুধোলেন মেজর—'কত বয়স তোমার?'

'তেরো।'

তেরো? মনে মনে ভাবলেন হেনড্রিক্স। তেরো বছরের ছেলে এত ছোট? অসম্ভবই বা কি? বছরের পর বছর বিকিরণের আওতায় থাকলে শরীর তো শুকিয়ে যাবেই, শরীরের বাড় পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাবে। ছেলেটারও হয়েছে তাই। রোগা, পাঁশুটে চেহারা।

হয়ত নির্জীবও বটে। তাই অমন ছোটখাট চেহারা। হাত আর পা সরু লিকলিকে নলের মত। গায়ে হাত দিলেন হেনড্রিক্স। চামড়া শুকনো এবং খসখসে। বিকিরণের ফলে চামড়ার অবস্থা ঠিক যে রকম হয়—অবিকল তাই। মাথা হেঁট করে মুখের দিকে চাইলেন হেনড্রিক্স। দেখলেন, এক জোড়া ভাসা ভাসা কৃষ্ণকালো চোখ। মুখটি বেশ ফর্সা। কিন্তু চোখে বা মুখে ভাবের কোনো প্রকাশ নেই।

'চোখে দেখতে পাও?'

'একটু একটু দেখতে পাই। ভাল না।'

'থাবাদের খপ্পর এড়িয়ে এখানে এলে কি করে?'

'থাবা?'

'গোল বলের মত দেখতে। খুব জোরে ছোটে, ছাইয়ের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে লুকিয়ে পড়ে। দ্যাখো নি?'

'বুঝতেই পারছি না।'

থাবারা হয়ত এদিকে আর হানা দেয় না। ওদের নক্সা এমনভাবে তৈরী যে যেখানে প্রাণের উত্তাপ নেই, সেখানে থাকে না। জীবিত প্রাণীর দেহের উত্তাপ ওরা দূর থেকে টের পায়। তাই যেখানে জীবিত প্রাণী, বিশেষ করে মানুষের দেহের উত্তাপ যে-সব জায়গায়, আপনা হতেই জড়ো হয় তার চার ধারে। তাই প্রতিটি বাঙ্কারের আশে পাশে মাটির মধ্যে গর্ত করে ওৎ পেতে থাকে ওরা। কিন্তু যেখানে মানুষের দেহের উত্তাপ নেই, সে জায়গা ছেড়ে চলে যায় অন্যত্র। এইভাবেই পৃথিবী পৃষ্ঠের বহুস্থান এখন থাবাবিহীন অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। পঙ্গপালের মত ওরা জড়ো হয়েছে মানুষ যেখানে আছে, শুধু সেইখানে।

সিধে হয়ে দাঁড়ালেন হেনড্রিক্স—'কপাল ভাল তাই বেঁচে গিয়েছো। যাচ্ছ কোথায়?'

'তোমার সঙ্গে।'

'আমার সঙ্গে? কেন?'

'তবে কোথায় যাব ?'

রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিলেন হেনড্রিক্স। হাত ঘড়ি দেখে বললেন—'অনেক দেরী হয়ে গেল।—আমি যাচ্ছি অনেক দূরে। অনেক মাইল হাঁটতে হবে। সন্ধ্যের আগেই পৌছোতে চাই।'

'আমি যাব ?'

পিঠের ঝোলা ব্যাগ থেকে কয়েক টিন খাবার নিয়ে বাড়িয়ে ধরলেন হেনড্রিক্স—'খামোকা হেঁটে কি হবে ? এই নাও খাবার। দিন কয়েক চলে যাবে। যেখান থেকে এসেছো, সেইখানেই যাও।'

'আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

'অনেক হাঁটতে হবে।'

'হাঁটব।'

দ্বিধায় পড়লেন হেনড্রিক্স। পথ বড় কম নয়। তার ওপরে যদি দুজন পাশাপাশি হাঁটেন, তাহলে শত্রুপক্ষের চোখে পড়ার সম্ভাবনা বেশী। টার্গেট হিসেবেও খতম করতে সুবিধে। তাছাড়া বাচ্চা ছেলে সঙ্গে থাকলে জোর কদমে হাঁটাও যাবে না। দেরী হবেই। ছেলেটাও মনে হচ্ছে একা। হাবাগাবা। এ পথ দিয়ে নাও আর ফিরতে পারেন হেনড্রিক্স। সেক্ষেত্রে ছেলেটাকে যমের মুখে ফেলে যাওয়াটা অমানবোচিত কাজ হবে। প্রেতপুরীর চাইতেও ভয়ংকর এই প্রান্তরে—

মনস্থির করে ফেললেন হেনড্রিক্স। বললেন—'ঠিক আছে। এসো পেছন পেছন।'

পেছন পেছনই আসতে লাগল ছেলেটা। লম্বা লম্বা পা ফেলে সামনে এগিয়ে গেলেন হেনড্রিক্স। মাঝে মাঝে পেছন ফিরে দেখলেন, নীরবে নিঃশব্দে ভালুক ছানাকে বুকের ওপর চেপে ধরে পথ হাঁটছে জড়দগব ছেলেটি।

একটু দাঁড়িয়ে গেলেন হেনড্রিক্স। এগিয়ে এল ছেলেটা। কাছে আসতেই জিজ্ঞেস কপলেন—'কি নাম তোমার ?'

‘ডেভিড এডোয়ার্ড ডেরিং।’

‘ডেভিড? বাবা মা কোথায়?’

‘মরে গেছে।’

‘কি ভাবে?’

‘বোমা ফেটে।’

‘কদ্দিন আগে?’

‘ছ বছর আগে।’

‘ছ বছর একা ছিলে?’

‘না। আরো অনেকে ছিল। এখন কেউ নেই।’

‘একাই থাকো?’

‘হ্যাঁ।’

চোখ নামিয়ে ডেভিডকে খুঁটিয়ে দেখলেন হেনড্রিক্স। অদ্ভুত ছেলে তো। অত্যন্ত কম কথার মানুষ। শামুক যেমন খোলার মধ্যে গুটিয়ে রাখে, ডেভিডও তেমনি যেন নিজেই নিজের মধ্যে গুটিয়ে এতটুকু হয়ে রয়েছে। অবাক হবার অবশ্য কিছু নয়। বিকিরণের পর যেসব শিশু এসেছে, প্রত্যেকের হাল হয়েছে এইরকম। আশ্চর্য অদৃষ্টবাদে আচ্ছন্ন প্রত্যেকেই। জীবনে চমক বলে কিছু নেই—চমকাতে ভুলে গিয়েছে একেবারেই। যা ঘটছে, তা যেন ঘটতই। যা ঘটবে, তা ঘটবেই—অন্যথা হবে না। স্বাভাবিক আচরণ বলতে যা বোঝায়, বিকিরণ-আক্রান্ত এইসব শিশুদের মধ্যে তা অনুপস্থিত। প্রত্যেকেই ধীর, স্থির, শান্ত; উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, উল্লাসের বাষ্পটুকুই নেই কারো মধ্যে। বিষম বৈরাগ্য যেন এদের রক্তে প্রবহমান। প্রত্যেকেই যেন এক-একজন দার্শনিক পণ্ডিত—শুধু সন্ন্যাস-বৃত্তি নিতেই বাকী। সবই যেন শেখা হয়ে গিয়েছে—আর কিছু শেখবার নেই। শেখবার প্রচেষ্টাও নেই—হাবভাব, কথাবার্তায় সে রকম কোনো লক্ষণও নেই। শুধু আছে রুক্ষ নির্মম অভিজ্ঞতার ঊষরতা।

মনটা নরম হয়ে এল হেনড্রিক্সের। শুধোলেন কোমল কণ্ঠে—

'আমি কি খুব জোরে হাঁটছি ?'

'না।'

'আমাকে দেখলে কিভাবে।'

'দেখব বলেই দাঁড়িয়েছিলাম।'

'দেখব বলে দাঁড়িয়েছিলে ?' ধোকায় পড়লেন হেনড্রিক্স—'কাকে দেখবে বলে দাঁড়িয়েছিলে ?'

'জিনিস।'

'জিনিস !'

'না দেখলে ধরব কি করে ?'

'কি জিনিস তা তো বললে না ?'

'খাবার জিনিস।'

'তাই বলো,' ঠোঁট কামড়ে ধরলেন হেনড্রিক্স। বেচারা ! আধপচা টিনের খাবার, ইঁদুর, কাঠবিড়ালী, কচ্ছপ আর ঢোঁড়াসাপ মেরেই হয়ত খায়। ভাঙা শহরের তলায় পাতাল সুড়ঙ্গে থাকে। সঙ্গী বলতে ছুঁচোরা। বিকিরণ পরিবেশে থেকেই সে অভ্যস্ত—জানেও না মাথার ওপর মাটিতে পোঁতা রয়েছে রাশিয়ান মাইন—যে কোনো মুহূর্তে ফাটতে পারে—জীবন্ত সমাধি হতে পারে।

এবার প্রশ্ন করল ডেভিড—'কোথায় যাচ্ছি ?'

'রাশিয়ান ঘাঁটিতে।'

'রাশিয়ান ?'

'শত্রু। এ যুদ্ধ যারা শুরু করেছে। ওরাই প্রথম বিকিরণ বোমা ফেলেছে আকাশ থেকে। পৃথিবীর এই হাল হয়েছে তাদেরই জন্যে।'

মাথা নেড়ে সায় দিল ডেভিড। মুখে কথা বলল না। চোখেও ভয় ঘৃণা ধিক্কার জাতীয় কোন ভাব প্রকাশ পেল না। পার্থিব অনুভূতির উর্ধ্বে যেন উঠে গিয়েছে ডেভিড। লোপ পেয়েছে ইন্দ্রিয়ানুভূতি।

হেনড্রিক্স বললেন—'আমি কিন্তু আমেরিকান।'

শুনল ডেভিড, মন্তব্য করল না। এগিয়ে চলল দুজনে। হেনড্রিক্স সামনে—ডেভিড পেছনে, বুকের ওপর দু'হাতে চেপে রইল ভালুক ছানা খেলনা।

বিকেল চারটে নাগাদ থামলেন হেনড্রিক্স কিছু খেয়ে নেওয়ার জন্যে। খানকয়েক কংক্রিটের চাঁইয়ের ফাঁকে কাঠকুটো জড়ো করে আগুন জ্বালালেন। আগাছা সাফ করে বসবার জায়গা করে নিলেন। রাশিয়ান ঘাঁটি এখান থেকে বেশী দূরে নয়। এককালে এখানে একটা ফল আর ফুলের উপত্যকা ছিল। ফলভারে নত গাছ আর রঙীন ফুলের বাহার চোখে দেখে জুড়িয়ে যেত। মাঝখান দিয়ে দূর দিগন্তের পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সুদীর্ঘ পথ—দুপাশে ঝুঁকে থাকত সবুজ গাছ। ডালে ডালে নৃত্য করত পাখীর দল, পত্র মর্মরে মুখরিত থাকত সমস্ত পথটা। বাতাসে ভাসত পাকা ফল আর ফোটা ফুলের মিশ্রিত সৌরভ।

আজ আর কিছুই নেই। দগ্ধ বৃক্ষকাণ্ডগুলো অতীতের প্রেতের মত এখনও দাঁড়িয়ে আছে। ধূসর কুহেলীর মত দূর দিগন্তে দেখা যাচ্ছে পবত মালা। পত্রমর্মরে মুখরিত অপরূপ সুন্দর সেই পথের ওপর দিয়ে এখন কেবল ভেসে যায় ঝোলা মেঘের দল—সে মেঘে আছে কেবল গুঁড়ো ছাই—রঙও ছাইয়ের মত। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় ঝুরঝুর করে ছাই ঝরে পড়ে পোড়া গাছ, ভাঙা ইমারত আর পর্বত প্রমাণ রাবিশের ওপর।

কফি তৈরী করলেন হেনড্রিক্স। গরম করলেন সেদ্ধ মাটন। তারপর রুটি মাংস এগিয়ে দিলেন ডেভিডের দিকে।

বললেন—'খাও।'

আগুনের ধারে হাঁটু মুড়ে বসেছিল ডেভিড। রুটি আর মাংসের দিকে নির্ভাব চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল।

বলল—'না।'

'না কেন? খাবে না?'

'না।'

হেনড্রিক্স আর পীড়াপীড়ি করলেন না। ছেলেটা বোধ হয় মিউটান্ট।* বিশেষ খাদ্যে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। ক্ষিদে পেলে খাবার জুটিয়ে নেবে'খন। ছেলেটা কিন্তু সত্যিই বড় অদ্ভুত প্রকৃতির। পৃথিবীতে এরকম অদ্ভুত ব্যাপার অবশ্য আকছার ঘটছে আজকাল। সারা ভূপৃষ্ঠ জুড়ে কতরকম পরিবর্তনই তো ঘটল এবং এখনও ঘটছে। প্রাণ আর আগের অবস্থায় নেই। জীবনের ধারা নিত্য নতুন পথে মোড় নিচ্ছে। আগে যা ছিল—সেরকমটি আর নেই—ভবিষ্যতেও হবে না। মানুষজাতটা পাল্টে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। মুষ্টিমেয় মানুষ তা হৃদয়ঙ্গম করছে—কিন্তু বড্ড দেরীতে।

'বেশ তো, ক্ষিদে পেলে পছন্দমত খাবার খেও,' বলে আর কথা না বাড়িয়ে ডেভিডের ভাগের রুটি-মাংস নিজেই খেয়ে নিলেন হেনড্রিক্স। গরম কফি দিয়ে নামিয়ে দিলেন উদরে। খেতে সময় লাগল, তাড়াতাড়ি খেতে পারছিলেন না মাংস শক্ত থাকায়। খাওয়া শেষ হলে উঠে দাঁড়িয়ে পা দিয়ে মাড়িয়ে নিভিয়ে দিলেন আগুন।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল ডেভিড। শিশু-সুলভ চোখে চেয়ে রইল তাঁর পানে।

'চলো যাই,' বললেন হেনড্রিক্স।

'চলো।'

আগে চললেন হেনড্রিক্স। কাঁধের বন্দুক নামিয়ে আনলেন।

---

* আকস্মিক কোন কারণে জীবের সন্তানসন্ততিদের মধ্যে পিতামাতার গুণাবলী থেকে অন্যরূপে গুণাবলীর বিকাশ ঘটলে বলা হয় 'মিউটেসন। বংশপরম্পরায় এই নতুন গুণ, ধর্ম বা স্বভাব সঞ্চারিত হলে তাদের বলা হয় মিউট্যান্ট। এরকমটি ঘটতে পারে এক্স-রশ্মির প্রভাবে এবং বিকিরণ প্রভাবে।

আবার টানটান হয়ে উঠেছে প্রতিটি মাংসপেশী। স্নায়ু অতিশয় সতর্ক। রাশিয়ান ঘাঁটি আর বেশী দূরে নেই। ওরাও নিশ্চয় অপেক্ষায় রয়েছে তাঁর। চিঠি পাঠিয়ে বসে রয়েছে জবাবের প্রতীক্ষায়। ভূগর্ভ প্রোথিত বাঙ্কারের মাথায় পেরিস্কোপের ডগা, কয়েকটা রাইফেলের নল আর বড় জোর একটা অ্যান্টেনা। ঐ দেখেই বুঝতে হবে রাশিয়ানদের ঠিকানা, অথচ দিগন্ত পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে কেবল ছাইয়ের স্তূপ, রাবিশের পাহাড় আর ডেলা ডেলা গলিত ধাতুর টিলা।

'আর কদ্দুর?' শুধোয় ডেভিড।

'এসে গেছি। পা টনটন করছে?'

'না।'

'তবে?'

জবাব দিল না ডেভিড। ছাই মাড়িয়ে লিকলিকে পা ফেলে এগিয়ে চলল নীরবে, নিঃশব্দে। ছাই জমেছে তার জুতোয়, পায়ে, মুখে, ঘাড়ে। এমনিতেই মুখের রঙ ভ্যাটভেটে সাদা- রক্ত নেই বললেই চলে। তার ওপরে পড়েছে ছাইয়ের পলস্তারা। দেখে মায়া হল হেনড্রিক্সের। দুনিয়ার সব শিশুই এখন এই রকম রক্তহীন। পাতালকক্ষ আর নর্দমার মধ্যে থেকে থেকে নর্দমার জীবই হয়ে গিয়েছে প্রত্যেকে।

গতি মন্থর করলেন হেনড্রিক্স। দূরবীন চোখ লাগিয়ে দেখলেন সামনের পথ—বাঙ্কারের চিহ্ন পর্যন্ত চোখে পড়ল না। কোথায় ঘাপটি মেরে আছে কে জানে। চোখের আড়ালে থেকে চোখে চোখ রেখেছে তাঁকে। ঠিক যে ভাবে হেনড্রিক্সের অনুচররা রাশিয়ান বার্তা বাহককে চোখে চোখে রেখেছিল—সেই ভাবে। ভাবতেই শিরদাঁড়া দিয়ে হিমস্রোত নেমে গেল হেনড্রিক্সের। কে জানে অন্তরালে থেকে শত্রুপক্ষ হয়ত এতক্ষণে বন্দুক উঁচিয়ে ধরেছে—শুধু একটা হুকুমের অপেক্ষা—পরক্ষণেই বিদীর্ণ হবে তাঁর বক্ষপঞ্জর।

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে গেলেন হেনড্রিক্স। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল কপালে। ভয়ংকর এই অস্বস্তি সহ্যেরও অতীত। কিন্তু সহ্য করা ছাড়া উপায়ও নেই। পরিস্থিতি অন্যরকম।

সতর্ক পদক্ষেপে আগুয়ান হলেন হেনড্রিক্স। শক্ত মুঠিতে উদ্যত রইল আগ্নেয়াস্ত্র। বুটের লাথিতে ছিটকে গেল ছাই। পেছনে পেছনে ঠিক আসছে ডেভিড—খেলনা ভালুক ছানাকে চেপে ধরেছে বুকের ওপর। ঠোঁট শক্ত হয়ে চেপে বসেছে দাঁতের ওপর। যে কোনো মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে প্রলয়। আসতে পারে বিপদ। ঝলসে উঠবে সাদা বিদ্যুতের একটা বিদ্যুত ভূগর্ভে পোঁতা কংক্রীট বাঙ্কারের ফুটোয়—নির্ভুল লক্ষ্যে শুইয়ে দেবে হেনড্রিক্সকে।

রাইফেল তুলে বৃথাই চক্রাকারে নাড়তে লাগলেন হেনড্রিক্স। কিন্তু ঘটল না কিছু।

তিলমাত্র নড়াচড়াও দেখা গেল না ধারে কাছে। পাথরের মত সব কিছুই নিস্পন্দ, নিথর। ডান দিকে দেখা যাচ্ছে একটা লম্বাটে ফালি। টানা গিরিপৃষ্ঠ। কি আছে ঐ জঙ্গোলে? এককালে ওখানে লতা মণ্ডপ ছিল নিশ্চয়। দগ্ধ নিকুঞ্জে কয়েকটা বুনো আঙুরগাছ ঝুলছে। তারপরেই অনন্ত অন্ধকারে ভরা ঘন ঝোপ।

তীক্ষ্ণ চোখ মেলে জঙ্গলটার চেহারা দেখলেন হেনড্রিক্স। খুঁটিয়ে দেখবার মত উপযুক্ত জায়গা। ঘাপটি মেরে শত্রুর ওপর নজর রাখার পক্ষে আদর্শ স্থান। সুতরাং পা টেনে টেনে এগোলেন টানা গিরিপৃষ্ঠ অভিমুখে। ডেভিড আসছে পেছনে। এ এলাকা যদি হেনড্রিক্সের খবরদারিতে থাকত, তাহলে সামনেই শান্ত্রী মোতায়েন রাখতেন। শত্রুর চর দেখলেই এতক্ষণে খবর চলে যেত হেনড্রিক্সের কাছে। এটাও ঠিক যে এ-তল্লাট হেনড্রিক্সের এলাকা হলে অগুন্তি থাবা দিয়ে সুরক্ষিত রাখতেন বাঙ্কারকে। প্রতি বর্গইঞ্চি মাটি বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াত শত্রুবাহিনীর কাছে।

ফের দাঁড়ালেন হেনড্রিক্স। দু'পা ফাঁক করে দু হাত রাখলেন উরুর ওপর।

'এসে গেছি ?' শুধোলো ডেভিড।

'প্রায়।'

'দাঁড়ালাম কেন ?'

'খামোকা ঝুঁকি নিতে চাই না বলে।' ইঞ্চি ইঞ্চি করে সামনে এগোতে বললেন হেনড্রিক্স। গিরিপৃষ্ঠ এখন ঠিক ডান দিকে। তুঙ্গে উঠল অস্বস্তি। সত্যিই যদি রাশিয়ান শাস্ত্রী মোতায়েন থাকে ওখানে, এতক্ষণে হেনড্রিক্সের মূর্তি দৃষ্টিগোচর হয়েছে তার। খবর পাঠিয়ে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর অফিসারকে ডাকিয়ে এনেছে বলেই হয়ত এখনো গুলি চালায়নি। অথবা পুরোটাই ধাপ্পাবাজী—পাতা ফাঁদ। যাই হোক না কেন। অদৃশ্য মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও দু হাত মাথার ওপর তুলে ইসারা করতে লাগলেন হেনড্রিক্স। শত্রুপক্ষ দেখুক, উদ্দেশ্য তাঁর অশুভ নয়—পরণে তাঁর রাষ্টসংঘ বাহিনীর পরিচ্ছদ।

ঘাড় ফিরিয়ে ডেভিডকে বললেন—'আমার পাশে পাশে থাকো। অত পেছিয়ে যেও না।'

'তোমার সঙ্গে থাকবো ?'

'আমার পাশে থাকবে। গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকো। নইলে মরবে। এসো এগিয়ে।'

'কিচ্ছু হবে না,' এগোলো না ডেভিড। পেছনেই রইল। বুকের কাছে শক্ত করে ধরে রইল ভালুক ছানা খেলনা।

'যা খুশী করো গে,' বলে দূরবীন তুলে ফের চোখে লাগালেন হেনড্রিক্স। চমকে উঠলেন। কি যেন নড়ে উঠল না দূর গিরিপৃষ্ঠের ঘনায়মান অন্ধকারে ? চোখের ভুল নিশ্চয়। এখন তো কিছু চোখে পড়ছে না। শুধু কালো কালো পোড়া গুঁড়ির খুঁটি আর ছাই। নিষ্প্রাণ সব কিছুই। নিথর এবং নিস্পন্দ। নিস্তব্ধও বটে। শ্বাসরোধী নৈঃশব্দ। তবে বোধ হয় ইঁদুর-টিঁদুর হবে। মিউট্যাণ্ট

ইঁদুর। আকারে বিরাট। কালচে রঙ। বিকিরণের পর থেকেই ওরা পালটে গিয়েছে। খাবাদেয় খপ্পর থেকে বাঁচবার পথ বার করেছে। মুখের লালা দিয়ে ছাই ভিজিয়ে এক রকমের আশ্রয় বানিয়ে নিয়েছে। যখন যেমন তখন তেমন। জীব-জগতের নিয়ম আদিকালে যা, এখনও তাই।

আবার সামনে পা বাড়ালেন হেনড্রিক্স।

মাথার ওপর গিরিপৃষ্ঠে আবির্ভূত হল একটা মূর্তি। হাওয়ায় উড়ছে ওভারকোট। ধূসর রঙ কোটটার। রাশিয়ান সন্দেহ নেই। পেছনে দৃশ্যমান হল আরও একজন সৈনিক। রাশিয়ান। দুজনেই বন্দুক তাগ করল হেনড্রিক্সকে।

পাথর হয়ে গেলেন হেনড্রিক্স। চেঁচাতে গেলেন—কিন্তু কথা আটকে গেল তৃতীয় মূর্তিটি দেখে। এরও পরণে ধূসর সবুজ পরিচ্ছদ। রাশিয়ান। কিন্তু মেয়েছেলে। সামনের দুজন ততক্ষণে নতজানু হয়ে বসে ঢালু গিরিপৃষ্ঠের নিচে তাগ করছে—মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছে দুজনের পেছনে।

এতক্ষণে গলা ফুটল হেনড্রিক্সের। চেঁচিয়ে উঠলেন আকাশ-ফাটা স্বরে—'স্টপ!' হাত দোলাতে দোলাতে বললেন ক্ষিপ্তের মত—'আমি—'

একই-সঙ্গে ফায়ার করল রাশিয়ান দুজন। ফট করে একটা আওয়াজ শোনা গেল হেনড্রিক্সের পেছনে। খুব ক্ষীণ শব্দ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গরম হাওয়া হলকা এসে লাগল গায়ে—পেছন থেকে হাওয়ার ঝাপটায় মুখ থুবড়ে পড়লেন ছাইগাদায়। চোখে মুখে নাকে ঢুকে গেল ছাই। কাশতে কাশতে উঠে দাঁড়ালেন কোন মতে। বেশ বুঝলেন, ফাঁদই বটে। ভুলিয়ে ভালিয়ে টেনে এনে তাঁকে ফাঁদে ফেলছে নচ্ছার রাশিয়ানরা। মরা ছাড়া এখন আর পথ নেই। বোকা পাঁঠার মতই হাড়ি কাঠে গলা বাড়িয়েছেন তিনি—মরতে এসেছেন

সব জেনেই। সুতরাং মৃত্যুই লেখা আছে অদৃষ্টে। নরম ছাইয়ের ওপর দিয়ে হুড়কে তাঁর দিকে নেমে আসছে সৈনিক দুজন এবং সেই মেয়েটা। হেনড্রিক্সের মাথার মধ্যে তখন দপদপ করছে। বিস্ফোরকের কটু গন্ধে গা গুলোচ্ছে। বিশ্রী পোড়া পোড়া গন্ধ। মাথার মধ্যে যেন হাজার টন ওজনের পাথর চাপানো। নাক আর গাল ছড়ে গেছে মুখ থুবড়ে পড়ায়। তা সত্বেও রাইফেলটা তুলতে গেলেন হেনড্রিক্স—কিন্তু হাত যেন অবশ হয়ে গিয়েছে। টিপ করতে গেলেন—পারলেন না অবশ হাত দিয়ে বিষম ভারী রাইফেল তুলতে।

'গুলি করবেন না,' বিকৃত ইংরেজী উচ্চারণে বলল একজন রাশিয়ান।

বলেই তিনজনে ওঁকে ঘিরে ফেলল তিনদিক থেকে। বলল দ্বিতীয় রাশিয়ান 'রাইফেল নামিয়ে রাখুন।'

আচ্ছন্নের মত শুধু চেয়ে রইলেন হেনড্রিক্স। শত্রুর খপ্পরে উনি জীবিত ধরা পড়লেন—মারা গেল বেচারা ডেভিড। ওদের গুলি খতম করেছে শুধু ডেভিডকেই—তাঁকে নয়। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন—ডেভিড অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। তার দেহাবশেষ শতচূর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ছাইয়ের ওপর।

রাশিয়ান তিনজন চোখ কুঁচকে দেখছে হেনড্রিক্সকে। ওঁর হতবুদ্ধি ভাব দেখে যেন মজা পাচ্ছে। উঠে বসে নাকের রক্ত মুছলেন হেনড্রিক্স। গাল থেকে ছাইয়ের টুকরো খসিয়ে আনলেন। বার দুয়েক মাথা ঝাঁকালেন ঘোর কাটিয়ে ওঠার জন্যে। বললেন পরিশেষে, 'ছেলেটা কি দোষ করেছিল? ওকে মারলেন কেন?'

'কেন মারলাম?' অদ্ভুত স্বরে যেন প্রতিধ্বনি করল একজন রাশিয়ান। ধরাধরি করে দাঁড় করাল হেনড্রিক্সকে, বলল—'দেখুন তো ছেলেটার চেহারা।'

দেখলেন না হেনড্রিক্স। চোখ বন্ধ করলেন।

'দেখুন! দেখুন!' তাড়া লাগাল রাশিয়ান—'সময় খুব কম! দেখে নিন চটপট!'

তাড়া খেয়ে চোখ খুললেন হেনড্রিক্স এবং নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে চেয়ে রইলেন বিস্ফারিত চোখে। এ কী দৃশ্য দেখছেন উনি?

'এবার বুঝেছেন তো কেন মারলাম?'

একটা ধাতুর চাকা গড়িয়ে গেল ডেভিডের দেহাবশেষ থেকে। দেখা গেল চকচকে ধাতুর রিলে তারের পার্টস্। লাথিয়ে দেহাবশেষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিল একজন রাশিয়ান। ছিটকে গেল বিভিন্ন পার্টস্, গড়িয়ে গেল চাকা, ঠিকরে গেল স্প্রিং আর রড। খুলে গেল একটা আধপোড়া প্লাস্টিকের ঢাকনি। দেখেই কাঁপতে কাঁপতে ফের বসে পড়লেন হেনড্রিক্স। ঢাকনিটা ব্রেনের সামনের দিক—করোটির অংশ। ভেতর দেখা যাচ্ছে অতি সূক্ষ্ম, জটিল মগজ, তার, রিলে, ক্ষুদে টিউব, সুইচ, হাজার হাজার পুঁচকে বোতাম···

রাশিয়ান সোলজার বলল কানের কাছে—'রোবটকে পেছনে নিয়ে আসছিলেন বলে গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছিলাম। নইলে সর্বনাশ হত।'

'আমি পেছনে নিয়ে আসছিলাম?'

'ওরাই পেছন ধরে মানুষের। পেছন পেছন এসে বাঙ্কারে ঢুকে পড়ে। তারপর আরম্ভ হয় মানুষ মারার পালা।'

হেনড্রিক্স কি স্বপ্ন দেখছেন? ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু চেয়েই রইলেন! একি শুনছেন তিনি? ডেভিড মানুষ নয়—রোবট!

কাঁধে হাত রাখল রাশিয়ান সোলজার—'আসুন।'

'কিন্তু আমি যাবো ফরোয়ার্ড কম্যাণ্ডের কাছে!'

'ফরোয়ার্ড কম্যাণ্ড বলে আর কিছু নেই,' ছাই মাড়িয়ে গিরি-পৃষ্ঠে বেয়ে উঠতে উঠতে বলল সোলজার—'কেউ আর নেই—আমরা ক'জন ছাড়া বাঙ্কারে ঢুকে পড়েছিল 'ওরা'। সব শেষ করে দিয়েছে।'

বিমূঢ় চোখে চেয়ে রইলেন হেনড্রিক্স।

গিরিপৃষ্ঠের মাথায় এসে পৌঁছোলো সবাই! মেয়েটা হেঁট হয়ে জমির সঙ্গে মিশোনো ছাই রঙের একটা ম্যান-হোল পেঁচিয়ে খুলে ফেলল। ঢাকনি তুলে বললে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে—'দেরী করবেন না, তাড়াতাড়ি নামুন।'

সিঁড়িতে আগে পা দিলেন হেনড্রিক্স। পেছনে পেছনে এল বাকী তিন জন। মেয়েটিই ম্যানহোলের লৌহ-আচ্ছাদন টেনে বন্ধ করে দিলে। ভাল করে ছিটকিনি এঁটে টাইট করে দিলে—যাতে বাইরে থেকে খোলা না যায়!

সৈনিক তুজনের একজন বললে ম্লান হেসে—'ভাগ্য ভাল দেখতে পেয়ে ছিলাম আপনাকে। নইলে আপনি যেখানে যেতেন, রোবটও সেখানে যেত।'

'অনেকদিন আমেরিকান সিগারেট খাইনি। দিন তো একটা সিগারেট,' গায়ে পড়া স্বরে বলল মেয়েটা।

হেনড্রিক্স এগিয়ে দিল সিগারেটের প্যাকেট। মেয়েটি নিজে একটি নিল—তারপর প্যাকেট ঠেলে দিলে তুই সঙ্গীর দিকে। ঘরের কোণে টিমটিম করে জ্বলতে লাগল একটা মাত্র লণ্ঠন। কড়িকাঠ খুব নিচু। সিধে হয়ে দাঁড়ালে মাথা ঠেকে যায়। একটা কাঠের টেবিলের চারদিকে বসে চারজনে। এককোণে জড়ো করা অনেকগুলো এঁটো থালাবাসন। একদিকের দেওয়ালে পর্দা ঝুলছে—ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে আর একটা ঘর। সে ঘরে রয়েছে খাট, ময়লা কম্বল; হুক থেকে ঝুলছে জামাপ্যান্ট।

'আমার নাম করপোর‍্যাল রুডি ম্যাক্সার। পোলিশ!' বলল একজন সোলজার। মাথার হেমলেট খুলে নামিয়ে রাখল টেবিলে। 'বছর তুই আগে এসেছিলাম সোভিয়েট আর্মিতে।' বলে হাত বাড়িয়ে দিল হেনড্রিক্সের দিকে।

ক্ষণিক দ্বিধা করলেন হেনড্রিক্স। তারপর হ্যাণ্ডশেক করে বললেন —'আমি মেজর জোসেফ হেনড্রিক্স।'

'ক্লজ এপ্সটিন,' হাত বাড়িয়ে দিল বেঁটে খাট চেহারার সৈনিকটি। লোকটার মাথায় চুল নেই বললেই চলে। স্নায়ুরুগীর মত কান টানতে টানতে বলল—'অষ্ট্রিয়ান। কবে এসেছিলাম আর্মিতে ঈশ্বর জানেন। আমার মনে নেই। আমরা তিনজনেই শুধু এখানে ছিলাম—আমি, রুডি আর ট্যাসো—মেয়েটিকে দেখিয়ে—'তাই বেঁচে গিয়েছি। ওরা ছিল বাঙ্কারের ভেতরে। কেউ বাঁচেনি।'

'কারা ঢুকেছিল ভেতরে ?

'যাকে আপনি পেছনে টেনে আনছিলেন।'

'একা ?'

'প্রথমে একাই এসেছিল। তারপর ঢুকিয়েছে অন্য রোবটদের।'

সতর্ক হল হেনড্রিক্সের চক্ষু—'অন্য রোবট মানে ? ডেভিড ছাড়াও আছে নাকি ?'

'বাচ্চা ছেলেটা হল ডেভিড। এই হল এক ধরনের রোবট। এরা বুকের কাছে ভালুক ছানার খেলনা নিয়ে ঘোরে। ডেভিড হল ভারাইটি থ্রি। খুব কাজের রোবট।'

'অন্য ভারাইটিগুলো ?'

পকেট থেকে কতকগুলো ফটোগ্রাফ বার করে এপ্সটিন বললে — 'নিজেই দেখুন।'

সুতো দিয়ে বাঁধা ফটোগুলো হাতে নিয়ে গিঁট খুলে ফেললেন হেনড্রিক্স।

ম্লান বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে রুডি ম্যাক্সার—'এখন বুঝছেন তো আমরা কেন সন্ধির জন্যে ডেকে পাঠিয়েছি আপনাকে। এদের চেহারা দেখেছি দিন সাতেক আগে। ছবিও তুলেছি তখন। আপনারা যে থাবা সৃষ্টি করেছেন, সেই থাবারাই এখন নিজেরাই নতুন নতুন টাইপ সৃষ্টি করছে। আরো ভাল টাইপ বানিয়ে নিচ্ছে। মাটির

তলায় আপনাদের রোবট কারখানায় প্রতি মুহূর্তে জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন রোবট—প্রত্যেকটি আগের চাইতে উন্নত। থাবাদের ডিজাইনে আপনারা মেরামতির ক্ষমতা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। আরো সূক্ষ্ম কলকজা বানিয়ে নেওয়ার প্রতিভা আপনারাই ওদের দিয়েছিলেন। দোষটা আপনাদেরই।'

একে একে ফটোগুলো দেখলেন হেনড্রিক্স। খুব দ্রুত তোলা ছবি। অধিকাংশই অস্পষ্ট। তাড়াতাড়িতে ক্যামেরা কেঁপে গিয়েছে। ছবিও নড়ে গিয়েছে। ঝাপসা হলেও দেখা যাচ্ছে ডেভিডকে—একা নয়—কয়েকজন। কয়েকটা ডেভিড। ডেভিড রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। সামনে ডেভিড। পেছনে ডেভিড। মোট তিনজন ডেভিড। হুবহু একরকম। প্রত্যেকের বুকের কাছে ন্যাকড়ার ভালুক ছানা।

বড় করুণ দৃশ্য।

ট্যাসোর গলা শোনা গেল—'মেজর, অন্য ছবিগুলোও দেখুন।'

পরের ছবিগুলো তোলা হয়েছে বেশ খানিকটা তফাৎ থেকে। তালঢ্যাঙা একজন সেপাইকে দেখা যাচ্ছে হাঁটু মুড়ে বসে থাকতে। হাঁটু ঐ একটাই। আর একটা পা উরু থেকে নেই। সেখানে লাগানো কাঠের পা। ক্রাচটা শোয়ানো রয়েছে এই কেঠো পায়ের পাশে। একটা হাতও জখম হয়েছে সেপাইয়ের। ন্যাকড়ার পটি বাঁধা অবস্থায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে গলায় বাঁধা ফেটিতে। অবিকল একই রকম দেখতে আরো দুজন সেপাই দাঁড়িয়ে রয়েছে পাশাপাশি।

ছবিগুলো কুড়িয়ে নিয়ে বললে ক্লজ—'ভ্যারাইটি ওয়ান হল এই জখম সেপাই। ব্যাপারটা বুঝলেন? আপনারা থাবা সৃষ্টি করেছিলেন এমন ডিজাইন মাফিক যাতে তারা মানুষ মারার জন্যেই মানুষের কাছাকাছি যোগ্যতা অর্জন করে। কেমন, তাই না? ফলটা হল মারাত্মক। ওরা একটার পর একটা টাইপ সৃষ্টি করে চলেছে—ধাপে ধাপে এগিয়ে আসছে মানুষের কাছাকাছি। যদ্দিন চেহারা ছিল যন্ত্রের মত, চেনা যেত। হুঁশিয়ার হওয়া যেত টিউব আর মিটার

দেখে, সুইচ আর অ্যান্টেনা দেখে। কিন্তু এখন ওরা আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিচ্ছে অতি সহজেই। মানুষকে মারতে হলে মানুষের সমান বুদ্ধিবৃত্তি তো অর্জন করছেই, সেইসঙ্গে চেহারাটাও বানিয়ে নিয়েছে হুবহু মানুষের মত। মেজর, আপনাদের দোষে আজ আমরা সবাই শেষ হতে বসেছি। তাই আলোচনায় বসতে চাই শত্রুতা ভুলে।'

রুডি বললে—'ভ্যারাইটি ওয়ান নিশ্চিহ্ন করেছে আমাদের উত্তরের বাহিনীকে। কেউ ধরতেও পারেনি ওরা মানুষ নয়—রোবট। শান্ত্রীরা বন্দুক উঁচিয়ে বসে থাকত যন্ত্র-রোবটের প্রত্যাশায়—কিন্তু লেংচে লেংচে আসতো ভ্যারাইটি ওয়ানরা—জখম সৈন্য। কাকুতি মিনতি করে ঢুকে পড়ত বাঙ্কারে। তারপরেই শুরু হত্যার খেলা। ব্যাঙ্কারের পর বাঙ্কার সৈন্য শূন্য করেছে এই ভ্যারাইটি ওয়ানরা—তালঢ্যাঙা ল্যাংচা সেপাইরা।'

তন্ময় হয়ে শুনছিলেন মেজর। ক্লজ থামতেই দ্বিধাজড়িত স্বরে শুধোলেন—'আপনাদের লাইনে এসেছিল কারা ?'

'ভারাইটি থ্রি। মানে, ডেভিড। তাতে কাজ হল আরো বেশী। জানেন তো, সৈন্যরা বাচ্চাকাচ্চা বড্ড ভালবাসে। দেখলেই কোলে নিয়ে আদর করে। তাই শুকনো মুখ ডেভিডকে দেখে বাঙ্কারের ভেতরে নিয়ে গেল, খেতে দিল, আদর করল। তারপরেই স্বমূর্তি ধরল ডেভিড আর ন্যাকড়ার ভালুকছানা। খালি হয়ে এল একটার পর একটা বাঙ্কার।'

'কপাল ভাল আমাদের তিনজনের,' বললে রুডি। 'সব বাঙ্কারে যখন হাহাকার, আমরা তখন এখানে—ট্যাসোর কাছে। ট্যাসো এখানেই থাকে—এই হল ওর ঘাঁটি। কথাবার্তা বলে মই বেয়ে যেই বাইরে বেরিয়েছি, অমনি দেখতে পেলাম ডেভিডরা গিজগিজ করছে কাছে কাছে পাহাড়ের গোড়ায়, চূড়ায়—সর্বত্র। জোর লড়াই চলছে আমাদের বাহিনীর সঙ্গে। ক্লজ ক্যামেরা বার করে ছবি তুলেছি

তখনি। সেই থেকে আর বাইরে বেরোইনি।'

নীরবে ছবির তাড়া সুতো দিয়ে বেঁধে সরিয়ে রাখল ক্লজ।

থ হয়ে রইলেন হেনড্রিক্স।

শুধোলেন অনেকক্ষণ পরে—'যেখানে যেখানে আপনাদের সৈন্য মোতায়েন, সব জায়গাতেই তাহলে এই ব্যাপার চলছে?'

'হ্যাঁ।'

অন্যমনস্কভাবে কব্জিতে বাঁধা বিশেষ ঘড়ির তলায় লুকোনো ট্যাব স্পর্শ করে বললেন স্খলিতকণ্ঠে—'আর আমাদের সৈন্য রয়েছে যেখানে? আমেরিকান সৈন্যরা কিন্তু—'

'আপনাদের ট্যাব-য়ের ধার ধারে না এরা। রাশিয়ান, আমেরিকান, পোল, জার্মান সবাই সমান ওদের কাছে। মানুষ হলেই হল। মানুষের দেহের বিশেষ তাপমাত্রা টের পেলেই ছুটে আসবে নানা ছলছুতো করে। সেইটাই কিন্তু ওদের মোদ্দা উদ্দেশ্য। ওদের ডিজাইনের মূল সূত্রই হল তাপমাত্রা অনুযায়ী মানুষ অন্বেষণ এবং নিধন। উত্তরোত্তর সূক্ষ্ম কলকব্জা বানিয়ে ওরা এখনো তাই করে চলেছে। আপনারা আমেরিকানরা নিজেদের রক্ষে করেছিলেন ট্যাব দিয়ে। কিন্তু ওরা সে বাধাও এখন কাটিয়ে উঠেছে। বিকিরণ ওদের ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। কেন না, ওরা প্রত্যেকে সীসের পাতে মোড়া। সীসের লাইনিং ভেদ করে বিকিরণ ওদের বিকল করতে পারে না কোন মতেই।'

'ভ্যারাইটি ওয়ান মানে জখম সোলজার, ভ্যারাইটি থ্রি মানে ডেভিড। ভ্যারাইটি টু কোনটা?'

'জানি না,' দেওয়ালের দিকে আঙুল তুলে বললেন ক্লজ—'ঐ দুটো প্লেট দেখলেই বুঝবেন।'

দেওয়ালে ঝোলানো রয়েছে পাশাপাশি দুটো ধাতুর পাত। কিনারা ভেঙেচুরে খোঁচা খোঁচা হয়ে গিয়েছে। তেউড়ে বেঁকে গিয়েছে।

রুডি বললে—'বাঁ দিকের প্লেটটা পেয়েছি প্রথম সোলজারের দেহ থেকে। যেভাবে একটু আগে আপনার সঙ্গী ডেভিডকে খতম করলাম, ঠিক ঐভাবে খতম করেছিলাম তাকে। যাচ্ছিল পাহাড়ের তলা দিয়ে পুরোনো বাঙ্কারের দিকে।'

উঠে গেলেন হেনড্রিক্স। দেখলেন, প্লেটের গায়ে স্টাম্প দিয়ে লেখা রয়েছে : 1-V…অর্থাৎ ফার্ষ্ট ভ্যারাইটি।

দ্বিতীয় প্লেটটায় স্ট্যাম্প রয়েছে : III-V…অর্থাৎ থার্ড ভ্যারাইটি।

বললেন মেজর—'এটি নিশ্চয় ডেভিডের বডি থেকে পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ।' বলে হেনড্রিক্সের পেছনে এসে দাঁড়াল ক্লজ। কাঁধের ওপর দিয়ে প্লেট দুটোর দিকে তাকিয়ে বললে—'আমাদের চিন্তা শুধু আর একটা ভ্যারাইটি নিয়ে। ফার্ষ্ট ভ্যারাইটিকে দেখেছি, থার্ড ভ্যারাইটিকেও দেখেছি—কিন্তু সেকেণ্ড ভ্যারাইটির চেহারাও দেখিনি। তবে কি সে ভ্যারাইটি বাতিল হয়ে গিয়েছে? অকেজো বলে ফ্যাক্টরীর বাইরেই বেরোয়নি?'

'মেজর, আপনার কপাল ভাল, বললে রুডি। 'ডেভিড শুধু আপনার পেছন পেছন এসেছে—চোট মারেনি। ও হয়ত ভেবেছিল নিশ্চয় কোনো বাঙ্কারে ঢুকবেন—সেও একটা সুযোগ পাবে।'

'একবার ঢুকলে আর রক্ষে নেই। একাই একশ,' বলতে বলতে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল ক্লজের কপালে। 'ওদের লক্ষ্য একটাই—কিছুতেই তার নড়চড় হয় না। মানুষ নিধন ছাড়া ওদের অভীষ্ট আর কিছুই নেই। তাই ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরোয়। আগে ঢোকে একা মিনমিন করে—তারপর ঢোকায় সবাইকে রুদ্র মূর্তি ধরে। ভয়ংকর সেই দৃশ্য আমি নিজের চোখে দেখেছি,' বলতে বলতে শিউরে উঠল ক্লজ।

কারো মুখে আর কথা নেই।

নৈঃশব্দ ভঙ্গ করে ট্যাসো বললে—'মেজর, আর একটা সিগারেট দিন। কতদিন খাইনি আমেরিকান সিগারেট।'

রাত হয়েছে। আকাশ মিশমিশে কালো। ছাইচূর্ণে ঠাসা ধাবমান মেঘের ফাঁক দিয়ে নক্ষত্ররাশিও চোখে পড়ছে না। মাথার ওপর ডালাটা ঈষৎ তুলল ক্রুজ। সামান্য ফাঁক করল মেজর হেনড্রিক্সের দেখবার সুবিধের জন্যে।

অন্ধকারের দিকে আঙুল তুলে বললে রুডি—'আধ মাইল দূরে রয়েছে আমাদের বাঙ্কার। পর-পর অনেকগুলো। আমরাও ওখানে থাকতাম। সেদিন এসেছিলাম ট্যাসোর সঙ্গে গল্প করতে। সেই ফাঁকেই ওরা ঝাড়েবংশে নিধন করেছে রাশিয়ান আর্মিকে। কেউ আর নেই।'

ভারী হয়ে এল ক্রুজের গলা—'সত্যিই আর কেউ নেই। সব শেষ। সকালের দিকে টনক নড়ল পলিট ব্যুরোর। সিদ্ধান্ত নিল সঙ্গে সঙ্গে। নোটিশ দিল আমাদের। তক্ষুনি রানার পাঠালাম আপনাদের ডেরায়। যতদূর দেখা যায়, ততদূর বন্দুক উচিয়ে নিরাপদ রেখেছিলাম ওকে—তারপর আর জানি না।'

রুডি বললে—'রানারের নাম আলেক্স রাড্রেভস্কি। আমি আর ক্রুজ দুজনেই ওকে চিনতাম অনেকদিন ধরে। ভোর ছটায় ও যখন রওনা হল, সূর্য তখন সবে উঠছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে এলাম এখানে। বন্দুক তৈরী রেখেছিলাম—কিন্তু দেখলাম না কাউকে। আগে এখানে একটা শহর ছিল। এই যে পাতালকুঠরি—এটা ছিল এক চাষার সম্পত্তি। এখন থাকে ট্যাসো। আমরা সবাই জানতাম ওর ঠিকানা। মাঝে মাঝে আসতাম আড্ডা মারতে। অন্যান্য বাঙ্কার থেকেও আসত সবাই, সেদিন ছিল আমাদের পালা। তাতেই বেঁচে গেলাম।'

'স্রেফ কপাল জোরে বেঁচে গেলাম,' বলল ক্রুজ। 'আমাদের বদলে সেদিন অন্য কেউ যদি আসত, তারাও বেঁচে যেত। কিন্তু আয়ু ছিল আমাদেরই। মই বেয়ে উঠে বাইরে বেরিয়ে দেখি শ'য়ে শ'য়ে ডেভিড ঘিরে ফেলেছে সবকটা বাঙ্কারকে। ডেভিডদের সেই প্রথম

দেখলাম। দেখেই বুঝলাম নতুন ভ্যারাইটির রোবট। কেন না ফাষ্ট´ ভ্যারাইটির ছবি কম্যাণ্ডার আমাদের দিয়েছিলেন—হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন কোনো জখম সোলজারকে যেন বাঙ্কারে ঠাঁই দেওয়া না হয়। আর এক পা এগোলেই আমাদের দেখে ফেলত ডেভিডের দল। তাই ঝটপট কয়েকটা ছবি তুলেই পিঠটান দিলাম এইদিকেই। আসবার আগে দুটো ডেভিডকে ফুটিফাটা করলাম গুলি করে। কিন্তু পিঁপড়ের মত পিল পিল করে যারা এসেছে--তাদের দুজন ধ্বংস হলে কি এসে যায়? সেই থেকে বাইরে বেরোনোর সাহসও আর নেই।'

'ডেভিড বা জখম সোলজারকে যদি একা পান, মারতে খুব সুবিধে। ওরা সোজা আসবে আপনার দিকে—তখন গুলি চালান—ফেটে উড়ে যাবে রোবট দেহ। ওদের চেয়ে আমরা অনেক চটপটে—তাই একা পেলে মারা যায়। কিন্তু যখন পিঁপড়ের মত ছেঁকে ধরে—তখন পালানো ছাড়া পথ থাকে না।'

মেজর হেনড্রিক্স ডালার গায়ে হেলান দিয়ে অন্ধকারের পানে তাকিয়ে বললেন—'ডালা তোলা কি নিরাপদ?'

'ডালা না তুললে আপনার ট্রান্সমিটার অপারেট করবেন কি করে?'

কোমরের ক্ষুদে ট্রান্সমিটার খসিয়ে আনলেন হেনড্রিক্স। চেপে ধরলেন কানের ওপর। কনকনে ঠাণ্ডা ধাতুর ছোঁয়ায় ঈষৎ শিউরে উঠে ফুঁ দিলেন মাইকে—ছোট্ট অ্যান্টেনা বাড়িয়ে দিলেন গর্তের বাইরে। অস্পষ্ট গুণ-গুণ ধ্বনি ভেসে এল কানে।

আওয়াজটা খাঁটি বলেই মনে হল। তবুও কানকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারলেন না।

ক্লজ বললে—'ঘাবড়াবেন না। বেগতিক দেখলেই আপনাকে নামিয়ে নেব।'

'ধন্যবাদ,' ট্রান্সমিটার কাঁধে রেখে বললেন হেনড্রিক্স—'ইণ্টারেস্টিং ব্যাপার।'

'ইন্টারেস্টিং কেন ?

'এই নতুন ভ্যারাইটিগুলোর কথা বলছি। থাবাদের নতুন ভ্যারাইটি। পুরোপুরি ওদেরই কব্জায় পড়েছি—ইচ্ছে করলেই পিষে মেরে ফেলবে। এতক্ষণে নিশ্চয় রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর বাঙ্কারেও ঢুকেছে এরা। আমার কি মনে হচ্ছে জানেন ? মানুষ জাতটা শেষ হতে চলল—পৃথিবীর বুকে আসছে আর একটা জাতি। বিবর্তন বড় নিষ্ঠুর।'

রুডি বললে—'মানুষের পর আর কোনো জাত নেই।'

'কেন নেই ? মানুষ তো শেষ হয়ে গেল—মানব সভ্যতাও ফুরিয়ে গেল। এরপর আরম্ভ হবে নতুন সভ্যতা।'

'যন্ত্রসভ্যতা ; কারণ, যারা আসছে, তারা কেউ মানুষ নয়—যন্ত্র। তাদের সমাজও হবে যন্ত্র-সমাজ। আপনারাই তাদের বানিয়েছেন। মানুষ মারার মেশিন মানুষ মেরেই চলবে—সেই তাদের কাজ।'

'যুদ্ধের পর ? যখন সব মানুষ শেষ হয়ে যাবে, তখন ? তখন কে জানে ওদের প্রতিভা নতুন দিকে মোড় নেবে কিনা—নতুন জাত সৃষ্টি করতেও তো পারে।'

'মেজর, আপনি এমনভাবে কথা বলছেন, যেন ওরা জীবন্ত।'

'তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে ?

শ্বাসরোধী নৈঃশব্দ।

রুডি শুধু বললে—'যাই বলুন আর তাই বলুন। ওরা মেশিন। মেশিন ছাড়া কিছুই নয়। দেখতে মানুষের মত হলেও আদতে মেশিন।'

'মেজর,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললে ক্লজ—'ট্রান্সমিটারের কাজ তাড়াতাড়ি সেরে নিন। অনন্তকাল এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।'

শক্ত মুঠিতে ট্রান্সমিটার ধরে কম্যাণ্ড বাঙ্কারের কোড আউড়ে গেলেন মেজর। সাংকেতিক বার্তা শুনেও কেউ সাড়া দিল না

অপরপ্রান্ত থেকে। ফের ডাকলেন, কান খাড়া করে রইলেন। কিন্তু কোনো প্রত্যুত্তর নেই। অখণ্ড নীরবতা ছাড়া কোনো জবাব নেই। তার-টারগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিলেন। কোথাও গলতি পেলেন না।

মাইক মুখে দিয়ে আবার ডাকলেন—'স্কট! আমি মেজর হেনড্রিক্স বলছি। শুনতে পাচ্ছ?'

নীরবতা। অ্যান্টেনা পুরোপুরি তুলে দিয়ে ফের হাঁক পাড়লেন মেজর। এবারেও কোন সাড়া নেই।

'নাঃ। শুনছে সবই, জবাব দিচ্ছে না।'

'বলুন না, ব্যাপারটা জরুরী। এমারজেন্সি।'

'বললেও বিশ্বাস করবে না। ভাববে, জোর করে কথা বলানো হচ্ছে আমাকে। ঘাড় ধরে রাশিয়ানরা কথা বলাচ্ছে মেজর হেনড্রিক্সকে—'নীরস হেসে ফের মাইক তুলে নিয়ে স্কটকে ডাকলেন হেনড্রিক্স। জবাব পেলেন না বটে, না পেয়েও এখানে আসা ইস্তক যা কিছু ঘটেছে, যা কিছু জেনেছেন—সব বলে গেলেন একে একে। কিন্তু নীরব রইল ফোন। অতি মৃদু স্ট্যাটিক শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা গেল না।

ক্লজ বলে উঠল—'বিকিরণ বেশী থাকলে বেতারবার্তা সম্ভব হয় না। কথা শোনা যাচ্ছে না সেইজন্যে।'

'তাই কি?' ট্রান্সমিটার বন্ধ করতে করতে বললেন মেজর—'শুনতে হয়ত পাচ্ছে, কিন্তু জবাব দিচ্ছে না ইচ্ছে করেই। আমি থাকলেও তাই করতাম। বিশেষ করে রানারের মারফৎ খবর পৌঁছোনোর পর থেকেই হুঁশিয়ার থাকবে বাঙ্কারের সবাই—সোভিয়েট লাইন থেকে যে কোনো মেসেজই যাক না কেন, জবাব দেবে না নিরাপত্তার খাতিরে। কেন দেবে? এ গল্প কি বিশ্বাসযোগ্য? শুনেই যাবে—জবাব দেবে না।'

'জবাব দেবার মত হয়ত আর কেউ নেই—তাও তো হতে পারে।'

'বড্ড দেরী হয়ে গেছে। তাই তো?'

'হ্যাঁ!'

কাঁপা গলায় রুডি বললে 'ডালাটা এবার বন্ধ করুন। অযথা ঝুঁকি নেওয়াটা ঠিক হচ্ছে না!'

আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে ফের সুড়ঙ্গের মধ্যে নেমে এঁটে ডালা বন্ধ করে দিল ক্লজ। তারপর সবাইকে নিয়ে এসে বসল রান্না ঘরে। বাতাস এখানে ভ্যাপসা এবং ভারী। চার জনের মনের ওপর বন্ধ-বাতাসের প্রতিক্রিয়াও হল অনুরূপ।

হেনড্রিক্সই প্রথম কথা বললেন। বললেন—'কিন্তু এত তাড়াতাড়ি মানুষ নিধন কি সম্ভব ওদের পক্ষে? ধরুন, আমি বাঙ্কার থেকে বেরিয়েছি দুপুর নাগাদ। দশ ঘণ্টাও হয়নি। এর মধ্যেই কি এতগুলো মানুষকে মারা যায়?'

'মেজর, আপনাদের তৈরী থাবার কেরামতি কি কম? একবার গায়ের ওপর এসে পড়লে টুঁটি কাটতে ক' সেকেণ্ড লাগে? একই স্পীড নতুন ভ্যারাইটিগুলোর মধ্যে রয়েছে। এক জনই যথেষ্ট। হাত আর পায়ের কুড়িটা আঙুল থেকে কুড়িটা ক্ষুরের ফলা বেরিয়ে আসে। শান্তশিষ্ট হাবাগোবা ডেভিড নিমেষের মধ্যে পাগলের মত বন বন করে ঘুরতে থাকে কুড়িটা ক্ষুর নিয়ে। তারপর যখন সাঙ্গপাঙ্গরা ঢুকে পড়ে—তখন আর মিনিট খানেকও লাগে না একটা বাঙ্কারকে সাবাড় করতে। না দেখলে আপনার বিশ্বাস হবে না, মেজর।'

'অবিশ্বাসই বা করি কি করে?' অস্থির চরণে পায়চারী করতে করতে বললেন হেনড্রিক্স।

'বসুন, অস্থির হয়ে লাভ নেই!'

'আমি ভাবছি মুন বেস-য়ের কথা!'

'মুন বেস?' ভুরু তুলল রুডি।

'আমাদের চাঁদের ঘাঁটি। এরা যত শক্তিমানই হোক না কেন,

চাঁদে পৌঁছোনো সম্ভব নয়। কোন মতেই সম্ভব নয়। অসম্ভব! সুতরাং মানুষ জাতটা টিঁকে যাবে চাঁদের ওপর।'

'মুন বেস-য়ের ব্যাপারটা খুলে বলুন তো। ভাসা-ভাসা অনেক কথা শুনেছি বটে। পরিষ্কার কিছুই জানি না। আপনি জানেন? ওখানকার ব্যাপারটা কি?'

'আমাদের যা কিছু দরকার, সব আসে মুন বেস থেকে। গভর্ণমেণ্ট দপ্তর খুলে বসেছে সেইখানেই। চন্দ্রপৃষ্ঠের ওপরে নয়—তলায়। পাতাল-গহ্বরে। লোকজন, কলকারখানা—সবই রয়েছে—চাঁদের গহ্বরে। ওরাই বাঁচিয়ে রেখেছে আমাদের। এখানকার রোবটরা যদি একটাও চান্স পায় চাঁদে পা দেওয়ার—'

'একজন গেলেই যথেষ্ট। দলবলকে নিয়ে যাবে ঐ একজনই। শ'য়ে শ'য়ে হাজারে হাজারে একই রকম রোবট ছেয়ে ফেলবে চাঁদের পিঠ। ঠিক যেন পিঁপড়ের পাল। দেখলে অবাক হবেন।' '

ট্যাসো এতক্ষণ শুনছিল। এবার বললে—'সোস্যালিজম চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছোলে যে রকমটি হওয়া উচিত—তাই। সবাই সমান—আলাদা কেউ নয়।'

অস্থির চরণে হেনড্রিক্স আবার পায়চারী করতে লাগলেন ঘরময়। খাবার আর ঘামের গন্ধে ঘরের মধ্যে তখন টেঁকা দায়। কেউ কিন্তু কোনো কথা বলল না- শুধু চেয়ে রইল হেনড্রিক্সের পানে। কিছুক্ষণ পর ট্যাসো পাশের ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বললে—'আমি চললাম ঘুমোতে।'

পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হল ট্যাসো। ক্লজ আর রুডি টেবিলে বসে নিরীক্ষণ করতে লাগল হেনড্রিক্সের হাবভাব। কিছুক্ষণ পরে ঠোঁট টিপে বললে ক্লজ—'সব কিছুই নির্ভর করছে এখন আপনার ওপর। আপনাদের পরিস্থিতি আপনিই ভাল জানেন।'

রুডি একটা মরচে ধরা মগে কফি ঢালতে ঢালতে বললে—'পরিস্থিতি খুবই সঙীন। আমাদের অবস্থাই দেখুন না। যতক্ষণ

ভেতরে আছি, ততক্ষণ নিরাপদ। বেরোলেই বিপদ। অথচ একদিন না একদিন বেরোতেই হবে—কেন না খাবার আর জল তো অফুরন্ত নয়।'

'তখন বেরোনো যাবে 'খন।'

'বেরোলেই মরব। বেশীদূর যেতে হবে না। মেজর, আপনার কম্যাণ্ড বাঙ্কার এখান থেকে কদ্দুর?'

'জেনে লাভ?' বলল ক্লজ। 'গিয়ে হয়ত দেখবে ওরা আগে-ভাগেই সেখানে রক্তগঙ্গা বইয়ে বসে আছে।'

'তখন ফিরে এলেই হল,' বলল রুডি।

পায়চারী থামিয়ে হেনড্রিক্স বললেন—'ওরা আমেরিকান বাঙ্কারেও ঢুকে পড়েছে, হঠাৎ তা মনে হল কেন?'

'কি করে তা বলব? শুধু এইটুকু বলতে পারি যে ওদের প্রত্যেকেই ভীষণ চটপটে আর দারুণ সঙ্ঘবদ্ধ। কখন কে কি করছে না করছে, সে সম্বন্ধে জ্ঞান অত্যন্ত টনটনে। নিজেদের কোনো কাজে তিলমাত্র গাফিলতি নেই। চুপচাপ ঘাপটি মেরে বসে থাকে দিনের পর দিন, তারপর আচমকা যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে—তখন আসে পঙ্গপালের মত। আসে ঝড়ের মত—যায় ঝড়ের মত। ওদের প্রতিটি আক্রমণ এমনি ধরনের। চোরের মত চুপিসারে নজর রাখে আমাদের ওপর—তারপরেই উল্কাবেগে কাজ সমাধা করে অদৃশ্য হয়ে যায় আড়ালে। ওদের সাফল্যের মন্ত্রগুপ্তিই হল স্পীড আর সিক্রেসি—ক্ষিপ্রতা আর গোপনীয়তা। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে—এক মুহূর্ত আগেও কেউ কল্পনাও করতে পারে না কি ঘটতে চলেছে।...'

ইস্পাতকঠিন মুখে শুধু শুনেই গেলেন হেনড্রিক্স—কথা বললেন না।

পাশের ঘর থেকে ভেসে এল ট্যাসোর কণ্ঠস্বর—'মেজর?'

পর্দা ফাঁক করে হেনড্রিক্স বললেন—'কি হল?'

খাটের ওপর শুয়ে অলস নয়নে চেয়ে ট্যাসো বললে—'আমেরিকান সিগারেট আর আছে?'

ঘরে ঢুকে বিছানার পাশে টুলের ওপর বসলেন মেজর। পকেট হাতড়ে বললেন—'না। সব শেষ।'

'যাচ্চলে।'

'কোন দেশের মেয়ে তুমি?' একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলেন মেজর।

'রাশিয়ার।'

'এখানে কি করে এলে?'

'এখানে মানে?'

'এ জায়গা আগে ফ্রান্সের মধ্যে ছিল। নরম্যাণ্ডির অংশ। সোভিয়েট আর্মির সঙ্গে এসেছিলে কি?'

'কেন?'

'এমনি জিজ্ঞেস করছি,' খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ট্যাসোকে দেখতে দেখতে বললেন হেনড্রিক্স। কোট খুলে ফেলেছে ট্যাসো—ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে খাটের ওদিকে। বয়স কম, কুড়ির বেশী নয়, লম্বা চুল ছড়িয়ে আছে বালিশের চারধারে। বড় বড় কৃষ্ণকালো দুই চোখ মেলে নীরবে অনিমেষে দেখছে হেনড্রিক্সকে।

'মতলব কি আপনার?'···প্রশ্ন করল ট্যাসো।

'কিস্সু না। বয়স কত তোমার?'

'আঠারো,' দু'হাত মাথার পেছনে রেখে পলকহীন চোখে তখনো হেনড্রিক্সের মুখের পানে চেয়ে রইল ট্যাসো। পরণে রাশিয়ান আর্মি প্যাণ্ট আর সার্ট, ধূসর সবুজ। মোটা চামড়ার বেল্টে কাউণ্টার আর কার্টিজ। মেডিসিন কিট।

'আগে সোভিয়েট আর্মিতে ছিলে বুঝি?'

'না।'

'তাহলে এই ইউনিফর্ম পেলে কোত্থেকে?'

'আমাকে দিয়েছে।'

'কত বয়সে এসেছ এখানে?'

'ষোল।'

'এত কম বয়সে?'

'কি বলতে চান?' সরোবরের মত বিশাল চক্ষু সঙ্কীর্ণ হয়ে এল প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে।

হেনড্রিক্স বললেন—'যুদ্ধ শুরু না হলে তোমার জীবনটাই হত অন্যরকম। ষোল বছর বয়স তোমার। এই বয়েসে এসেছো এই জীবনে?'

'কি করব? বাঁচতে হবে তো?'

'আমি নীতি বাক্য আওড়াচ্ছি না।'

'আপনার জীবনও অন্যরকম হত,' বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে ট্যাসো খুলে ফেলল এক পায়ের বুট, লাথি মেরে ফেলে দিল মেঝের ওপর। 'মেজর আপনি পাশের ঘরে গেলে ভাল হত। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'চারজনে এইটুকু কুঠরিতে কি থাকা যায়? আর ঘর আছে নাকি?'

'জানি না।'

'নিশ্চয় আরো বড় ছিল পাতাল কুঠরি। আরো ঘর ছিল—এখন রাবিশে ভরে গেছে। সাফ সুতরো করে নিয়ে থাকতে পারতাম।'

'তা পারতেন। কিন্তু আমার জানা নেই,' বলতে বলতে বেল্ট আলগা করল ট্যাসো। আরাম করে খাটে শুয়ে খুলতে লাগল সার্টের বোতাম। 'সিগারেটের প্যাকেট কি একেবারেই খালি?'

'হ্যাঁ। এক প্যাকেটই এনেছিলাম।'

'ভুল করেছিলেন। যাকগে, আপনার বাঙ্কারে গিয়ে প্যাকেট প্যাকেট খাওয়া যাবে'খন', পায়ের লাথিতে ছিটকে গেল আরো একটা বুট। আলোর দড়িতে হাত দিয়ে বললে ট্যাসো—'গুড নাইট।'

'এখুনি ঘুমোবে নাকি?'

'হ্যাঁ।'

ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। উঠে দাঁড়ালেন মেজর, পর্দা সরিয়ে এসে দাঁড়ালেন পাশের ঘরে।

সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন পুতুলের মত।

দেখলেন, রুডি দেওয়ালের গায়ে পিঠ দিয়ে যেন মিশে গেছে—মুখ নিরক্ত। হাঁ করে খাবি খাচ্ছে—কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরোচ্ছে না। পেটে পিস্তল ঠুসে ধরে সামনেই দাঁড়িয়ে ক্লজ। কেউ নড়ছে না। ক্লজের আঙুল শক্ত হয়ে চেয়ে বসেছে পিস্তলের ট্রিগারে। মুখের প্রতিটি রেখা শক্ত। রুডির মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে—কণ্ঠ শব্দহীন—যেন থেঁৎলে গিয়েছে দেওয়ালের সাথে।

'একি কাণ্ড!', অস্ফুট কণ্ঠে বললেন হেনড্রিক্স।

'মেজর,' কাটা স্বরে জবাব দিল ক্লজ। 'কাছে আসুন, রিভলবার সঙ্গে আনুন। তাড়াতাড়ি।'

পিস্তল টেনে বার করলেন মেজর—'বলুন কি ব্যাপার।'

'আমার পাশে এসে দাঁড়ান—রিভলবার উঁচিয়ে রাখুন—তাড়াতাড়ি!'

ঈষৎ নড়ে উঠল রুডি, দু'হাত সামান্য নামিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চাইল হেনড্রিক্সের পানে। জিভ দিয়ে বুলিয়ে নিল শুকনো ঠোঁট। বেচারার চোখের সাদা অংশ সাদা পাথরের মত যেন জ্বলছে। দরদর করে ঘাম পড়ছে কপাল বেয়ে। ভাঙা ভাঙা অস্ফুট স্বরে বলে উঠল মেজরকে—'ওকে থামান! ওর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে!'

'কি হচ্ছে এ সব?' শক্ত গলায় শুধোলেন হেনড্রিক্স।

পিস্তল না নামিয়েই বললে ক্লজ—'কিছু আগে কি বলছিলাম মনে পড়ে? ফার্ষ্ট ভ্যারাইটির আর থার্ড ভ্যারাইটির রোবট আমি দেখেছি—কিন্তু সন্ধান পাইনি সেকেণ্ড ভ্যারাইটির।' দম নিয়ে শেষ করল চিবিয়ে—'কিন্তু এখন পেয়েছি। এই সেই সেকেণ্ড ভ্যারাইটি।'

বলেই, গুলি করল ক্লজ। এক ঝলক শ্বেত উত্তাপ নলচে দিয়ে বেরিয়ে এসে যেন লেহন করল রুডির আতংক পাণ্ডুর দেহ।

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল ট্যাসো—'ক্লজ! গুলি করলে কেন?'

ঝলসানো দেহটা তখন আস্তে আস্তে এলিয়ে পড়ছে মেঝের ওপর। সেইদিকে কঠোর দৃষ্টি রেখে বলল ক্লজ—'সেকেণ্ড ভ্যারাইটির সন্ধান পেয়েছি ট্যাসো। তিন রকম রোবটকেই এখন চেনা গেল। বিপদও কমল।'

ট্যাসোর কানে কথাগুলো ঢুকছে বলে মনে হল না। বিস্ফারিত চোখে আধপোড়া দেহটার পানে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ।

বললে উত্তেজনা-বিকৃত কণ্ঠে—'ক্লজ! একি করলে? খুন করলে রুডিকে?'

'খুন? রোবট মারলে খুন করা হয় না। রুডিকে সন্দেহ হয়েছিল। আগে থেকেই—তক্কে তক্কে ছিলাম প্রমাণের আশায়। কিন্তু একটু আগে আর কোন সন্দেহ রইল না,' পিস্তলের নল প্যান্টে ঘসতে ঘসতে কাঁপা গলায় বলল ক্লজ—'বরাতজোর বলে বেঁচে গেলাম এ যাত্রা। ঘণ্টা খানেক পরে আর দেখতে হত না—'

নিরুত্তরে এগিয়ে গেল ট্যাসো। হেঁট হয়ে চেয়ে রইল রুডির ঝলসানো দগ্ধাবশেষের দিকে।

বলল বিদ্রুপ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে—'রুডিই সেকেণ্ড ভ্যারাইটি, কেমন? নিঃসন্দেহ হয়েছিল বলেই গুলি চালালে, তাই না? কিন্তু রোবটের গায়ে কি মাংস থাকে? হাড় থাকে? মেজর, দেখে যান নিজের চোখে।'

দৌড়ে গেলেন হেনড্রিক্স। ছিন্নভিন্ন দেহটি মানুষের দেহ। ঝলসানো মাংস, পোড়া হাড়ের টুকরো, করোটির কিছুটা অংশ। সন্ধি বন্ধনী, আন্তর যন্ত্র এবং রক্ত। রক্ত থই থই করছে দেওয়ালের কাছে মেঝের ওপর।

ধারালো কণ্ঠে ট্যাসো বললে—'দেখছেন? মানুষের দেহ। চাকা·

নেই, পার্টস্ নেই, রিলে নেই। থাবা পর্যন্ত নেই! সুতরাং সেকেণ্ড ভ্যারাইটি নয়—রক্ত মাংসের মানুষ।' দু'হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে রেখে বললে হিমশীতল কণ্ঠে—'ক্লজ, জবাব দাও কেন এ কাজ করলে।'

কাঁপতে কাঁপতে টেবিলে বসে পড়ল ক্লজ। অকস্মাৎ সমস্ত রক্ত যেন নেমে গেল মুখ থেকে। দু'হাতে মুখ চাপা দিয়ে দুলতে লাগল বিকার গ্রস্তের মত।

ছিটকে গিয়ে নখ দিয়ে কাঁধ খামচে ধরল ট্যাসো—'বলো! জবাব দাও! কেন এ কাজ করলে? কেন ওকে খুন করলে?'

নরম কণ্ঠে বললেন হেনড্রিক্স—'ভয় পেয়েছিল বলে! উত্তেজনা উৎকণ্ঠা উদ্বেগ, এই পরিবেশ আর অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ কল্পনায় মাথা ঠিক রাখনে পারেনি বলে।'

'তাই কি?'

'তবে আর কি? তোমার কি মনে হয়?'

'আমার তো মনে হয় বিশেষ কারণেই খুন করা হয়েছে রুডিকে। বেশ ভাল রকমের কারণ।'

'কি কারণ?'

'রুডি কিছু জেনে ফেলেছিল—তাই।'

ট্যাসোর শক্ত মুখের পানে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে বললেন হেনড্রিক্স 'কি জেনেছিল?'

'ক্লজের গুপ্ত রহস্য।'

চকিত চাহনি নিক্ষেপ করল ক্লজ।

'মেজর, একি সাংঘাতিক কথা! ট্যাসো কি বলতে চাইছে বুঝেছেন? ওর ধারণা আমিই তাহলে সেকেণ্ড ভ্যারাইটি! মেজর, একি সর্বনেশে কথা! আমি রোবট বলেই খুন করেছি রুডিকে—বিশ্বাস হয় আপনার?'

'তাই যদি না হবে তো খুন করলে কেন?' বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই ট্যাসোর কণ্ঠে।

'আমার সন্দেহ হয়েছিল—তাই। কেবলি মনে হচ্ছিল, রুডি আসলে ছদ্মবেশী থাবা। আমাদের ফালা ফালা করতে এসেছে।'

'কেন? হঠাৎ এ সন্দেহ হল কেন?'

আমতা আমতা করতে লাগল ক্লজ—'আমি···মানে···আমার সন্দেহ হয়েছিল।'

'কেন?'

'অদ্ভুত একটা শব্দ কানে এসেছিল। মনে হল যেন একটা চাকা ঘুরছে ওর শরীরের মধ্যে।'

বোবা হয়ে রইল তিনজনে।

হেনড্রিক্সের পানে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল ট্যাসো—'বিশ্বাস হয় আপনার?'

'হয়।'

'আমার হয় না। বলতে বলতে ঘরের কোণে দাঁড় করানো রাইফেলে হাত দিল ট্যাসো—'রুডিকে মেরেছে বিশেষ কারণে। বিশেষ উদ্দেশ্যে।'

'ঢের হয়েছে, আর না', বজ্রকঠোর কণ্ঠে হুংকার ছাড়লেন হেনড্রিক্স। 'আর খুনোখুনি নয়। একটা খুনই যথেষ্ট। ক্লজকে মেরেও কি সেই ভুল করতে চাও?'

কৃতজ্ঞ চোখে চাইল ক্লজ—'ধন্যবাদ মেজর। আমি ভয় পেয়ে ভুল শুনেছি—মাথার ঠিক রাখতে পারি নি। ট্যাসোও ভয় পেয়েছে। তাই খুন করে খুনের বদলা নিতে চাইছে।'

মইয়ের দিকে পা বাড়িয়ে হেনড্রিক্স শুধু বললেন—'না, না, আর খুন নয়। আর রক্তারক্তি নয়। যাই, আর একবার ট্রান্সমিটার চালিয়ে দেখি। সাড়া না পাইতো কাল ভোরেই রওনা হব বাঙ্কারের দিকে।'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল ক্লজ—'চলুন, আমিও হাত লাগাই।'

বাইরে তখন বেশ ঠাণ্ডা। সারাদিনের গরম রাত নামার সঙ্গে

সঙ্গে পালিয়েছে। ধরণী এখন হিমশীতল। বুক ভরে শ্বাস নিল ক্লজ। সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে দাঁড়াল বাইরের জমিতে! দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে বন্দুক হাতে উৎকর্ণ হয়ে রইল। সতর্ক চাইনি ঘুরতে লাগল আঁধার রাজ্যে। সুড়ঙ্গের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষুদে ট্রান্সমিটারে টিউনিং করতে লাগলেন হেনড্রিক্স।

'পেলেন?' প্রশ্ন করল ক্লজ।

'না।'

'চেষ্টা করে যান। খুলে বলুন এখানকার অবস্থা।'

ক্রমাগত কথা বলে চললেন হেনড্রিক্স। কিন্তু বৃথাই। শেষকালে অ্যাণ্টেনা নামিয়ে বললেন—'ধ্বত্তোর! হয় ওরা আমার কথা শুনতে পাচ্ছে না, অথবা শুনেও মটকা মেরে রয়েছে—জবাব দিচ্ছে না।'

'অথবা কেউ বেঁচে নেই!'

'দেখা যাক শেষবার চেষ্টা করে।' অ্যাণ্টেনা টেনে তুললেন হেনড্রিক্স। 'স্কট, কথা শুনতে পাচ্ছো? আমি মেজর···হেনড্রিক্স!'

কথা থামিয়ে কান পেতে রইলেন। শোনা গেল শুধু স্ট্যাটিক সাউণ্ড। তারপরে ক্ষীণ কণ্ঠে ভেসে এল একটা স্বর—

'আমি স্কট বলছি।'

'স্কট! তুমি?' গলা, কেঁপে গেল হেনড্রিক্সের।

'হ্যাঁ আমি, স্কট।'

ধুপ করে পাশে বসে পড়ল ক্লজ—'আপনার অফিসার?'

'স্কট, শোনো। শুনতে পাচ্ছো? আমি থাবাদের সম্পর্কে যা-যা বলেছিলাম, শুনতে পেয়েছিল?'

'হ্যাঁ', খুব ক্ষীণ কণ্ঠে ভেসে এল জবাবটা। যেন বাতাস ফিস-ফিসিয়ে উঠল—এত অস্পষ্ট।

'আমার মেসেজ পেয়েছিলে?' বাঙ্কারে কোনো উৎপাত ঘটেনি? ওরা ঢুকে পড়েনি?'

'সব ঠিক আছে।'

'ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করেছিল ?'

কণ্ঠস্বর আবার ক্ষীণ হয়ে আসছে—'না।'

ক্রুজকে বললেন হেনড্রিক্স উল্লসিত কণ্ঠে—'সব ঠিক আছে। ওরা বেঁচে আছে।'

'কেউ অ্যাটাক করেছিল কি ?'

'না,' ফোনটা কানের ওপর চেপে ধরে ফের বললেন হেনড্রিক্স—'স্কট, মুন বেসকে খবর পাঠিয়েছো ? ওরা কি জানে ? হুঁশিয়ার হয়েছে কি ?'

জবাব নেই।

'স্কট ! শুনতে পাচ্ছো ?'

নৈঃশব্দ।

ফোন নামিয়ে আনলেন হেনড্রিক্স—'মিলিয়ে গেল। বিকিরণের উৎপাত আবার শুরু হল মনে হচ্ছে।'

দৃষ্টি বিনিময় করলেন হেনড্রিক্স আর ক্রুজ। কারো মুখে কথাটি নেই। কিছুক্ষণ পরে মুখ খুলল ক্রুজ—'গলার স্বর শুনে কি মনে হল ? আপনার লোক তো ? চিনতে পেরেছেন ?'

'বড় আস্তে আস্তে বলছিল।'

'অর্থাৎ আপনার সন্দেহ যায় নি, তাই তো ?'

'হ্যাঁ।'

'তার মানে, কথা যে বলেছে, সে—'

'মিছে অনুমান করে লাভ কি ? নিজের চোখে না দেখে কিছু বিশ্বাস করি না। এখন নিচে যাওয়া যাক—ডালা বন্ধ না করা পর্যন্ত স্বস্তি নেই।'

মই বেয়ে দুজনে নেমে এল সুড়ঙ্গে। ক্রুজ বল্টু এঁটে টাইট করে বন্ধ করে দিল ডালা। ট্যাসো বসেছিল ওদের অপেক্ষায়—মুখ যেন পাথরে খোদাই।

শুধোলো শুষ্ক কণ্ঠে—'শোনা গেল ?'

নিরুত্তর রইল দুজনেই।

কিছুক্ষণ পরে ক্লজ বললে মেজরকে—'আপনার কি মনে হয়? যার গলা শুনলেন, সে আপনার অফিসার, না, ওদের কেউ?'

'বুঝতে পারলাম না।'

'সেক্ষেত্রে আমরা যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই রইলাম।'

চোয়ালের হাড় শক্ত করে মেঝের পানে চোখ নামিয়ে হেনড্রিক্স বললেন 'অনুমান করতে চাই না। নিজে গিয়ে দেখতে চাই।'

'যেতে তো হবেই। এখানকার খাবার-দাবার ফুরোবে কয়েক সপ্তাহ পরে। তারপর বেরোতেই হবে বাইরে।'

'সেই রকমই মনে হচ্ছে।'

'ব্যাপার কি বলুন তো?' অসহিষ্ণুস্বরে বললে ট্যাসো—'বাঙ্কার পেয়েছিলেন? এত কথা কিসের?'

নিস্তেজ গলায় বললেন হেনড্রিক্স—'পেয়েছিলাম। কিন্তু জবাব যে দিয়েছে, সে আমার অফিসার হতে পারে—নাও হতে পারে।'

'তবে কে?'

'থাবাদের কেউ। যাকগে সে কথা, রাত হল। খামোকা ভেবে লাভ নেই। আপাততঃ ঘুমোনো যাক। কাল সকালেই গিয়ে ভঞ্জন করব চক্ষু-কর্ণের বিবাদ!'

'ভোরে?'

'ভোরে বেরোলেই থাবাদের চোখ এড়োনো সব চাইতে সোজা।'

ভোরের আলো ফুটতেই ফিল্ডগ্লাস দিয়ে দিগন্ত পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে নিলেন মেজর হেনড্রিক্স।

'কি দেখলেন?' প্রশ্ন করল ক্লজ।

'কিচ্ছু না।'

'আমাদের বাঙ্কার চিনতে পারলেন?'

'কোন দিকে?'

'দিন আমাকে,' ফিল্ডগ্লাস টেনে ফোকাস করে নিল ক্লজ। চেয়ে রইল নীরবে নিঃশব্দে। বেশ কিছুক্ষণ।

টানেলের বাইরে এসে দাঁড়াল ট্যাসো—'কি হল? নতুন কিছু?'

'কিচ্ছু না,' ফিল্ডগ্লাস মেজরের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললে ক্লজ—'দেখাই যাচ্ছে না। চলুন, আর দেরী করা সমীচীন হবে না।'

গিরিপৃষ্ঠ বেয়ে নেমে এল তিনজনে—হড়কে এল নরম ছাইয়ের ওপর দিয়ে। চ্যাটালো পাথরের ওপর সড়-সড় করে সরে গেল একটা বড়সড় গিরগিটি। চকিতে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে গেল তিনজনেই।

'কি বলুন তো?' ক্লজ শুধোয় দম আটকানো স্বরে।

'গিরগিটি।'

ছাই তোলপাড় করে ছুটে গেল গিরগিটিটা! গায়ের রঙ অবিকল ছাই রঙের।

'চমৎকারভাবে রং মিলিয়ে নিয়েছে তো। যখন যেমন, তখন তেমন। যখন সবুজ গাছে থাকত, গায়ের রঙ ছিল সবুজ। এখন ছাইয়ের গাদায় ছাই রঙের।' দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল ক্লজ।

গিরিপৃষ্ঠের তলদেশে পৌঁছে দাঁড়াল তিনজনে এবং সন্ধানী চক্ষু বুলিয়ে নিলে আশপাশে।

'কেউ নেই,' বললেন হেনড্রিক্স।' হেঁটেই যেতে হবে আগাগোড়া, সুতরাং রওনা হওয়া যাক। পথের বিপদের মোকাবিলা পথেই করা যাবে।'

ক্লজ হাঁটতে লাগল। ওঁর ঠিক পেছনেই রইল ট্যাসো—হাতে উদ্যত পিস্তল।

ক্লজ বললে—'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবার ছিল।'

'কি?'

'ডেভিডের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল কোথায়? কি ভাবে?'

'রাস্তায়। ভাঙাবাড়ীর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল ডেভিড!'

'কি বলল ?'

'বিশেষ কিছু না।'

'কিছু না ?'

'না। একলা রয়েছে, আমার সঙ্গে আসতে চায়—এর বেশী না।'

'দেখে বুঝতে পারলেন না মেশিনের সঙ্গে কথা বলছেন ?'

'না।'

'অবিকল জ্যান্ত মানুষের মত কথা বলছিল ডেভিড ? একদম সন্দেহ হয় নি ?'

'না। বেশী কথা বললে তো সন্দেহ করব। মুখ টিপে ছিল আগাগোড়া। তাছাড়া, গোড়া থেকেই অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়েনি।'

'সেইটাই তো অস্বাভাবিক।'

'কেন ?'

'ডেভিড এমন একটা মেশিন যাকে মানুষ পর্যন্ত মানুষ বলে ভুল করে। জানি না এর শেষ কোথায়।'

ট্যাসো বললে 'ইয়াঙ্কিরা যেমনভাবে ওদের গড়েছে, যে উদ্দেশ্যে গড়েছে নিষ্ঠার সঙ্গে ওরা তা পালন করে চলেছে। ওদের ডিজাইন করাই হয়েছে খুঁজে খুঁজে মানুষ বার করে মেরে ফেলার জন্যে। মানুষ বংশ ধ্বংস করাই ওদের একমাত্র লক্ষ্য। যেখানে মানুষ পাবে, সেখানেই ছুটবে এবং ছলে-বলে-কৌশলে মানুষ ধ্বংস করবে।'

ট্যাসোর বক্তৃতায় কিন্তু কান ছিল না মেজরের। পাশ ফিরে একদৃষ্টে চেয়েছিলেন ক্লজের পানে। এখন বললেন মৃদুকণ্ঠে—'হঠাৎ অত প্রশ্ন করা হল কেন আমাকে ? কি মতলব আপনার জানতে পারি ?'

'কিছুই না।' সাফ জবাব ক্লজের।

প্রশান্ত কণ্ঠে পেছন থেকে বলে উঠল ট্যাসো—'আমি বলছি। ক্লজ এবার আপনাকেই সন্দেহ করছে। আপনিই সেকেণ্ড ভ্যারাইটি —এসেছেন মানুষের ছদ্মবেশে।'

মুখ লাল হয়ে গেল ক্লজের। ঝটিতি বললে—'সন্দেহ করব না কেন? পাঠিয়ে ছিলাম একজন রানারকে। তারপরেই এলেন মেজর। নিশ্চয় শিকারের সন্ধানেই এসেছেন।'

হো-হো করে হেসে উঠলেন হেনড্রিক্স। কিন্তু প্রাণ খুলে হাসতে পারলেন না। নিজের কানেই অদ্ভুত শোনালো হাসির ধরনটা।

বললেন ভাঙা ভাঙা গলায়—'আমি সটান আসছি রাষ্ট্রসংঘের বাঙ্কার থেকে। সেখানে আমি মানুষ পরিবৃত হয়েই ছিলাম।'

'তা থাকতে পারেন। কিন্তু আমাদের রানারের কাছে খবর পেয়ে ছুটে এলেন রাশিয়ান শিবিরে ঢোকার আশা নিয়ে। এলেন সুযোগের প্রত্যাশায়। রাশিয়ান ফৌজ সাবাড় করার বাসনা নিয়ে—'

'কি মুস্কিল! আমি বাঙ্কার থেকে বেরোনোর আগেই তো সাবাড় হয়ে গিয়েছিল রাশিয়ান ফৌজ! রোবটরা হানা দিয়েছে এখানে অনেক আগেই।'

ট্যাসো এগিয়ে এসে পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে বললে—'মেজর, তাতে কিন্তু কিছুই প্রমাণিত হচ্ছে না।'

'কেন হচ্ছে না?'

'বিভিন্ন রকমের রোবটদের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। আলাদা কারখানায় তৈরী হয়েছে প্রতিটি ভ্যারাইটি। তাই নানান টাইপের রোবট কখনো মিলেমিশে মানুষ ধ্বংস করে না। যদিও তাদের লক্ষ্য এক। সেই কারণেই আপনি যখন মানুষের অন্বেষণে সোভিয়েত শিবিরের দিকে বেরিয়েছেন, তখন জানতেন না অন্য রোবটরা আপনার আগেই সে কাজ সেরে রেখেছে। এমন কি, সবশুদ্ধ কত রকমের রোবট আছে, সে খবরও আপনার পক্ষে জানা সম্ভব নয়।'

ফস করে জিজ্ঞেস করলেন হেনড্রিক্স—'থাবাদের সম্বন্ধে তুমি এত খবর পেলে কোত্থেকে?'

'আমি যে দেখেছি। নিজের চোখে লক্ষ্য করেছি দিনের পর

দিন। কিভাবে ওরা সোভিয়েত বাঙ্কারগুলোয় হানা দিয়েছে—সব দেখেছি।'

ক্লজ শক্ত গলায় বললে—'সেইটাই তো আশ্চর্য।'

'আশ্চর্য কেন ?

'যদ্দুর জানি, খুব একটা বেরোতে না তুমি। না বেরিয়েই এত খবরাখবর রাখাটা একটু অদ্ভুত নয় কি ?'

হেসে উঠল ট্যাসো—'এবার কি আমার পালা ? আমাকেই কি শেষ পর্যন্ত সন্দেহ করে বসলে সেকেণ্ড ভ্যারাইটি বলে ?'

হেনড্রিক্স বললেন—'থাক, থাক, আর সন্দেহ করতে হবে না কাউকে। ঠগ বাছতে গিয়ে গাঁ উজাড় করার মতলব করেছে ক্লজ।'

এরপর খানিকক্ষণ কেউ আর কথা বলল না। পাশাপাশি হেঁটে চলল ছাই মাড়িয়ে।

অবশেষে বললে ট্যাসো- 'আমি আবার বেশী হাঁটতে পারি না। আর কতক্ষণ হাঁটতে হবে, মেজর ?'

মেজর হেনড্রিক্স জবাব দিলেন না।

ট্যাসো দিগন্ত বিস্তৃত ভস্মস্তূপের পানে চেয়ে বললে আপন মনে—'শ্মশান কি গোরস্থানও এর চাইতে ভাল।'

ক্লজ বললে—'যতদূর যাবে, একই দৃশ্য দেখবে। সারা পৃথিবীটাই এখন একটা কবরখানা অথবা শ্মশান ঘাট।'

ফিক করে হেসে ট্যাসো বললে—'আহারে, রোবট আক্রমণের সময়ে তুমি যদি তোমার বাঙ্কারেই থাকতে !'

'তোমার সঙ্গে আড্ডা দিতে এসে তাহলে অন্য একজন বেঁচে যেত।'

'মরতাম আমি। এই তো ?'

'আমিও তো তাই চাই।' হাসতে হাসতে প্যাণ্টের পকেটে হাত পুরে বলল ট্যাসো।

ভস্মাচ্ছাদিত নিস্তব্ধ প্রান্তরের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে তিনজনে এগিয়ে চলল যে যার বন্দুক উঁচিয়ে।

তখন সূর্য পাটে বসছে। হেনড্রিক্স সামনে এগিয়ে গেলেন মন্থর চরণে—হাতের ইসারায় আর এগোতে বারণ করলেন ক্লজ আর ট্যাসোকে।

ক্লজ বসে পড়ল মাটির ওপর। ট্যাসো বসল একটা কংক্রিটের চাঁইয়ের ওপর। হাঁপ ছেড়ে বললে—'উফ! হেঁটে হেঁটে পা ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছে!'

'আস্তে!' চাপা স্বরে বললে ক্লজ।

ধীর চরণে টিলার ওপরে উঠে গেলেন হেনড্রিক্স। গতকাল এই টিলার ওপরেই উঠেছিল রাশিয়ান বার্তা বাহক। উপুড় হয়ে শুয়ে দূরবীন দিয়ে বাঙ্কারের দিকে তাকালেন মেজর।

কিন্তু কিছুই দেখা গেল না। ছাই আর পোড়া গুঁড়ি ছাড়া কিছুই ধরা পড়ল না চোখে। পঞ্চাশ গজ দূরে ফরোয়ার্ড কম্যাণ্ড বাঙ্কারের প্রবেশ পথ। এই বাঙ্কার থেকে কাল বেরিয়ে এসেছেন হেনড্রিক্স। কিন্তু তীক্ষ্ণ চোখে নজর রেখেও কোনো রকম নড়া চড়া বা প্রাণের স্পন্দন দেখতে পেলেন না সেখানে।

'কোথায় বাঙ্কার?' বুকে হেঁটে পাশে এসে শুধোলো ক্লজ।

দূরবীন বাড়িয়ে ধরলেন হেনড্রিক্স—'ঐ নীচে।'

সন্ধ্যে নামছে। ছাই ভরা মেঘ যেন পাক খেতে খেতে ছুটছে রক্তরাঙা আকাশ পথে। অন্ধকার হয়ে আসছে পৃথিবী। বড়জোর আর ঘণ্টা দুয়েক আলো পাওয়া যাবে।

'কই' কিছুই তো দেখছি না' বলল ক্লজ।

'ঐ যে একটা গাছ দেখা যাচ্ছে···পোড়া খুঁটির মত দাঁড়িয়ে আছে, পাশেই ইটের স্তূপ···ঐ ইটের গাদার পাশ দিয়েই ভেতরে ঢোকার রাস্তা।'

'কিছুই চোখে পড়ছে না।'

'পড়বে না। অত সহজে চোখে যাতে না পড়ে, সেইভাবেই তৈরী। যাই হোক, আমি এগোচ্ছি। আপনি আর ট্যাসো পাহারা

দিন ! বাঙ্কারের দরজা পর্যন্ত রাস্তাটা এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বন্দুক তাগ করে রাখুন ঐ দিকেই—আমার জীবন বাঁচানোর ভার রইল আপনাদের দুজনের ওপর।'

'একা যাবেন ?'

'রিস্ট-ট্যাব যতক্ষণ আছে, আমি নিরাপদ। বাঙ্কারের চারধারে ঐ যে ছাইয়ের পাহাড় দেখছেন, ওর মধ্যে হাজার হাজার ছেঁদায় হাজার হাজার জীবন্ত থাবা ওৎ পেতে বসে আছে মানুষ দেখলেই কুচি কুচি করার জন্যে। আমার ট্যাব আমাকে বাঁচাবে—আপনারা পার পাবেন না।'

'তাহলে যান।'

'আমি হাঁটব খুব আস্তে আস্তে। বেগতিক দেখলেই—'

'বাঙ্কারের ভেতরে সত্যিই যদি ওরা ঢুকে পড়ে, আপনাকে পেছন ফেরাও সময়ও দেবে না। আপনার ধারণা নেই ওরা কত জোরে ছোটে।'

'তবে কি করব ?...'

'কি বলব বলুন। ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। এগিয়ে যান—আমরা নজর রাখছি এখান থেকে। উঠে তো আসুক বাঙ্কারের বাইরে—তারপর দেখা যাবে।'

বেল্ট থেকে ট্রান্সমিটার খসিয়ে হাতে নিলেন হেনড্রিক্স। অ্যান্টেনা টেনে তুলে দিলেন ওপরে।

বললেন—'তাহলে চলি।'

ক্লজ ইঙ্গিতে ডেকে আনল ট্যাসোকে। বুকে হেঁটে সে-ও উঠে এল ক্লজের পাশে। ওস্তাদ মেয়ে। এ সব ব্যাপারে রীতিমত পোক্ত।

'ট্যাসো, মেজর একাই যাচ্ছেন। আমরা পাহারা দেব এখান থেকেই। যেই দেখবে উনি পেছন ফিরেছেন, সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুঁড়বে ওঁরই পেছন দিকে।'

'ওরা কিন্তু ভীষণ চটপটে।

'জানি।'

'তোমার নিজের মনেই জোর নেই মনে হচ্ছে?'

'স্বাভাবিক। ওদের বিশ্বাস নেই।'

হেনড্রিক্স বন্দুক খুলে পরখ করছিলেন। এখন বললেন—'দেখাই যাক না ওদের দৌড় কদ্দুর!'

'মেজর, আপনি জানেন না ওরা কি সাংঘাতিক। আসে পিঁপড়ের মত দল বেঁধে—ঝাঁপিয়ে পড়ে বিদ্যুতের মত গতিবেগে।'

'ভাল করে না দেখে বাঙ্কারের ভেতরে না নামলেই হল,' ট্রান্সমিটারের যন্ত্রপাতি দেখে নিলেন হেনড্রিক্স। একহাতে ট্রান্সমিটার, অপর হাতে বন্দুক নিয়ে বললেন—'চললাম।'

হাত বাড়িয়ে দিল ক্লজ—'আগে কথা বলে দেখবেন আপনার লোক কিনা, নিশ্চিন্ত হলে তবে নীচে নামবেন। তার আগে নয়।'

উঠে দাঁড়ালেন হেনড্রিক্স। টিলার গা বেয়ে নেমে গেলেন নিচে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন ইটের গাদা আর মরা গাছের দিকে। বাঙ্কারের প্রবেশ পথ সেখান থেকে দেখা না গেলেও বেশী দূরে নেই।

কিন্তু সামান্যতম নড়াচড়াও দেখা গেল না বাঙ্কারের সামনে। ট্রান্সমিটার তুলে ধরলেন হেনড্রিক্স—অ্যান্টেনা টেনে লম্বা করলেন। মাইকে মুখ ঠেকিয়ে বললেন—'স্কট?' কেউ জবাব দিল না।

'স্কট! আমি হেনড্রিক্স বলছি। শুনতে পাচ্ছ? বাঙ্কারের বাইরে দাঁড়িয়ে বলছি। ভিউ সাইটের মধ্যে দিয়ে দেখতে পাবে আমাকে। স্কট, আমি হেনড্রিক্স...'

কান পেতে রইলেন মেজর। কিন্তু বৃথাই। উৎকণ্ঠায় আঙুলগুলো সাঁড়াশির মত চেপে বসল ট্রান্সমিটারের ওপর—শক্ত কাঠ হয়ে গেল পেটের মাংসপেশী। কিন্তু কোনো সাড়া নেই, শব্দ নেই, কথা নেই। শুধু স্ট্যাটিক সাউণ্ড।

পায়ে পায়ে আবার সামনে এগোলেন হেনড্রিক্স। খড়মড় শব্দ হল পেছনে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন ছাইয়ের গাদার ওপর হড়কে

এসে উঁকি দিচ্ছে একটা থাবা—সসম্ভ্রমে আসছে পেছন পেছন। আসছে এবং সতর্ক চাহনি বুলিয়ে দেখে নিচ্ছে হেনড্রিক্সকে। একটু পরেই ছাই ঝেড়ে এগিয়ে এল আর একটা বড় সাইজের থাবা। এটিও সসম্ভ্রমে বেশ কিছুটা ব্যবধান বজায় রেখে আসতে লাগল পেছনে পেছন।

থমকে দাঁড়ালেন মেজর। কয়েক পা পেছনে থাবা দুটিও থমকে দাঁড়াল।

বাঙ্কারের প্রবেশ পথ এসে গেছে। মেজর হেনড্রিক্স দাঁড়িয়ে আছেন সিঁড়ির গোড়ায়।

কম্পিত কণ্ঠস্বর সংহত করে শেষবারের মত আকুল কণ্ঠে ডাক দিলেন হেনড্রিক্স—'স্কট! আমি মেজর হেনড্রিক্স বলছি। দাঁড়িয়ে আছি ঠিক তোমার মাথার ওপর—বাঙ্কারের ছাদে। দেখতে পাচ্ছো? শুনতে পাচ্ছো?'

বাঁ হাতে ট্রান্সমিটার কানে ঠেকিয়ে কোমরের রিভলবার ডান হাত রাখলেন হেনড্রিক্স—চোখ রইল বাঙ্কারের সিঁড়ির ওপর। সময় বয়ে চলল হু-হু করে, কিন্তু নিবিড় নৈঃশব্দ ছাড়া উৎকর্ণ কানে কিছুই ধরা পড়ল না। স্ট্যাটিকের একঘেয়ে ক্ষীণ তরঙ্গ ছাড়া কানে কিছুই ভেসে এল না।

তারপর অনেক দূর থেকে ধাতব-কণ্ঠে কে যেন বললে:

'আমি স্কট বলছি।'

নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর! উত্থান নেই। এরকম কণ্ঠস্বরের অধিকারী কেউ তো নেই বাঙ্কারে! ধোঁকায় পড়লেন হেনড্রিক্স। নাকি যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে আসার ফলে ঐ রকম যান্ত্রিক শোনাচ্ছে গলার স্বর।

'স্কট, আমি দাঁড়িয়ে ঠিক তোমার মাথার ওপর—ছাদে। বাঙ্কারের সিঁড়ি আমার সামনেই নেমে গিয়েছে নিচে!'

'হ্যাঁ।'

'দেখতে পাচ্ছো?'

'হ্যাঁ।'

'ভিউ সাইটের মধ্যে দিয়ে তো? সাইট অ্যাডজাস্ট করেছো?'

'হ্যাঁ।'

চিন্তার তুফান উঠল হেনড্রিক্সের মনের মধ্যে। এদিকে থাবারা গোল হয়ে ছেঁকে ধরেছে তাঁকে। খাতির করে একটু দূরেই রয়েছে অবশ্য—কব্জিতে রক্ষাকবচটি আছে বলে।

দম নিয়ে বললেন হেনড্রিক্স—'বাঙ্কারে কোনো গোলমাল ঘটেনি তো?'

'না।'

'সব ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে একবার ওপরে এসো। আমি তোমার চেহারাটা দেখতে চাই।'

জবাব নেই।

'স্কট, ওপরে এসো,' নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে ফের বললেন হেনড্রিক্স। 'চেহারাটা দেখাও।'

'নিচে আসুন।'

'হুকুমটা আমিই করছি তোমাকে।'

জবাব নেই।

'আসছ তো?' সাড়া নেই।

'স্কট, আমি অর্ডার দিচ্ছি ওপরে এসো।'

'আপনি নিচে আসুন।'

চোয়ালের হাড় শক্ত করে হেনড্রিক্স বললেন—'লিয়োন কোথায়? তাকে দাও। কথা বলব।'

বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দের পর ভেসে এল আর একটা স্বর। আগের স্বরের মতই শাস্ত, কঠিন এবং তীক্ষ্ণ।

'লিয়োন বলছি।'

'হেনড্রিক্স বলছি। দাঁড়িয়ে আছি ছাদে—তোমার মাথার ওপর। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসো, দেখতে চাই।'

'আপনি নিচে আসুন।'

'কেন নিচে যাব? আমার অর্ডার, তোমাকে ওপরে আসতে হবে।'

নৈঃশব্দ। ট্রান্সমিটার নিচু করলেন হেনড্রিক্স। সতর্ক চাহনি বুলিয়ে নিলেন ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পেছনে। বাঙ্কারের প্রবেশ পথ ঠিক সামনেই। একদম পায়ের গোড়ায়। অ্যান্টেনা মুড়ে সন্তর্পণে ট্রান্সমিটার ঝুলিয়ে রাখলেন কোমরে। দু'হাতে চেপে ধরলেন বন্দুক। এক পা এক পা করে এগিয়ে চললেন সামনে। ভিউসাইটের মধ্যে দিয়ে যারাই ওকে নজরে রাখুক না কেন, নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছে উনি এখন এগোচ্ছেন বাঙ্কারের দরজার দিকেই। দেখুক ওরা। আসছে সেই চরম মুহূর্ত—এস্‌পার কি ওসপার!

বিষম উত্তেজনায় ক্ষণেকের জন্যে দু'চোখ মুদলেন হেনড্রিক্স।

চোখ খুলেই পা দিলেন সিঁড়ির প্রথম-ধাপে।

সঙ্গে সঙ্গে উল্কাবেগে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল দুজন ডেভিড—একই রকম মুখ দুজনের—যেন ছাঁচে ঢালা—ভাবহীন, নির্বিকার, উদাসীন।

মুহূর্তের মধ্যে নির্ভুল লক্ষ্যে গুলিবর্ষণ করলেন হেনড্রিক্স। দুটো ডেভিডই শতচূর্ণ হয়ে মিলিয়ে গেল শূন্যে। পেছনে আবির্ভূত হল আরো কয়েকটা—একই ছাঁচে ঢালা হুবহু একরকম প্রত্যেকের মুখ। পিল পিল করে তেড়ে এল সিঁড়ি বেয়ে।

পেছন ফিরেই চোঁ-চাঁ দৌড় দিলেন হেনড্রিক্স—ছুটতে লাগলেন টিলার দিকে।

টিলার মাথায় বসে দমাদম গুলি চালিয়ে গেল ট্যাসো আর ক্লজ। ক্ষুদে থাবারা এর মধ্যেই ছুটেছে ওদের দিকে। ছাই উড়িয়ে চকচকে ঝকঝকে ধাতুর বরতুলগুলো আতংকের মত ছুটছে ওপর দিকে। যেন ক্ষেপে গিয়েছে বন্দুক নির্ঘোষে।

হেনড্রিক্সের মাথায় তখন ট্যাসো বা ক্রজের নিরাপত্তা নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। সময়ও নেই ভাববার। হাঁটু গেড়ে বসে বন্দুক উঁচিয়ে ধরলেন বাঙ্কারের প্রবেশপথ অভিমুখে এবং গালে বাঁট ঠেকিয়ে লক্ষ্যস্থির করলেন সিঁড়ির মাথায়। ডেভিডরা দলে দলে উঠে আসছে—প্রত্যেকের বুকের কাছে চেপে ধরা ন্যাকড়ার ভালুকছানা, ক্ষুদে ক্ষুদে পাগুলো যেন ঘুরন্ত পাখার মত প্রায় অদৃশ্য—সত্যিই অসম্ভব গতিবেগ!

লক্ষ্য স্থির করাই ছিল। এখন ঘোড়া টিপলেন হেনড্রিক্স। ঠিক মাঝখানে শ্বেত উত্তাপের ঝলকা বয়ে গেল—গুঁড়িয়ে পাউডার হয়ে গেল ডেভিডরা। ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল চাকা আর স্প্রিং। রেণু-রেণু দেহযন্ত্রের মাঝ দিয়েই ফের গুলিবর্ষণ করলেন হেনড্রিক্স উপর্যুপরি।

আচম্বিতে একটা বিরাট দেহ উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে। খর্বকায় ডেভিডদের মাথা ছাপিয়ে উঠছে তাল ঢ্যাঙা লোকটার মাথা। একটা পা নেই। হাতে খঞ্জযষ্টি। গায়ে ছেঁড়া পোশাক।

জখম সৈনিক!

পা টেনে টেনে ঠুক ঠুক করে এগিয়ে আসছে থার্ড ভ্যারাইটি রোবট জখম সোলজার। বিহ্বল চোখে দেখছেন হেনড্রিক্স। বন্দুকের ঘোড়া টিপতেও ভুলে গিয়েছেন। প্রথম ভ্যারাইটি ডেভিড—থার্ড ভ্যারাইটি এই ল্যাংচা সৈনিক। বাকী রইল কেবল সেকেণ্ড ভ্যারাইটিকে দেখা।

'মেজর!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠের চীৎকার এল পেছন থেকে। ট্যাসো দেখেছে হেনড্রিক্সের কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। তাই চেঁচিয়ে উঠেই নিজেই বন্দুক চালিয়ে গেল দমাদম শব্দে। চীৎকার আর গুলিবর্ষণের শব্দে ঘোর কেটে গেল হেনড্রিক্সের। দলে দলে ডেভিড বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতায় ছুটে আসছে তাঁর পানে—মাঝে টলমলে থার্ড ভ্যারাইটি—জখম সোলজার!

নিশানা স্থির করে ঘোড়া টিপলের মেজর। দড়াম করে ফেটে

উড়ে গেল জখম সোলজার—রিলে, পার্টস এবং টুকরোটাকরা ছিটকে গেল শূন্য পথে। কিন্তু অগুন্তি ডেভিড ছেয়ে ফেলেছে বাঙ্কারের সামনেকার সমতলভূমি। ক্ষণেকের জন্যেও বন্দুক চালনায় বিরাম দিলেন না মেজর। উপর্যুপরি গুলিবর্ষণ করতে করতে একটু একটু পেছিয়ে আসতে লাগলেন টিলার দিকে।

টিলার ওপর থেকে ক্রুজও গুলি চালাচ্ছে। টিলার গা-বেয়ে পিল পিল করে থাবারা উঠছে উপর দিকে। মেজর হেনড্রিক্স নিচু হয়ে দৌড়োচ্ছেন, দাঁড়িয়ে গুলি করছেন, ফের দৌড়োচ্ছেন; ট্যাসো ক্রুজের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে ডান দিকে।

মেজরের খুব কাছেই এসে গিয়েছে একটা ডেভিড। নির্বিকার মুখ। চোখের ওপর লুটাচ্ছে মাথার চুল। সহসা দু'হাত সামনে বাড়িয়ে দিল ডেভিডটা। বাহুবন্ধন থেকে মাটির ওপর নিক্ষিপ্ত হল ন্যাকড়ার ভালুকছানা। পড়েই তীরের মতো তেড়ে এল মেজর অভিমুখে। মেজরও দেরী করলেন না। চোখের পলকে গুলি করলেন একই সাথে ডেভিড আর ভালুকছানাকে লক্ষ্য করে। একই সাথে ভালুক-রোবট এবং ডেভিড-রোবট ছাতু হয়ে মিলিয়ে গেল শূন্যে যেন একটা স্বপ্ন কুয়াশা হয়ে বিলীন হল বাতাসের মধ্যে। নিজের চোখকেও কি অবিশ্বাস করা যায়? ঐটুকু একটা খেলনার ভালুকছানার মধ্যে এই বিস্ফোরক শক্তি?

'এদিকে আসুন!' ট্যাসোর গলা শোনা গেল পাশ থেকে। ভাঙা ইমারতের কংক্রীট চাঁইয়ের ওপর উঠে বসেছে ট্যাসো! ক্রুজের দেওয়া পিস্তল থেকে মুহুর্মুহু অগ্নিবর্ষণ করে চলছে অগুন্তি রোবট-রাক্ষসপানে। বলতে গেলে, ট্যাসোর গুলিবর্ষণের জন্যেই প্রাণ নিয়ে ফিরে এলেন মেজর।

বললেন হাঁপাতে হাঁপাতে—'ধন্যবাদ।' ট্যাসো জবাব দিল না। মেজরের হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে এনে ফেলল কংক্রীটের আড়ালে। পরক্ষণেই হাতড়াতে লাগল বেল্টে বাঁধা ব্যাগের মধ্যে!

বলল কঠিন কণ্ঠে—'চোখ বন্ধ করুন। বলেই বার করল একটা গোল বলের মত বস্তু। দ্রুত হাতে প্যাঁচ ঘুরিয়ে খুলে ফেলল একটা ছিপি—লাগিয়ে নিল বলেরই আরেক জায়গায়। আবার বলল তীব্র স্বরে—'চোখ বন্ধ করে মাথা নিচু করে বসে পড়ুন!'

বলার সঙ্গে সঙ্গে বোমা ছুঁড়ল ট্যাসো। শূন্য পথে অর্ধবৃত্ত রচনা করে ওস্তাদ হাতে নিক্ষিপ্ত বোমার মতই পৌঁছে গেল বাঙ্কারের প্রবেশ পথে—মাটিতে পড়েই লাফাতে লাফাতে গড়িয়ে গেল ডেভিড আর জখম সোলজারদের মাঝখানে। ইঁটের গাদার পাশে দাঁড়িয়ে অনাহিনেক সৈনিক জুল জুল করে চেয়েছিল ঠিকরে গড়িয়ে আসা বলটির পানে—বুঝতে পারছিল না বস্তুটি কি। একজন ক্রাচ ঠুকঠুক করে এগিয়ে এসে হেঁট হল কুড়িয়ে নেওয়ার জন্যে।

সেই মুহূর্তেই বিস্ফোরিত হল বোমাটা। বিপুল সংঘাতে দুলে উঠল মাটি, কংক্রীটের চাঁই, ছাইয়ের স্তূপ। প্রলয়কাণ্ড বুঝি একেই বলে। ছোট্ট একটি বর্তুলের মধ্যে এত প্রলয়ংকর শক্তি? ধাক্কার বেগ আর হাওয়ার ঝাপটায় পাকসাট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়লেন হেনড্রিক্স। গরম হলকা বয়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। কষ্টে চোখ মেলে দেখলেন আবছা একটা মূর্তি। ছাই আর ধোঁয়ার মধ্যে অনড় দেহে দাঁড়িয়ে টিপ করে গুলি করছে ট্যাসো—সাদা আগুনের মেঘ ভেদ করে যে-কটি রোবট এগিয়ে আসছে—উড়িয়ে দিচ্ছে মাঝপথেই।

টিলার ওপরে ফ্যাসাদে পড়েছে ক্লজ। চারদিক থেকে তাকে ঘেকে ধরেছে থাবার দল। মুহূর্তের জন্যেও না থেমে গুলি করছে থাবাবাহিনী লক্ষ্য করে এবং চক্রব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে যাবার সুযোগ খুঁজছে।

ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন হেনড্রিক্স। কিন্তু সিধে হয়ে দাঁড়াতে পারলেন না—আছাড় খাওয়ার ফলে পা মচকে গিয়েছে। একটা হাতও অবশ হয়ে গিয়েছে—নাড়ানো যাচ্ছে না। মাথাতেও চোট লেগেছে—রগদুটো যেন ফেটে যাচ্ছে, চোখ মেলে তাকাতেও পারছেন

না। শ্বেতঅগ্নির ফোঁসফোঁসানির দীপ্তি আর হলকার জন্যে চোখ খোলাও সম্ভব নয়। আগুন তো নয়—যেন দাবানল। আশ্চর্য সাদা আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে আর লাফ দিয়ে উঠছে আকাশপানে।

হ্যাঁচকা টান পড়ল বাহুতে। ট্যাসো টানছে হাত ধরে। বললে 'আসুন। এখানে আর নয়।'

'ক্লজ—ক্লজ কোথায়? ও যে এখনো টিলার ওপর।'

'বলছি চলে আসুন! কংক্রীট চাঁইয়ের আড়াল থেকে হিড়হিড় করে মুহ্যমান মেজরকে টেনে নিয়ে এল ট্যাসো একাই—পেছনে রইল উত্তরোত্তর ফুঁসে ওঠা বিস্ময়কর দাবানল। মাথা ঝাঁকিয়ে সহজ হবার চেষ্টা করলেন মেজর—কিন্তু ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। শুধু দেখলেন তুটুকরো অঙ্গারের মত আগুনের আভায় প্রদীপ্ত ট্যাসোর চোখজোড়া—কঠোর, নির্মম, নির্বিকার; তুচোখ সন্ধানী দূরবীনের মতই লক্ষ্য রেখেছে দাবানলের গ্রাস থেকে যেসব থাবা অক্ষত দেহে বেরিয়ে আসছে—ওদের ওপর।

তালতাল আগুন মেঘের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা ডেভিড। নির্ভুল নিশানায় তাকে চূর্ণবিচূর্ণ করল ট্যাসো। তারপর আর বেরোলো না। একটিমাত্র বোমা নিকেশ করছে রোবটদের বিরাট-বাহিনী

'ক্লজ···ক্লজকে ফেলে যাচ্ছো কেন? ওকে ডাকো?' হাত ছাড়িয়ে নিতে গেলেন হেনড্রিক্স।

কিন্তু ইস্পাত কঠিন কণ্ঠে টাসো শুধু বললে—'চলে আসুন। দাঁড়াবেন না।'

বাঙ্কার থেকে বেশ খানিকটা দূরে আসার পরেও দেখা গেল কয়েকটা থাবা আসছে পেছন পেছন। তারপর যেন হাল ছেড়ে দিয়ে রণে ভঙ্গ দিল তারা—ফিরে গেল ধোঁয়া আগুনের রাজ্যে।

হেনড্রিক্স আর হাঁটতে পারছিলেন না। ট্যাসো যেন তা বুঝেই থমকে দাঁড়াল।

বললে—একটু জিরিয়ে নিন। আমিও হাঁপিয়ে গেছি।'

ছাই আর জঞ্জালের গাদায় ধপ করে বসে পড়ে হেনড্রিক্স বললেন হাঁপাতে হাঁপাতে—'ক্রুজ···ক্রুজকে কেন ফেলে এলে?'

জবাব দিল না ট্যাসো। পিস্তল খুলে এক রাউণ্ড নতুন ব্লাস্ট-কার্টিজ ঢোকাল ভেতরে।

ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিলেন হেনড্রিক্স। এখনো ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেন নি উনি। বললেন জড়িত স্বরে—'ট্যাসো।'

এবারও জবাব দিল না ট্যাসো।

'ক্রুজকে তুমি ফেলে এসেছ ইচ্ছে করে। বিশেষ কারণে। ঠিক কিনা?'

খটাস করে পিস্তল বন্ধ করে সন্ধানী চোখে আশপাশ দেখে নিল ট্যাসো। চারপাশে জঞ্জাল। রাবিশ আর ছাইয়ের পাহাড়। মুখচ্ছবি নির্বিকার হলেও ওর চোখে যেন কিসের প্রত্যাশা। কিসের জন্য ওৎ পেতে রয়েছে ট্যাসো।

হেনড্রিক্স এবার রুক্ষকণ্ঠে শুধোলেন—'খুলে বলো আমাকে। ক্রুজকে তুমি ইচ্ছে করেই যমের মুখে ফেলে এলে কেন? কিসের ভয়ে?'

মুখ টিপে রইল ট্যাসো। শুধু শাণিত চোখজোড়া ঘুরতে লাগল ঝকঝকে ছুরীর ফলার মত। বিমূঢ় চোখে চেয়ে রইলেন মেজর। বুঝতে পারলেন না ট্যাসোর অদ্ভুত আচরণের রহস্য। কিসের প্রত্যাশায় বন্দুক বাগিয়ে এই ছাই, জঞ্জালের মধ্যে বসে আছে? মাঝে মাঝে ঝলসানো গাছের গুঁড়ি ছাড়া যেখানে কিছুই নেই—সেখানে ও কি দেখছে?

'ট্যাসো—'

'চুপ!' চাপা স্বরে হিসহিসিয়ে উঠেই পিস্তল তুলল ট্যাসো। চোখ খুললেন হেনড্রিক্সও এবং স্তম্ভিত হয়ে গেলেন চলমান মূর্তিটি দেখে।

ফেলে আসা পথ মাড়িয়ে আবির্ভূত হল যেন একটি প্রেতমূর্তি। স্খলিতচরণে হাঁটছে মাতালের মত। টলতে টলতে সটান এগিয়ে আসছে এদের পানেই। পোশাক ফালিফালি হয়ে ঝুলছে। যেন ফিতে উড়ছে সারা গায়ে। পা টেনে টেনে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসছে অতিকষ্টে, আসছে অতিশয় মন্থরগতিতে এবং অত্যন্ত সতর্ক চরণে। থমকে দাঁড়াচ্ছে মাঝে মাঝে, একটু দম নিচ্ছে, একটু শক্তি সঞ্চয় করছে, আবার পা ফেলছে হুঁশিয়ার মত্তপের মতন। একবার তো ধড়াস করে পড়েই গেল। উঠে দাঁড়াল অতিকষ্টে। ঝড়ে চলন্ত সুপুরি গাছের মত টলমল করে দুলতে লাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তারপর আবার পা বাড়াল সামনে।

ক্লজ আসছে।

ছিলেছেঁড়া ধনুকের মত তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন হেনড্রিক্স। 'ক্লজ! ক্লজ!' বলেই ধেয়ে গেলেন সামনে—'বেরোলে কি করে—?'

পেছন থেকে গুলিবর্ষণ করলো ট্যাসো। যেন একটা ধাক্কা খেয়ে পেছনে টলে পড়লেন হেনড্রিক্স, আবার গুলি নিক্ষিপ্ত হল ট্যাসোর পিস্তল থেকে। আবার তির্যক রেখায় ছুটে গেল শ্বেত-অগ্নির মারাত্মক রশ্মি; হেনড্রিক্সের গায়ের পাশ দিয়ে ছিটকে গিয়ে সেই রশ্মি উড়িয়ে দিল ক্লজের বক্ষদেশ। যেন একটা বোমা ফাটল।

বোমার মতই ফেটে উড়ে গেল বুকটা। গীয়ার, হুইল, রিলে, স্প্রিং শূন্যপথে উড়ে গেল অনেকদূর পর্যন্ত। তা সত্ত্বেও কিছুটা পথ টলতে টলতে এগিয়ে এল ক্লজ। তারপর আর পারল না। দাঁড়িয়ে গিয়ে দুলতে লাগল সামনে আর পেছনে। শেষকালে আছড়ে পড়ল ছাইগাদায়। আরো কয়েকটা চাকা গড়িয়ে গেল আশপাশে।

নৈঃশব্দ। দম আটকানো।

হেনড্রিক্সের পানে ফিরে তাকাল ট্যাসো—'এখন বুঝলেন রুডিকে কেন খুন করেছিল ক্লজ?'

খাবি খেতে খেতে ছাই-ছাওয়া মাটির ওপর বসে পড়লেন

হেনড্রিক্স। সারা শরীর শুধু নয়, মগজ পর্যন্ত তাঁর অসাড়, নিষ্ক্রিয়, কিছু ভাবতেও অপারগ। বাক্যস্ফূর্তি পর্যন্ত ঘটছে না।

ছুরীর মত ধারালো কণ্ঠে ফের বলল ট্যাসো—'নিজের চোখেই দেখলেন তো—আর সন্দেহ আছে?'

হেনড্রিক্স ঢোক গিললেন। কথা বলতে পারলেন না। কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে আপনা হতেই। দৃষ্টিশক্তিও যেন ঝাপসা হয়ে আসছে আস্তে আস্তে। অন্ধকার নামছে চোখের সামনে।

চোখ মুদে রইলেন মেজর হেনড্রিক্স। তারপর আর কিছু মনে নেই।

অনেকক্ষণ পরে চোখ খুললেন। সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা। ওঠবার চেষ্টা করলেন—কিন্তু যেন হাজারটা ছুঁচ প্যাঁট করে একসাথে বিঁধে গেল হাতে, পায়ে, ঘাড়ে। যন্ত্রণায় সশব্দে শ্বাস নিলেন—তবুও চেঁচাতে পারলেন না।

'মেজর', তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাক দিল ট্যাসো।

আহ্বানটা সুতীক্ষ্ণ ভল্লের মত বিঁধল মগজের অসাড় চেতনায়। ঘোর কেটে গেল মেজরের।

অস্পষ্ট জড়িত কণ্ঠে শুধু বললেন 'ক্লজই তাহলে সেকেণ্ড ভ্যারাইটি?'

'আগাগোড়া সেই সন্দেহই করেছিলাম।'

'তাই যদি করেছিলে তো আগে গুলি করো নি কেন?'

'আপনার জন্যে। আপনিই আমাকে আটকে রেখেছিলেন।'

মেজর নির্বাক। দেখলেন ট্যাসো কাজের মেয়ে। তিনি যতক্ষণ জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়েছিলেন, ততক্ষণে সে আগুন জ্বেলেছে এবং মেট্যাল কাপে গরম জল বসিয়েছে।

মেজরের দৃষ্টি অনুসরণ করে ট্যাসো বললে—'কফি করছি। এক্ষুনি হয়ে যাবে। খেলেই চাঙা হয়ে উঠবেন।'

বলে, এসে বসল মেজরের পাশে। কোমরের পিস্তল হাতে নিয়ে

ভাজ খুলে দেখতে লাগল ভেতরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কলকব্জা। তন্ময় হয়ে দেখবার পর শুধু একটা কথাই বলল—'বিউটিফুল।'

'কে?'

'এই পিস্তলটা।'

'কেন?'

'অদ্ভুত কলকব্জা। নির্মাণকৌশল দেখবার মত।'

'থাবাদের কি খবর?'

'বোমার সংঘাতে সব বিকল হয়ে গিয়েছে। সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি দিয়ে তৈরী ওরা—সাংঘাতিক ধাক্কা সইতে পারে না। তবে হ্যাঁ, দল বেঁধে থাকতে পারে বটে।'

'ডেভিডরা?'

'ওরাও পারে।'

'এ বোমা তুমি পেলে কোথায়? এমন বোমা তো কখনো দেখিনি।'

'বানিয়েছি। আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রগতি সম্পর্কে কোনো উন্নাসিকতা রাখবেন না। জানেন তো শত্রুকে কখনো খাটো চোখে দেখতে নেই। এ বোমা কাছে না থাকলে আপনারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন দুদিনেই।'

'সত্যিই সাংঘাতিক বোমা।'

আগুনের সামনে দু'পা ছড়িয়ে আরাম করে বসল ট্যাসো। বলল আগুনের ওপর চোখ রেখে—'অবাক হয়েছি আপনার নির্বুদ্ধিতা দেখে। রুডিকে ক্লজ যখনি মারল, আপনার বোঝা উচিত ছিল '

'আমি ভেবেছিলাম ভয় পেয়েছে ক্লজ—তাই।'

ট্যাসো মুচকি হেসে বললে—'মেজর, সেই কারণেই তো আপনাকেও আমার সন্দেহ হয়েছিল। ক্লজকে আগলে রেখে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনছিলেন। আমি তখনি চেয়েছিলাম ওকে শেষ করতে—আপনি বাধা দিয়েছিলেন। কেন?'

'আর খুনোখুনি চাইনি বলে। যাকগে সে কথা, এখানে থাকাটা কি নিরাপদ ?'

'কিছুক্ষণের জন্যে বলতে পারেন। তারপর ওরা অন্য জায়গা থেকে নতুন রোবট আনাবে, দলে ভারী হবে—ফের তেড়ে আসবে,' বলতে বলতে পিস্তলটা ফের খুলল ট্যাসো। ন্যাকড়া দিয়ে ভেতরটা সাফ করে খট্ করে মুড়ে গুঁজে রাখল কোমরে।

আপন মনেই বললেন হেনড্রিক্স—'কপাল ভাল বেঁচে গেলাম।'

'তা আর বলতে।'

'ধন্যবাদ আমাকে টেনে আনার জন্যে।'

জবাব দিল না ট্যাসো। শুধু চোখ তুলে তাকালো—সে চোখে জ্বলছে আগুনের প্রতিবিম্ব। হাত নেড়ে দেখলেন, আঙুল নাড়ানো যাচ্ছে না। দু'পাশ একেবারে অসাড় হয়ে গিয়েছে। শরীরের ভেতরেও ছড়িয়ে পড়েছে অসীম অবসাদ আর অসহায়তা, মগজের প্রতিটি কোষ যেন প্যারালাইজড— পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

হেনড্রিক্সের অবস্থা ট্যাসো লক্ষ্য করছিল জ্বল-জ্বলন্ত চোখে। এখন শুধোলো—'কি রকম বোধ করছেন ?'

'হাত ভেঙে গেছে মনে হচ্ছে।'

'আর কিছু ?'

'মাথার ভেতরে আর শরীরের ভেতরে জখম হয়েছে। ভেতর পর্যন্ত অসাড় লাগছে।'

'আগেই বলেছিলাম বসে পড়তে। বোমা ফাটবার মুহূর্তে যদি মাথা নিচু করে বসে পড়তেন, জখম হতেন না।'

কথা বললেন না হেনড্রিক্স। দেখলেন ট্যাসোর কাজকর্ম—অভ্যস্ত ক্ষিপ্রতায় চ্যাটালো ডেকচিতে কফি ঢালাঢালি করে এগিয়ে দিল তাঁর পানে।

চুমুক দিলেন মেজর কিন্তু গলার কাছে একটা পুঁটলি ঠেলে উঠল। গিলতে গেলেন, মনে হল ভেতরটা যেন উল্টে বাইরে আসতে

চাইছে। যন্ত্রণায় চোখে জল এসে গেল মেজরের। ডেকচিতে সরিয়ে রেখে বললেন—'আর খেতে পারছি না।'

ট্যাসো একাই খেয়ে নিল সবটুকু। নিঃশব্দে বয়ে চলল সময়। ছাই-মেঘ ধূলি-মেঘের মত পাক খেতে খেতে যেন নীরব অট্টহাসে গগন বিদীর্ণ করে দৌড় প্রতিযোগিতায় মত্ত হয়েছে মাথার ওপর। নিচের ধূসর শ্মশান-পৃথিবীর একমাত্র দর্শক এখন ওরাই। আর কেউ নেই··· কেউ নেই···কেউ নেই!

চোখ জ্বালা করে উঠল মেজরের। ক্ষণপরে খেয়াল হল, ট্যাসো ঝুঁকে রয়েছে ওঁর দেহের ওপর। নির্নিমেষে চেয়ে রয়েছে তাঁর পানে।

'কি হল ট্যাসো?'

'এখন কি রকম বুঝছেন? ভালো?'

'একটু।'

'জোর করে টেনে না আনলে আপনার হাল হত রুডির চাইতেও সাংঘাতিক। ডেভিডরাই মাংসর ফিতে বানাতো আপনার দেহ থেকে।'

'জানি।'

'কেন ওদের খপ্পর থেকে টেনে আনলাম জানেন? জানতে ইচ্ছে যায় না?'

নীরব রইলেন হেনড্রিক্স।

ট্যাসো নিমেষহীন চোখে চেয়ে থেকে বললে—'ইচ্ছে করলে আপনাকে ওদের মধ্যেই ফেলে আসতে পারতাম।'

'কেন নিয়ে এলে?'

'এখান থেকে পালাতে চাই বলে।' কাঠি দিয়ে আগুন খোঁচাতে খোঁচাতে প্রশান্ত কণ্ঠে বললে ট্যাসো—'মানুষ আর এখানে থাকতে পারবে না। পালাতে আমাদের হবেই। আপনি যতক্ষণ অজ্ঞান ছিলেন, এইসব কথাই ভাবছিলাম! ওরা যতক্ষণ দলবল জুটিয়ে না আসছে, ততক্ষণ আমরা নিরাপদ। তারপর আমাদের মরতে হবেই। তার মানে, বড়জোর আর তিনটে ঘণ্টা আছে হাতে।'

'অর্থাৎ, তুমি চাইছো পালাবার পথ আমিই বাংলাবো ?'

'হ্যাঁ। আমাকে নিয়ে পালাবেন—ওরা এসে পড়ার আগেই নাগালের বাইরে চলে যাবেন।'

'নাগালের বাইরে ?'

'হ্যাঁ।'

'সেজন্যে আমাকে কেন ? আমি কি করব ?'

'আপনি যা করতে পারেন, আমি তা করতে পারি না।' আগুনের শিখা জোড়া মশালের মত দাউদাউ করে জ্বলছে ট্যাসোর কৃষ্ণকালো চোখে। 'মেজর, ঠিক তিন ঘণ্টার মধ্যে যদি এদের নাগালের বাইরে না যেতে পারেন, ওরাই শেষ করে দেবে আপনাকে। এ ছাড়া আর পথ নেই। হয় মৃত্যু—নয় পলায়ন। সারারাত বেহুঁশ হয়ে শুয়েছিলেন আপনি—আমি কিন্তু আগুন জ্বালিয়ে বসেছিলাম—পাহারা দিয়েছি কেউ যাতে আপনার কেশাগ্রও না স্পর্শ করতে পারে। রাত ফুরিয়েছে, ভোর হতে চলল। বলুন কি করবেন।'

'আমি···আমি কি করব ?'

'কি করবেন ?'

'তোমার মাথায় এমন ধারণা এল কি করে ?'

'কিসের ধারণা ?'

'যে আমি তোমাকে এদের নাগালের বাইরে নিয়ে যেতে পারব ?'

'খুব অবাক হচ্ছেন, তাই না ?'

'শুধু অবাক না, অদ্ভুত লাগছে।'

'মেজর, বাজে কথায় সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আমি চাই আপনি আমাকেও চাঁদের ঘাঁটিতে নিয়ে চলুন।'

'মুন বেসে ?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু কিভাবে ?'

'উপায় নিশ্চয় একটা আছে।'

'না, নেই। একদম নেই। থাকলে আমি অন্ততঃ জানতাম।'

ট্যাসো আর কথা বলল না। কিন্তু ক্ষণেকের জন্যে চঞ্চল হল নিমেষহীন চক্ষু। হঠাৎ অন্যদিকে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে—'কফি আর চাই নাকি ?'

'না।'

ট্যাসো নিজেই আর এক কাপ কফি বানিয়ে চুমুক দিতে লাগল ধীরে ধীরে। হেনড্রিক্স সেদিকে তাকালেন না। চিৎ হয়ে শুয়ে চেয়ে রইলেন পাণ্ডুর আকাশপানে। মন এখনো কাজ করছে না। অবশ। দপ দপ করছে করোটির ভেতরে। চোটটা বড় রকমের নিশ্চয়। ক্রমশঃ ঝিমুনি আসছে—মরণ ঝিমুনি কিনা কে জানে।

আচম্বিতে বিদ্যুৎ ঝলকের মত একটা স্মৃতি অসাড় চেতনাকে যেন চাবুক মেরে মিলিয়ে গেল।

আতীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন মেজর—'আছে! আছে! পথ আছে!'

নিমেষে পাশে এসে দাঁড়াল ট্যাসো—'তাই নাকি ?'

'ভোর হতে আর কত দেরী ?'

'ঘণ্টা দুয়েক। সূর্য উঠবে এখুনি।'

'ধারে কাছেই একটা স্পেশশিপ থাকার কথা। নিজে কখনো দেখিনি। তবে শুনেছি আছে!'

'কি রকম স্পেশশিপ ?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ট্যাসোর।

'রকেট জাহাজ।'

'পৃথিবীর বাইরে যেতে পারবে ? চাঁদের ঘাঁটিতে ?'

'সেইভাবেই তৈরী করা জাহাজ। হঠাৎ দরকার পড়লে যাতে কাজে লাগে।' বলে, ফের রগ দুটো টিপে ধরলেন হেনড্রিক্স!

'কি হল ?'

'বড্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। মাথার ভেতরে নিশ্চয় কিছু হয়েছে। কিচ্ছু ভাবতে পারছি না। একমনে চিন্তা করতে পারছি না। বোমার ধাক্কায়—'

'ধারে কাছেই আছে বললেন ? কত কাছে ! কোথায় ?'

'সেইটাই ভাবতে চেষ্টা করছি।'

ট্যাসোর সরু কিন্তু শক্ত আঙুলগুলো লোহার শিকের মত চেপে বসল হেনড্রিক্সের ব্যথা-টনটনে ঘাড়ের পেশীতে—'খুব কাছে কি ?' ট্যাসোর কণ্ঠস্বরও লোহার মত কঠিন—'ঠিক কোনখানে ? মাটির তলায় কি ? পাতাল ঘরে লুকোনো আছে ?'

'হ্যাঁ···হ্যাঁ···আণ্ডারগ্রাউণ্ড স্টোরেজ লকারে আছে।'

'পাবো কি করে ? বিশেষ কোনো মার্কা দেওয়া আছে কি ? কোনো সাংকেতিক চিহ্ন ? কোড মার্ক ?'

বিচ্ছিন্ন চিন্তারাশিকে একাগ্র করার শেষ চেষ্টা করলেন হেনড্রিক্স—'না। কোনো কোড মার্ক নেই। কোড সিম্বল নেই।'

'তাহলে কি আছে ?'

'একটা চিহ্ন।'

'কি চিহ্ন ?'

উত্তর দিলেন না হেনড্রিক্স। টলায়মান অগ্নিশিখায় ঝকমক করতে লাগল তাঁর সহসা উত্তেজিত চক্ষু। যেন জোড়া মালসা। ট্যাসোর আঙুল কিন্তু আরো জোরে চেপে বসেছে তাঁর কাঁধের মাংসপেশীতে।

'বলুন কি চিহ্ন ? কি ধরনের চিহ্ন ?'

'মনে পড়ছে না···একটু জিরোতে দাও···ভাবতে দাও।'

'ভাবুন।' হাত সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ট্যাসো। চিৎপাত হয়ে শুয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে আকাশপানে তাকিয়ে রইলেন হেনড্রিক্স। পায়ে পায়ে দূরে সরে গেল ট্যাসো। দু'হাত প্যান্টের পকেটে পুরে কিছু দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েই সজোরে লাথি মারল একটা আলগা পাথরকে। তারপর চঞ্চল দুটি আঁখি আকাশপানে মেলে দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মতন। রাত্রির অমানিশা ক্রমশঃ তরল হয়ে আসছে উষার আবির্ভাবে। আঁধার পালাচ্ছে আলোর তাড়ায়।

পিস্তলটা আঁকড়ে ধরে আগুনকে চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করতে শুরু

করল ট্যাসো। মাটির ওপর নিস্পন্দ দেহে শুয়ে রইলেন মেজর হেনড্রিক্স। মুদিত চোখের পাতাতেও নেই কোনো স্পন্দন। আকাশের ধূসর-রাঙা পূব থেকে ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ছে পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে। স্পষ্ট হয়ে উঠছে ভূদৃশ্য। স্তূপীকৃত ছাই এবং ইমারতচূর্ণ ছাড়া দিগন্ত পর্যন্ত আর কিছুই চোখে পড়ছে না। কোথাও দাঁড়িয়ে একটা নিঃসঙ্গ পোড়া গুঁড়ি—যেন একঠেঙে প্রেত। কোথাও সৌধ-কঙ্কাল—পড়ো পড়ো খান কয়েক দেওয়াল। কোথাও অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ। সব কিছুর ওপর আকাশ থেকে থেকে ঝরে পড়া ছাইয়ের পুরু প্রলেপ।

ছাই, ছাই, ছাই—শুধুই ছাই। এ পৃথিবীটা শুধু মহাশ্মশান নয়—একটা বিরাট চিতাও বটে। নিভে যাওয়া চিতা।

কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যে দিয়ে একটা পাখীর কর্কশ ডাক ভেসে এল।

চঞ্চল হল হেনড্রিক্সের দেহ। দু'চোখ খুলে অস্ফুট কণ্ঠে শুধোলেন—'ট্যাসো, ভোর হল?'

'হ্যাঁ।'

সামান্য উঠে বসে বললেন মেজর—'কি যেন জানতে চাইছিলে?'

'একটা চিহ্ন। মনে পড়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'কি চিহ্ন?' চক্ষের পলকে কঠিন হয়ে উঠল ট্যাসোর সর্ব অবয়ব। 'বলুন কি চিহ্ন?' চোখে যেন অসির ঝিলিক—কণ্ঠে ধাতব ঝনঝনানি।

'একটা পাতকুয়ো। ভাঙা ইঁদারা। স্টোরেজ লকার লুকোনো আছে এই ইঁদারার তলায়। রকেট জাহাজ রয়েছে সেইখানে।'

'কুয়ো!' অন্তর্হিত হল উৎকণ্ঠা ট্যাসোর চোখ-মুখ থেকে। 'কুয়ো খুঁজে বার করা খুব কঠিন হবে না।' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে—'এখনো একটা ঘণ্টা সময় হাতে আছে, মেজর। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে এ যাত্রা বেঁচে গেলাম দু'জনেই।'

হেনড্রিক্স বললেন—'ট্যাসো, আমাকে টেনে তোলো।'

পিস্তল খাপে রেখে হাত বাড়িয়ে দিল ট্যাসো। টেনে দাঁড় করালো হেনড্রিক্সকে বলল—'কিন্তু এভাবে তো বেশীদূর যেতে পারবেন না।'

যন্ত্রণায় ঠোঁট কামড়ে ধরে হেনড্রিক্স বললেন—'বেশীদূর যেতেও হবে না।'

পাশাপাশি হেঁটে চলল দুজনে। ভোরের নরম রোদ এসে পড়ল মাথায়, মুখে, বুকে। উষ্ণ পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে যেন স্বয়ং তপনদেব। পায়ের তলায় জমি সম্পূর্ণ বন্ধ্যা। এতটুকু ঘাসের চিহ্ন নেই। সবুজ পৃথিবীকে আর সবুজ বলা চলে না কোন মতেই। মানুষ তাকে ধূসর বানিয়েছে। দূর থেকে কয়েকটা পাখী উড়ে গেলে নিঃশব্দে। চক্রাকারে উড়তে লাগল ওদের মাথার ওপর।

হেনড্রিক্স শুধোলেন যাতনা-বিকৃত কণ্ঠে—'থাবাদের চোখে পড়ল?'

'না। এখনো না।'

সামনেই একটা কংক্রীটের ধ্বংসাবশেষ। কংক্রীট বিল্ডিং এখন পরিণত হয়েছে কংক্রীট পর্বতে। টলায়মান দেওয়ালগুলোর পাশ দিয়ে পা বাড়াল দুজনে। সড়সড় করে পালিয়ে গেল কয়েকটা হাতখানেক লম্বা প্রকাণ্ড ইঁদুর। সচমকে লাফ দিল ট্যাসো।

হেনড্রিক্স বললেন—'জানো ট্যাসো, এককালে এখানে একটা শহর ছিল। গাঁয়ের শহর বলতে পারো। আঙুর উৎপাদনের বড় কেন্দ্র ছিল।'

কংক্রীট পাহাড় শেষ হয়েছে। সামনেই প্রসারিত একটা রাস্তা। মানে রাস্তার শব! বোমার আঘাতে ফুটিফাটা এবং সহস্র বিবরে ঝাঁঝরা। ফাটা পাথর আর গর্তের ফাঁক দিয়ে কতকগুলো নীরস ধূসর কাঁটাগাছ উঁকি মারছে! ডানদিকে মাথা ভাঙা একটা পাথরের চিমনী।

'হুঁশিয়ার।' বললেন হেনড্রিক্স।

সামনেই মুখ ব্যাদান করে রয়েছে একটা বিশাল গহ্বর। পাতাল কুঠরি ভেঙে উড়ে গিয়েছে বিস্ফোরকের বিস্ফোরণে। গর্তের কিনারা বরাবর লক্ষ বল্লমের মত মাথা উঁচিয়ে রয়েছে সূচীমুখ পাইপ, ভাঙা ইস্পাতের পাত, দোমড়ানো ধাতুর চাদর। গর্ত পাশে রেখে দুজনে পেরিয়ে এল একটা ইমারতচূর্ণ। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চামচ আর চীনে ডিস। ভাঙা চেয়ার। রাস্তার ঠিক মাঝখানে জমি বসে গিয়েছে। দেবে যাওয়া জায়গাটা ভরাট হয়ে উঠেছে কাঁটাঝোপ, রাবিশ আর হাড়ে।

আঙুল তুলে বললেন হেনড্রিক্স—'ঐখানে।'

'এই দিক দিয়েই যাবো তো?'

'ডান দিক দিয়ে।'

একটা হেভী ডিউটি ট্যাঙ্ক তালগোল পাকানো খেলনার ট্যাঙ্কের মত উল্টে পড়েছিল পাশেই। ওরা পাশ কাটিয়ে এল মরচে ধরা লৌহদানবকে। যেভাবে দুমড়ে গলে গিয়েছে ট্যাঙ্কটি, বেশ বোঝা যাচ্ছে বিকিরণ কার্টিজ প্রয়োগ করা হয়েছে তার ওপর। মামুলী বিস্ফোরকের ক্ষমতা নেই অমন মজবুত লোহার টিলাকে এভাবে তালগোল পাকানোর। কয়েক ফুট দূরেই ট্যাঙ্কের সামনের দিকে মুখ হাঁ করে শুয়ে একটা মমী দেহ। রাস্তা ফুরিয়েছে। শুরু হয়েছে ফাঁকা মাঠ। সেখানে শুধু পাথর, কাঁটাঝোপ আর কাঁচের টুকরো।

'ঐখানে' বললেন হেনড্রিক্স।

একটা ভাঙা ইঁদারা রয়েছে সামনে। ওপরে পাতলা তক্তা দিয়ে ঢাকা। ইঁদারার আশপাশ ভেঙে পড়েছে বিস্ফোরণের সংঘাতে। গুঁড়িয়ে রাবিশ হয়ে গিয়েছে। অসংযত চরণে সেইদিকেই এগোলেন হেনড্রিক্স। ট্যাসো রইল পাশে। স্থির দৃষ্টিতে হতশ্রী পাতকুয়োর দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাসের সুরে বললে ট্যাসো—'আপনি ঠিক জানেন তো? চিনতে ভুল হয় নি? রকেট জাহাজ লুকিয়ে রাখার মত জায়গা কি এরকম হয়?'

কুয়োর পাড়ে ধপ করে বসে পড়লেন হেনড্রিক্স। এইটুকু পথ হেঁটে এসেই ঘামছেন দরদর করে। নিঃশ্বেস যেন আটকে আসছে। ফুসফুস ফেটে যাচ্ছে। কলজেটার মধ্যে বুঝি দমদম শব্দের দুরমুশ পেটাই চলছে। দাঁতে দাঁত চেপে বসেছে অসহ্য কষ্টে।

তাই একটু দম নেওয়ার পর বললেন—'না, আমি ভুল করিনি। সিনিয়র কম্যাণ্ড অফিসার চরম সঙ্কটে যাতে পালিয়ে যেতে পারে, সেইভাবেই তৈরী হয়েছিল এই ইঁদারা। বাঙ্কার কোনো কারণে ভেঙে পড়লে তলায় লুকোনো রকেট জাহাজ চেপে রওনা হয়ে যাবে মূল বেসের দিকে। তাই কাকপক্ষীও জানে না এই ইঁদারার ঠিকানা।'

'সিনিয়র কম্যাণ্ড অফিসার মানে তো আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'জাহাজটা কোথায়? তলায়?'

'জাহাজের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছো।'

জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে রইল ট্যাসো। কাজল কালো সুগভীর চাহনিতে শুধু প্রোজ্জ্বল হল দুটি স্ফুলিঙ্গ।

হেনড্রিক্স সস্নেহে হাত বুলোলেন কুয়োর পাথরে।

বললেন—'এ জাহাজ আমার। আমার জন্যেই রাখা হয়েছে। চরম বিপদে বাঁচবার জন্যে। আই-লক আমার ছোঁয়া ছাড়া খুলবে না।'

কথা শেষ হওয়ার আগে থেকেই একটা ধাতব ঝনৎকার শোনা যাচ্ছিল পায়ের তলায়। কথা শেষ হতেই ক্লিক করে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ হল। গুমগুম শব্দটা আমরা প্রকট হয়ে উঠল ভূগর্ভে।

উঠে দাঁড়ালেন হেনড্রিক্স। ট্যাসোকে বললেন—'সরে এসো।' বলে, নিজেও সরে এলেন কুয়ো থেকে তফাতে।

জমির খানিকটা অংশ যেন হড়কে সড়ে গেল পাশে—অন্তর্হিত হল জমির মধ্যেই। ছাই আর রাবিশ আর কংক্রীট চাঁই গড়িয়ে গেল

চার পাশে—গহ্বর থেকে ধীরে ধীরে উঠে এল একটা ধাতুর ফ্রেম। ফ্রেমে আটকানো একটা রকেট জাহাজ। পুরোপুরি উঠে আসবার পরেই স্তব্ধ হল উর্ধ্বগতি—থেমে গেল শব্দ।

আকাশ পানে ঝিকিমিকি নাক তুলে সদম্ভে দাঁড়িয়ে রইল রকেট জাহাজ মুনবেস যার একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র গন্তব্য স্থান।

জাহাজটা ছোট্ট। কিন্তু পরিপাটিভাবে গড়া। নিখুঁত সুন্দর। ইস্পাতের ফ্রেমে গাঁথা যেন একটা চকচকে ছুঁচ। তখনও ফ্রেম আর জাহাজের গা থেকে ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে ছাই—মিলিয়ে যাচ্ছে পাতাল গহ্বরে। হেনড্রিক্স পা টেনে টেনে লৌহ কাঠামো মাড়িয়ে পৌঁছোলেন স্পেশশিপের পাশে। হ্যাচের স্ক্রু পেঁচিয়ে খুলে কব্জার ওপর ঘুরিয়ে দিলেন পাল্লাটা। ভেতরে দেখা গেল কণ্ট্রোল ব্যাঙ্ক আর প্রেসার সিট। ট্যাসো এসে দাঁড়াল পেছনে। কলকব্জার দিকে চেয়ে রইল অপলকে। বললে নিজের মনে—'কিন্তু আমি তো রকেট চালাতে জানি না।'

হেনড্রিক্স বললে—'চালাব আমি।'

'আপনি? কিন্তু সিট তো একটাই। এ-জাহাজ তৈরীই হয়েছে শুধু একজনের জন্যে।'

সঘন নিঃশ্বাসে ভেতরে দৃষ্টিপাত করলেন হেনড্রিক্স। ট্যাসো ঠিক বলেছে। এ জাহাজ নির্মিত হয়েছে শুধু একজনকেই উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

'এবং সেই একজনটি তুমি?' যেন হাওয়ার সুরে বললেন হেনড্রিক্স। নীরবে ঘাড় কাৎ করে সায় দিল ট্যাসো।

'কিন্তু কেন?'

'কারণ আপনি যেতে অক্ষম বলে। যাত্রা পথেই আপনি মারা যেতে পারেন বলে! আপনি আহত বলে। মুনবেস পর্যন্ত পৌঁছোতে পারবেন না বলে' এক নিঃশ্বাসে যেন যাত্রার ডায়ালগ আউড়ে গেল ট্যাসো।

'ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট। কিন্তু ট্যাসো, মুনবেস ঠিক কোনখানে, তা আমিই শুধু জানি, তুমি জানো না। মাসের পর মাস চাঁদে টহল দিলেও তুমি খুঁজে পাবে না পাতাল-ঘাঁটির গোপন প্রবেশ পথ। চাঁদের ওপরে কিছু নেই—সব ভেতরে। দরজার চাবি কাঠি কেবল আমার কাছে।'

'তাহলেও চেষ্টা করব। করব আপনার স্বার্থেই। আপনিই আমাকে বলে দেবেন কোথায় গেলে কিভাবে পৌঁছোনো যাবে মুনবেসে। মনে রাখবেন, আপনার জীবন নির্ভর করছে তার ওপর।'

'কিভাবে ?'

'সময়মত যদি পৌঁছোতে পারি চাঁদের ঘাঁটিতে, হয়ত সেখান থেকে আরেকটা জাহাজ নিয়ে ফিরে আসতে পারি আপনাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। যদি সময়মত পৌঁছতে পারি···বুঝলেন ? যদি খুঁজে বার করতে পারি আপনার প্রাণের প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগেই—আপনাকে আমি উদ্ধার করে নিয়ে যাবোই। জাহাজে খাবার-দাবার যা আছে, তাতে আমার চাঁদ পর্যন্ত চলে যাবে নিশ্চয়—'

ঝটিতি এগিয়ে গেলেন হেনড্রিক্স। কিন্তু জখম হাতের জন্যে সুবিধে করতে পারলেন না। হাতে জোর নেই বলেই ট্যাসোকে ঘায়েল করতে পারলেন না। তার আগেই টুপ করে বসে পড়ে সুট করে সরে গেল ট্যাসো এবং চক্ষের পলকে কোমরের রিভলবার খসিয়ে এনে কুঁদো দিয়ে ঘা মারল হেনড্রিক্সের কানের পেছনকার হাড়ে। হেনড্রিক্স চোখ দিয়ে দেখলেন পিস্তলের কুঁদো নেমে আসছে—কিন্তু হাত দিয়ে আটকাতে পারলেন না—পা নেড়ে সরে যেতে পারলেন না। প্রচণ্ড সংঘাতে শুধু রাশি রাশি হলুদ ফুল দেখলেন চোখের সামনে। আতীব্র যন্ত্রণায় চকিতে শিথিল হয়ে এল সর্ব অঙ্গ। অন্ধকারের মেঘ লাফ দিয়ে উঠল চোখের সামনে। ধীরে ধীরে বসে পড়লেন স্পোশশিপের গা ধরে এবং শুয়ে পড়লেন ফ্রেমের ওপর।

যেন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দেখলেন, ট্যাসো তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। বুটের ডগা দিয়ে পাঁজরে লাথি মারছে।

'মেজর! উঠে পড়ুন!'

গুঙিয়ে উঠে চোখের পাতা পুরোপুরি খুললেন হেনড্রিক্স।

পিস্তলটা তাঁর মুখের সন্নিকটে ধরে চাপা গলায় বললে ট্যাসো— 'সময় খুব কম। জাহাজ রেডি। বলুন ঠিক কোন খানে গেলে পাব মুন বেসে ঢোকার দরজা। ঝটপট বলুন, বেরোতে হবে, এক্ষুনি।'

মাথা ঝাঁকালেন হেনড্রিক্স—'ঝাঁকিয়ে যেন মগজের ঝিমুনি ঝরিয়ে দিতে চাইলেন।

'তাড়াতাড়ি! মুন বেস কোথায়? কিভাবে পাব? আপনি গেলে কি করতেন?

একটা কথাও বললেন না হেনড্রিক্স।

'জবাব দিন!'

'না।'

'মেজর, জাহাজে যা খাবার আছে দেখে এলাম হপ্তা কয়েক চলে যাবে। মুন বেস শেষ পর্যন্ত বার করবই করব। কিন্তু আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই আপনি মারা যাবেন। বেঁচে যাওয়ার সুযোগ শুধু একটাই—' বলতে বলতে থেমে গেল ট্যাসো।

ছাই জমা ঢালে কি যেন নড়ে উঠল। কংক্রীট আর রাবিশের আড়ালে কি যেন দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। চকিতে ঘুরে দাঁড়াল ট্যাসো। টিপ করল পিস্তল তুলে, ঘোড়া টিপল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। এক ঝলক আগুন সরল রেখায় সাঁ করে ছুটে গেল অদৃশ্য বস্তুটির দিকে। ছাইয়ের ওপর দিয়ে খড়মড় শব্দে কি যেন গড়িয়ে গেল, ছিটকে গেল। আবার ফায়ার করল ট্যাসো। এবার আর গুলি ফসকালো না। টুকরো টুকরো হয়ে গেল থাবাটা—চাকা আর স্প্রিং ছিটকে গেল শূন্যে।

'দেখলেন তো? স্কাউট এসে গেছে—আর বেশী দেরী নেই।'

'মুন বেসে গিয়ে ওদের নিয়ে ফিরে আসবে আমাকে তুলতে?'

'আসব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

হেনড্রিক্স পলকহীন চোখে চাইলেন ট্যাসোর মুখপানে। যেন হৃদয়ের অন্তস্থল পর্যন্ত দেখতে চাইলেন। বললেন মৃদু কণ্ঠে—'ফিরে আসবে তো?'

'বলছি তো।'

'সত্যি বলছো?'

'বলছি,' বলছি বলছি।'

'ফিরে এসে আমাকে নিয়ে যাবে মুন বেসে?' শরীরের সমস্ত রক্ত বুঝি জমা হয়েছে হেনড্রিক্সের মুখে। উত্তপ্ত মুখে আর চোখে নিদারুণ জ্বালা।

'বলছি নিয়ে যাবো! কিন্তু কোথায় গেলে কিভাবে খুঁজলে পাব মুন বেসে প্রবেশ পথ, সেটা বলবেন তো। আর সময় নেই মেজর! ওরা এসে গেল বলে! জলদি বলুন!'

কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসলেন হেনড্রিক্স। এক টুকরো পাথর তুলে নিয়ে বললেন—'এঁকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

চাঁদের নক্সা আঁকলেন মেজর ছাইয়ের স্তরে। পাশে হেঁট হয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষুধিত চোখে চেয়ে রইল ট্যাসো।

'এই হল আপেনাইন রেঞ্জ। ক্রেটার অফ আর্কিমিডিস রয়েছে এখানে। আপেনাইনের শেষ যেখানে, সেখান থেকে আরো দু'শ মাইল গেলে পাবে মুন বেস। ঠিক কোনখানে বলতে পারব না। কিন্তু চাঁদের ওপর গিয়ে আপেনাইনের ওপর উড়তে উড়তে লাল আর সবুজ আলোর সিগন্যাল দিলেই ওরা মাটির তলা থেকে তোমাকে দেখতে পাবে। সিগন্যাল রেকর্ড করবে। ম্যাগনেটিক আঁকশি দিয়ে ওরাই তোমাকে পাতালে টেনে নিয়ে যাবে।'

'সিগন্যালটা কি?'

'প্রথমে একবার লাল, তারপর একবার সবুজ। একটু থেমে খুব তাড়াতাড়ি দু'বার লাল।'

'কণ্ট্রোল? আমি অপারেট করতে পারবো?'

'অটোমেটিক কণ্ট্রোল। তোমাকে কিছুই করতে হবে না। ঠিক সঙ্কেতটুকু দিলেই হবে।'

'তা দেব।'

'টেক-অফ ঝাঁকুনির প্রায় সবটুকুই শুষে নেবে সিট। বাতাসের চাপ আর তাপমাত্রাও সমতা বজায় রাখবে আপনা থেকেই। পৃথিবী ছাড়িয়ে সোজা মহাশূন্যে ঢুকবে জাহাজ। আপনা থেকেই এগিয়ে যাবে চাঁদের দিকে। একশ মাইল দূরে গিয়ে নিজে থেকেই বিশেষ কক্ষ পথে প্রদক্ষিণ করবে চাঁদকে। সেই কক্ষপথই তোমাকে নিয়ে যাবে মুন বেসে। আপ্লেনাইন রেঞ্জে গিয়ে শুধু সিগন্যাল রকেটগুলো ছুঁড়ে দিও —বাকী কাজ করবে মুনবেসের মনিটর।'

জাহাজের মধ্যে সুরুৎ করে পিছলে ঢুকে গেল ট্যাসো। গিয়ে বসল প্রেসার সিটে। অটোমেটিক বাহুবন্ধনী দুপাশ থেকে বেরিয়ে এসে লক্‌ড্ হয়ে গেল কোমরের ওপর। কণ্ট্রোলের ওপর আঙুল ছুঁইয়ে নিয়ে বলল হৃষ্টচিত্তে—'মেজর, কি আপশোষ বলুন তো! এ-জাহাজ মোতায়েন ছিল আপনাকেই নিয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু চললাম আমি, রইলেন আপনি।'

'পিস্তলটা রেখে যাও।'

কোমর থেকে পিস্তল টেনে এনে তালুতে রেখে কি যেন ভাবল ট্যাসো।

বলল মৃদুস্বরে—'এ জায়গা ছেড়ে বেশী দূর যাবেন না। সহজেই যেন খুঁজে পাই।'

'আমি এখানেই থাকব—এই কুয়োর ধারে।'

টেক-অফ সুইচের ওপর আঙুল বুলিয়ে নিল ট্যাসো— আঙুল ছুঁয়ে গেল মসৃণ মেট্যালের ওপর দিয়ে। বলল মসৃণতর কণ্ঠে—

'বিউটিফুল জাহাজ। নিখুঁতভাবে তৈরী। মেজর, আপনাদের যন্ত্রবিদ্যার প্রশংসা না করে পারছিনা। আপনারা যে কাজে হাত দিয়েছেন, বরাবর তা নিখুঁত ভাবে বানিয়েছেন—এই রকেট জাহাজের মত। খুঁত রাখেন না কোথাও। যে যন্ত্রের কাজ, তা সে করবেই—আপনা থেকেই। আপনাদের সৃষ্টির তুলনা নেই—তুলনা নেই আপনাদের প্রতিভার। বিশেষ করে অটোমেটিক যন্ত্র নির্মাণে আপনারা সত্যিই অপ্রতিদ্বন্দ্বী।'

'পিস্তলটা দাও,' অধীর ভাবে হাত বাড়িয়ে বললেন হেনড্রিক্স এবং কথার শেষে টলতে টলতে উঠতেও গেলেন।

তার আগেই ট্যাসো ছুঁড়ে দিল পিস্তল। হেনড্রিক্সের মাথার ওপর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে পিস্তল ঠিকরে গেল বেশ খানিকটা তফাতে। জ্যামুক্ত তীরের মত হেনড্রিক্সও ছিটকে গেলেন সেই দিকে। হেঁট হয়ে তুলে নিয়েই ঘুরে দাঁড়ালেন জাহাজের দিকে।

তার আগেই কানে ভেসে এসেছিল একটা কথা—'গুডবাই, মেজর।' এখন চোখের সামনে কব্জার ওপর ঘুরে গিয়ে বন্ধ হয়ে গেল স্পেশশিপের দরজা। খটাংখট শব্দে ছিটকিনি আটকে গেল ভেতরে। টলতে টলতে এগিয়ে এলেন হেনড্রিক্স। উনি জানেন, ও দরজা এখন আর খুলবে না। স্বইচ্ছায় কেউ খুলতে পারবে না। তাই থর-থর কম্পিত হাতে পিস্তল তুলে টিপ করলেন দরজার দিকে।

নিমেষে সব কিছুই গুঁড়িয়ে পুড়িয়ে উড়িয়ে দেওয়ার মত একটা কান ফাটানো শব্দ শোনা গেল। ধাতুর খাঁচা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল রকেট জাহাজ—মেটাল ফ্রেম গলে গেল নিদারুণ উত্তাপে। কেঁচোর মত কুঁচকে সরে এলেন হেনড্রিক্স! পুঞ্জ পুঞ্জ ভস্ম-মেঘের মধ্যে প্রবেশ করল স্পেশশিপ এবং দেখতে দেখতে বিলীন হল ধূসর আকাশে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখলেন হেনড্রিক্স। সুদীর্ঘ ধূম্র-পুচ্ছ হাওয়ায় উড়ে না যাওয়া পর্যন্ত স্ট্যাচুর মত ঊর্ধ্ব মুখে চেয়ে

রইলেন বিলীয়মান বিন্দুটির দিকে। তারপর ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল আকাশ আর বাতাস। আবার ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়ার ঝাপটা লাগল মুখে। আবার স্পন্দনহীন ভূদৃশ্য পীড়া জাগালো দুই চোখে। আবার সীমাহীন বিষাদ সাঁড়াশির মত চেপে বসল অন্তরের অন্তস্থলে।

হাঁটতে লাগলেন মেজর। এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার চাইতে হাঁটা ভাল। লক্ষ্য নেই, উদ্দেশ্য নেই, তবুও হেঁটে চললেন শুধু চলমান থাকার অভিপ্রায়ে। অন্তর যার অস্থির, সে স্থির থাকতে পারে না কোন মতেই। এ অস্থিরতা থাকবে সাহায্য না আসা পর্যন্ত —আদৌ যদি আসে কোনদিন।

পকেট হাতড়ে বার করলেন এক প্যাকেট সিগারেট। ওরা প্রত্যেকেই সিগারেট চেয়েছে, কিন্তু ওঁর স্টক অঢেল নয় বলেই বিলি করেন নি। সিগারেট আজকাল চাইলেই মেলে না। একটা ধরিয়ে নিয়ে টান দিলেন পরপর কয়েক বার।

পাশ দিয়ে একটা গিরগিটি বুকে হেঁটে গিয়ে উধাও হল ছাইয়ের ফোকরে। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন মেজর। গিরগিটি আর উঁকি মারল না। কিন্তু কয়েকটা মাছি কোত্থেকে এসে ভনভন করতে লাগল পায়ের গোড়ায়। নিষ্ফল আক্রোশে ওদেরকেই লক্ষ্য করে পদাঘাত করলেন মেজর।

সূর্য ক্রমশঃ উঠছে মাথার ওপরে। রোদের তাত বাড়ছে। মাথা ঘুরছে। ঘাম জমছে কপালে, গড়িয়ে নামছে কলারের ফাঁক দিয়ে। মুখের ভেতর শুকিয়ে গিয়েছে—থুথু পর্যন্ত নেই।

কিছুক্ষণ পরে পা আর চলল না। জঞ্জালের গাদায় বসে পড়লেন হেনড্রিক্স। মেডিসিন কিট খুলে কয়েকটা নারকোটিক বড়ি বার করলেন। আফিং জাতীয় যন্ত্রণা-নিবারক ওষুধ। গিলে নিলেন পরপর। তাকিয়ে দেখলেন চারপাশে। বুঝতে পারলেন না জায়গাটা কোথায়।

সামনেই কি যেন একটা পড়ে রয়েছে। জমির সঙ্গে প্রায়

মিশে রয়েছে বললেই চলে। নীরবে নিঃশব্দে শুয়ে আছে! নড়ছে না।

চকিতে পিস্তল টেনে বার করলেন হেনড্রিক্স। শায়িত বস্তুটা দেখতে মানুষের মত? মনে পড়ল পরক্ষণেই। ক্লজ। ক্লজের দেহাবশেষ। সেকেণ্ড ভ্যারাইটি রোবটের ধ্বংসাবশেষ। চারিদিকে ছড়িয়ে আছে রিলে আর স্প্রিং, চাকা আর গীয়ার। চকচকে মেটাল পার্টসগুলোয় রোদ পড়ে ঠিকরে যাচ্ছে অগুন্তি স্ফুলিঙ্গ আকারে।

উঠে দাঁড়ালেন হেনড্রিক্স। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন ভাঙা রোবটের পাশে। বুটের ঠোক্করে উল্টে দিলেন কলের মানুষকে। ধাতুর খোল আর অ্যালুমিনিয়ামের পাঁজরের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এল নাড়িভুঁড়ির মত একরাশ তার। রাশি রাশি তার, সুইচ আর রিলে। মোটর আর রডের যেন শেষ নেই। একটা ধাতব খোলসের মধ্যে অগুন্তি সূক্ষ্ম কলকব্জা।

হেঁট হয়ে দেখলেন, মগজের ঢাকনি আছড়ে পড়ার সময়ে পাথরে লেগে ভেঙে গেছে। নকল মগজ দেখা যাচ্ছে। নির্নিমেষে চেয়ে রইলেন মেজর। তড়িৎপ্রবাহের রকমারি পথ—যেন একটা গোলক ধাঁধা। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম টিউব। চুলের মত সরু তার। ব্রেন-কেসের ঢাকনি ধরে টান মারতেই ঘুরে গেল কব্জার ওপর। ভেতর দিকে স্ক্রু দিয়ে আঁটা টাইপ প্লেট। রোবটটা কি টাইপের, লেখা রয়েছে তাতে। চোখ নামিয়ে আনলেন হেনড্রিক্স।

স্থাণুর মত হেঁট হয়েই রইলেন। চোখের পলক পড়ল না।

টাইপ প্লেটে লেখা রয়েছে: IV-V...অর্থাৎ ফোর্থ ভ্যারাইটির রোবট।

দীর্ঘক্ষণ পলকহীন চোখে প্লেটের পানে চেয়ে রইলেন হেনড্রিক্স। ফোর্থ ভ্যারাইটি। সেকেণ্ড নয়। ভুল করেছেন প্রথম থেকেই। শুধু তিন রকমের নয়—অনেক রকমের রোবট তৈরী হয়ে চলেছে পাতাল কারখানায়। রোবটাই রোবট তৈরী করছে। উনি

দেখেছেন ফার্স্ট ভ্যারাইটি আর থার্ড ভ্যারাইটিকে। ভুল করে ক্লজকে ভেবেছিলেন সেকেণ্ড ভ্যারাইটি। তা নয়। ক্লজ ফোর্থ ভ্যারাইটি।

ক্লজ যদি সেকেণ্ড ভ্যারাইটি না হয়—

সহসা নামহীন আতংকে আড়ষ্ট হয়ে গেলেন হেনড্রিক্স। টিলার ওদিকে ছাইয়ের স্তূপ মাড়িয়ে কি যেন এগিয়ে আসছে না?

প্রখর চোখে চেয়ে রইলেন হেনড্রিক্স। চোখের প্রতিটি অণু-পরমাণু যেন ফেটে পড়তে চাইল আগুয়ান বস্তুগুলিকে স্পষ্টভাবে দেখার আন্তরিক কামনায়।

আসছে···আসছে··একটা নয় দুটো নয়···অনেকগুলো মূর্তি ধীর স্থির পদক্ষেপে কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে আসছে!

আসছে তাঁরই দিকে।

নিমেষে নতজানু হয়ে বসে পড়লেন হেনড্রিক্স···নতুন স্বেদধারা দরদরিয়ে নেমে এল ললাট থেকে গাল বেয়ে। হাত কাঁপছে ওঁর··· কাঁপছে সারা দেহ। আতংক যেন লক্ষ ফণা তুলে ছোবল মারতে চলেছে তাঁর চেতনাকে।

তাই মনের সমস্ত শক্তি জড়ো করে আতংককে দাবিয়ে রাখলেন মেজর। ভয় পেলে চলবে না। মূর্তিগুলো আরো এগিয়ে এসেছে। আসুক। কিন্তু প্যানিক বড় সর্বনেশে···

সারি সারি মূর্তিদের প্রথমেই রয়েছে ডেভিড। একজন ডেভিড। হেনড্রিক্সকে দেখেছে সে। দেখেই দ্রুত হয়েছে পদক্ষেপ। মুখ কিন্তু নির্বিকার। উদাসীন। প্রথম ডেভিডের পেছনেই রয়েছে দ্বিতীয় ডেভিড, তার পেছনে তৃতীয় ডেভিড, এক ছাঁচে ঢালা হুবহু এক রকমের ডেভিড। প্রত্যেকের মুখে তূষ্ণীভাব—প্রত্যেকের পা বেগে সচল। সরু সরু কাঠির মত পা চালিয়ে প্রত্যেকেই স্থির লক্ষ্যে ছুটে আসছে হেনড্রিক্সের পানে। পা উঠছে, পড়ছে সমানতালে। বুকের কাছে জড়ো করা ন্যাকড়ার ভালুক ছানা।

নিশানা ঠিক করে নিয়ে গুলি করলেন হেনড্রিক্স। প্রথম ডেভিড ছটো রেণু রেণু হয়ে ভুস করে ছড়িয়ে গেল চারিদিকে। এগিয়ে এল তৃতীয় জন। ছাই মাড়িয়ে নিঃশব্দে তার পেছনে আসতে দেখা গেল আরেকটি মূর্তিকে। মাথায় ডেভিডের চেয়ে অনেক ঢ্যাঙা।—জখম সৈনিক। জখম সৈনিকের পেছনে…ছজন ট্যাসো!

পাশাপাশি হাঁটছে ছজন ট্যাসো। ছজনেরই পরনে হেভী বেল্ট, রাশিয়ান আর্মি প্যান্ট, সার্ট, লম্বা চুল। প্রত্যেকের মুখ এক ছাঁদে তৈরী, এক ছাঁচে ঢালা—একটু আগেই যেমনটি দেখেছেন—অবিকল সেইরকম। সে বসেছিল রকেট জাহাজের প্রেসার সিটে—আর এরা পায়ে হেঁটে এগিয়ে আসছে পাশাপাশি। তন্বী, শব্দহীনা একজোড়া ট্যাসো।

অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে ওরা। আচমকা হেঁট হল ডেভিড। ন্যাকড়ার ভালুক ছানাকে ফেলে দিল মাটির ওপর। মাটিতে পড়েই সচল হল খেলনার ভালুক। তীরবেগে ছাই উড়িয়ে ছুটে এল হেনড্রিক্সের পানে। আপনা থেকেই হেনড্রিক্সের আঙুল চেপে বসল পিস্তলের ঘোড়ায়। কুয়াশা হয়ে মিলিয়ে গেল ভালুক ছানা। ধূসর ছাই মাড়িয়ে নির্বিকার মুখে তবুও এগিয়ে এল ট্যাসো পাইপ রোবট ছজন—ছজনেরই মুখ নির্বিকার। সত্যিই কলের পুতুল—হাঁটছে পাশাপাশি তালে তালে পা ফেলে।

কাছাকাছি আসতেই পিস্তল তুলে ফায়ার করলেন হেনড্রিক্স।

অদৃশ্য হয়ে গেল জোড়া ট্যাসো। কিন্তু ঢাল বেয়ে উঠে আসছে আরো অনেক ট্যাসো। সবশুদ্ধ ছটা ট্যাসো। লাইন দিয়ে দ্রুত চরণে ছুটে আসছে একমাত্র মানুষ হেনড্রিক্সের পানে। একই রকমের দেখতে ছটি ট্যাসো।

এদেরই একজনকে রকেট জাহাজের নিশানা দিয়েছেন হেনড্রিক্স—ফাঁস করে দিয়েছেন চাঁদের ঘাঁটির গোপন ঠিকানা। সিগন্যাল

কোড আর জাহাজ নিয়ে সে এখন চাঁদের পথে। এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে শুধু তাঁরই জন্যে—তাঁরই অবিমৃষ্যকারিতার ফলে।

একটা বিষয়ে ভুল করেন নি তিনি। বোমা নিয়ে মিছে সন্দেহ করেন নি। ভয়াবহ এই বোমা মানুষের হাতে তৈরী নয়—মানুষ এ বোমার ফরমূলা আজও আবিষ্কার করতে পারেনি। করেছে রোবটরা—যারা মানুষের হাতে নির্মিত হয়েছে নিছক মানুষ নিধনের জন্যে। তাই ডেভিড টাইপ রোবট, জখম সৈনিক টাইপ রোবট, এমন কি ক্লজ টাইপ রোবট ধ্বংস করার মতও শক্তি নিহিত রয়েছে প্রলয়ংকর এই বর্তুল-বিস্ফোরকের মধ্যে। পুরোদমে সেই বিস্ফোরকের উৎপাদন হয়ে চলেছে পাতাল কারখানায়—রোবটদেরই তত্ত্বাবধানে।

ট্যাসোরা লাইন দিয়ে এগিয়ে আসছে। বুক টানটান করে দাঁড়ালেন হেনড্রিক্স। ভয় আর নেই। শান্তভাবে শুধু প্রতীক্ষা করা ছাড়া পথও নেই। ওরাও আসছে প্রশান্ত মুখে। চেনা মুখ। একই বেল্ট, একই হেভী সার্ট, একই বোমা চামড়ার খাপে—

বোমা!

ট্যাসোরা নাগাল ধরে ফেলেছে হেনড্রিক্সের। শেষ মুহূর্তে সহসা হেসে উঠলেন মেজর হেনড্রিক্স। এ হাসি বিদ্রুপের হাসি। রোবটরাই এ বোমা বানিয়েছে অন্য টাইপের রোবট ধ্বংসের জন্যে। সেকেণ্ড ভ্যারাইটির কারখানায় তৈরী হয়েছে অন্য ভ্যারাইটি নিকেশ করার জন্যে। আর কোনো উদ্দেশ্য নেই এ বোমা তৈরীর পেছনে।

শুরু হয়েছে রোবটে রোবটে যুদ্ধ!

ত্রিভুবন যাঁর পায়ের তলায়

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ধোঁয়া উঠছিল পাহাড়ের চূড়ো দিয়ে। ভলকে ভলকে কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যাচ্ছিল আকাশ। গাঁয়ের লোকেরা তাই দেখে মহাভাবনায় পড়েছিল। হয়েছিল নানা জল্পনা কল্পনা। ধোঁয়াটা কিসের? অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ব সংকেত? এ-পাহাড়কে কস্মিনকালেও তো আগুন বমি করতে দেখা যায় নি। তার চেয়েও বড় কথা, পাহাড়টা যে আগুন-পাহাড়, সেটাইতো জানা ছিল না। ঘটনাস্থল, নর্থ ক্যারোলিনার পশ্চিম উপান্ত। পাহাড়টার নাম গ্রেট ঈরী।

গ্রামবাসীরা মহা দুশ্চিন্তায় পড়ল গ্রেট ঈরীর পানে তাকিয়ে। জন্মাবধি যাকে আর পাঁচটা পাহাড়ের মত শান্তশিষ্ট গোবেচারা মনে হয়েছিল, অকস্মাৎ তার এ কী ভয়াল রূপ। আশ্চর্য্য ব্যাপার তো!

কেউ কেউ বললে, পাশ দিয়ে আসার সময়ে নাকি গ্রেট ঈরীর পেটের মধ্যে গুর গুর গুম গুম আওয়াজ শুনেছে। চূড়োয় ভাসমান ধোঁয়ার মেঘ আর অভ্যন্তরে গভীর গর্জন—এতো আগ্নেয় গিরির লক্ষণ! গ্রেট ঈরী কি তাহলে এখন আগুন পাহাড়?

সব চাইতে ভয় পেল মর্গাণ্টনের নাগরিকরা।

কেউ কেউ অবশ্য প্রস্তাব করেছিল, পাহাড় চূড়ায় আরোহণ করে দেখে আসা যাক ব্যাপারটা কী। কিন্তু যা খাড়াই পাহাড়, ভরসা করেনি কেউ।

তার পর এল চৌঠা এপ্রিল। নিশুতিরাতে মর্গাণ্টনেই সজ্জন অধিবাসীদের ঘুম ছুটে গেল কর্ণবধিরকারী একটা প্রচণ্ড আওয়াজে।

শুধু আওয়াজ নয়, ভূমিতল কেঁপে উঠল থর থর করে, বাতাসেও যেন কিসের আলোড়ন অনুভব করল অনেকে! সমস্ত ঘটনাটা ঘটল হঠাৎ!

বাড়ী-বাড়ী কান্নার রোল উঠল। তছনছ হয়ে গেছে ঘরদোরের আসবাব পত্র। ছবি ছিটকে গেছে দেওয়াল থেকে, আলমারী উল্টে পড়েছে মেঝের ওপর, ঝাঁকুনি, বিস্ফোরণ আর গুরু গুরু নিনাদ— যেন মুহূর্তের মধ্যে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না এমনি একটা অট্টরোলের সৃষ্টি হল রাত্রি নিশীথে। ঘুম জড়ানো চোখে আচমকা আঁৎকে উঠে ভীতু বউরা জড়িয়ে ধরল স্বামীদের। ছেলেমেয়েরা ককিয়ে কেঁদে উঠে ঢুকে গেল মা-বাবার লেপের তলায়। পলকের জন্যে মনে হল যেন ছাদ ভেঙে পড়ছে, দেওয়ালগুলো চৌচির হয়ে আছড়ে পড়তে চাইছে। ভূমিকম্প নামক নিষ্ঠুর দৈত্য পৃথিবীর ঝুঁটি ধরে নাড়ছে ঘন ঘন!

প্রাণ হাতে করে ঘর ছেড়ে সবাই দৌড়ে বেরিয়ে এল বাইরে। নগরের দিকে দিকে শোনা গেল আর্ত চীৎকার, আতংকিত কান্না, ভয়ার্ত হট্টগোল, দুপদাপ, দুমদাম শব্দ।

সবারই মুখে এক কথা···ভূমিকম্প, না, অগ্ন্যুৎপাত? কিন্তু কোনোটাই যে নয়, তা দেখা গেল অচিরে। আতংকে কাঠ নাগরিকরা আশ্বস্ত হল যখন দেখা গেল ঘরদোর তো ভূমিস্যাৎ হয় নি। গ্রেট ঈরীর শিখরেও অগ্নিশিখা নেই, স্ফুলিঙ্গ নেই! অন্ধকার, অন্ধকার, নিঃসীম অন্ধকারে ডুবে আছে আকাশ বাতাস বিশ্ব চরাচর।

কে যেন বলে উঠল—'তাহলে নিশ্চয় পাহাড় ধ্বসে পড়ল কোথাও। অথবা পায়ের তলায় শিলাস্তর খসে গেল!'

কিন্তু আর তো কোনো ভূচাঞ্চল্য টের পাওয়া যাচ্ছে না! তবে কি বিপদ কেটে গিয়েছে?

জবাব এল ঠিক এক ঘণ্টা পরে।

এক ঘণ্টার মধ্যে নতুন কোনো ঘটনা ঘটল না।

তারপরেই আগুনের শিখা লকলক করে উঠল কালো আকাশ

পর্যন্ত। আকাশ লালে লাল হয়ে গেল আগুনের আভায়। লকলকে শিখা আগুনের অগ্নি-নিঃশ্বাসের মত ঝলকে পাহাড়-চূড়ো থেকে ঠিকরে-ঠিকরে বেরিয়ে গেল চতুর্দিকে। গ্রেট ঈরীর পাথুরে দেওয়াল বেয়ে ওঠা আগুনের সেই তাণ্ডব নৃত্য দেখা গেল বহুদূর পর্যন্ত।

গণ-আতংক বস্তুটা বড় সর্বনাশা জিনিস। গভীর রাতে যাদের ঘুম ভেঙেছে ঝাঁকুনি খেয়ে এবং প্রচণ্ড আওয়াজ শুনে, তারাই যখন দেখল গ্রেট ঈরী এবার অগ্নি-জিহ্বা মেলে শব্দহীন অট্টহাসি হাসছে, তখন ভয়ে ধাত ছেড়ে যাওয়ার জোগাড় হল আবাল বৃদ্ধ বনিতার। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা, এই নীতি অনুসরণ করে মূল্যবান জিনিস-পত্র বাড়ী ঘর দোর ফেলে সবাই চোঁ-চাঁ দৌড় দিলে নিরাপদ দূরত্বে।

গণ-আতংক এমনই জিনিস। জনগণের বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়ে দেয়, ধীরস্থির চিন্তাশক্তি কেড়ে নেয়।

কিন্তু পাগলের মত এই পালিয়ে-যাওয়া যারা ভাল চোখে দেখেনি, যারা গা-ভাসিয়ে দূরে সরে যেতে চায়নি, তারাই ভীড় থেকে গা বাঁচিয়ে, একদৃষ্টে চেয়ে রইল অগ্নিময় গ্রেট ঈরীর দিকে।

পরিবর্তনটা সেই কারণেই চোখে পড়ল তাদের। দেখল অগ্নিশিখা ধীরে ধীরে কমে আসছে!

তাহলে তো অগ্ন্যুৎপাত নয়! তাছাড়া আগ্নেয়গিরির ফুটন্ত জঠর থেকে শুধু আগুন তো বেরোয় না—সেই সঙ্গে যেন তপ্ত কড়াই থেকে লাফিয়ে ওঠে গলিত লাভা, আকাশে ছিটকে যায় পাথরের টুকরো।

কিন্তু সে-রকম কিছুই নেই। পাথর ছিটকোনো নেই, লাভার স্রোত নেই, এমন কি লকলকে শিখাও মিলিয়ে গেল দেখতে দেখতে।

অন্ধকার! আবার অন্ধকার।

ভোর হওয়ার আগেই অনেকে বাড়ী ফিরে এল। আগ্নেয়গিরি যখন নয়, অত ঘাবড়ানোর কি আছে? নিরীহ গ্রেট ঈরীর পেটের খামোকা আগুন জ্বলে উঠে ফের নিভে গেল কেন, সে গবেষণা না

হয় পরে করা যাবে। পাহাড়ের অধিদেবতার খামখেয়াল কিনা, দিনের আলোয় দেখলেই তো চুকে যায়।

কিন্তু উপর্যুপরি উৎপাতের তখনো বাকী ছিল। তাই ভোর পাঁচটা নাগাদ আবার জাগ্রত হল গ্রেট ঈরী।

পাহাড়ের ভেতর থেকে একটা বিদঘুটে শব্দ উত্থিত হল আকাশ অভিমুখে। অদ্ভুত ধরনের একটা শব্দ···যেন অসংখ্য চাকা ঘুরছে ঘর-ঘর-ঘর-ঘর শব্দে···সেই সঙ্গে যেন বাতাস ছটফটিয়ে উঠছে বিশালকায় ডানার ঝাপটায়!

দিবালোক হলে দেখা যেত শরীরী বিভীষিকাটাকে। গ্রেট ঈরীর উদর-গহ্বর থেকে অতর্কিতে ঘর-ঘর-ঘর-ঘর-ঝটপট-ঝটপট শব্দে শূন্যে লাফিয়ে উঠল যেন একটা প্রকাণ্ড শিকারী বাজ। আকাশের আতংক সেই বিরাটকায় উড়ন্ত বিভীষিকা নক্ষত্রবেগে নিমেষে মিলিয়ে গেল পুব দিকে।

পঁচিশে এপ্রিল, ওয়াশিংটন।

ফেডারাল পুলিশের বড় কর্তা আমাকে তলব করলেন তাঁর খাস কামরায়। আমি ঘরে ঢুকতেই আমার করমর্দন করে বললেন হাসিমুখে জন স্ট্রক, অতীতে তুমি বহুবার প্রমাণ করেছ—কাজে তোমার নিষ্ঠা আছে এবং কঠিনতম কাজও সুসম্পন্ন করবার ক্ষমতা তোমার আছে। তুমি সেই জন স্ট্রক-ই আছো, না, পালটে গিয়েছ?

'মিস্টার ওয়ার্ড' বললাম আমি, 'দায়িত্ব-পালন করবার ক্ষমতা আমার আদৌ আছে কিনা তা বলতে পারব না। সাফল্যের সম্বন্ধেও গ্যারান্টি দেওয়া আমার সাধ্যাতীত। তবে হ্যাঁ, নিষ্ঠার কথা যদি বলেন তো বলব—আপনার দেওয়া কোনো কাজেই তার অভাব ঘটবে না।

'তুমি কি আগের মতই ধাঁধার জট ছাড়াতে ভালোবাসো? রহস্য দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ো?'

'নিশ্চয়।'

'বেশ, বেশ। মর্গাণ্টনের কাছে ব্লু-রিজ পাহাড়ে সম্প্রতি যা ঘটেছে, নিশ্চয় তা শুনেছো। গ্রেট ঈরীর এই ভূতুড়ে আচরণের ফলে ও-অঞ্চলে কোনো বিপদ আসন্ন কিনা, তা দেখা আমাদের কর্তব্য।'

আমি শুনতে লাগলাম।

মিস্টার ওয়ার্ড বললেন—'পাহাড়টার ভেতরে কি আছে আজ তা জানা দরকার। কিন্তু কাজটা নাকি সহজ নয়। সবার কাছেই একই রিপোর্ট পাচ্ছি—গ্রেট ঈরী-র খাড়াই দেওয়াল টপকে ভেতরে ঢোকা একেবারেই অসম্ভব।

অসম্ভব কিছুই নয়—ছোট মন্তব্য করলাম আমি।

'তাহলে পাহাড়ে চড়ার জন্যে-তৈরী হও। মর্গাণ্টনের মেয়র তোমাকে সাহায্য করবে খন।'

মর্গাণ্টন পৌঁছে সটান গেলাম মেয়র ইলিয়াস স্মিথের বাসভবনে। সেখান থেকে তিন দিন পর সূর্য ওঠার আগেই রওনা হলাম সঙ্গে দুজন গাইড নিয়ে। পথ চলতে জিজ্ঞেস করলাম গাইডদের—'পাহাড়ের অবস্থা কি রকম? ফাটল আছে তো? কার্ণিশের মত খোঁচা বেরিয়ে থাকলেও ধরে উঠে যাওয়া যাবে। তাইনা?'

'কিন্তু গ্রেট ঈরীতে এর আগে কেউতো ওঠেনি।' জবাব দিলে একজন গাইড। 'পাহাড়ে আদৌ চড়া যায় কিনা, কেউ জানে না। সবাইকেই বলতে শুনি একই কথা—দুর্গমগিরি বলতে যা বোঝায়, গ্রেট ঈরী তাই। খাড়াই পাথরের দেওয়াল দিয়ে সুরক্ষিত গ্রেট ঈরীকে জয় করা মানুষের সাধ্যের বাইরে।'

দেখা যাক।...

পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে উঠতে আকাশে আলো ফুটল। একটা সঙ্কীর্ণ গিরিপথ বেয়ে উঠছিলাম চূড়োর দিকে। রাস্তাটা সরু এবং ততটা খাড়াই নয়। সাড়ে এগারোটায় পৌঁছলাম পাহাড়ের ওপরের সীমানায়।

খাড়াই দেওয়াল শুরু হয়েছে সেই সীমারেখা থেকে। গ্রেট

ঈরীর সর্বশেষ ধাপ বলতে এই চাতাল। এখান থেকেই খাড়াই দেওয়াল সোজা উঠে গেছে যেন স্বর্গের দিকে। ওপরে তাকালে মাথা ঘুরে যায়।

পাহাড়ের ঐ চেহারা দেখে বুক দমে যাওয়া স্বাভাবিক। একমাত্র পাখী ছাড়া গ্রেট ঈরীর শিখর দেশে পৌছোনো কি সম্ভব ?

মেয়র হাল ছাড়বার পাত্র নন। বললেন—গ্রেট ঈরীর অনধিগম্য অংশ হল এইটুকুই। দেখা যাক উল্টো দিকে দেওয়াল বেয়ে ওঠার কোনো রাস্তা আছে কিনা।

পর্বতচূড়ো তো নয়, যেন একটা খাড়াই চোঙা বসানো পাহাড়ের ডগায়। অতি কষ্টে প্রাণটা হাতে করে এক চক্কর ঘুরে আসা গেল খাড়াই দেওয়ালের তলা দিয়ে। কিন্তু কেল্লার বুরুজের মত সুদৃঢ় প্রাচীর বেয়ে ওঠার কোনো পথ কোনো দিকেই পাওয়া গেল না।

চটে গেলেন মেয়র—'ধুত্তোর! খামোকা সময় নষ্ট আর গতর নষ্ট! শয়তান গ্রেট ঈরীর পেটের শয়তানির কিছুই তো জানা গেল না।'

আমি বললাম ঘর্মাক্ত কলেবরে এতটা পথ উঠেও তো সন্দেহ-জনক আওয়াজ টাওয়াজ শুনছি না। না আছে ধোঁয়া, না আছে আগুনের শিখা।'

বলে কটমট করে চেয়ে রইলাম গ্রেট ঈরীর দুস্তর শিখরদেশের পানে। তারপর সঙ্গী সাথী নিয়ে নেমে এলাম নীচে। পাঁচটার আগেই সানুদেশে পৌছোলাম। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছিল। সে ব্যবস্থা হয়ে গেল একটা চাষী বাড়ীতে। সাদরে আমাদের নেমন্তন্ন করে নিয়ে যাওয়া হল খামার বাড়ীতে। খাওয়া দাওয়ার পর নানা প্রশ্নের উত্তরে মেয়র শুধু একটা কথাই বললেন—'গ্রেট ঈরীর ভেতরে কিচ্ছু নেই। যা কিছু রটেছে, তা স্রেফ গাঁয়ের লোকেদের কল্পনা!'

পরের দিন ট্রেনে চেপে ওয়াশিংটন ফিরে এলাম।

দিন পনেরো পরে ঘটল আরো আশ্চর্য ঘটনা। গুজব-প্রিয় জনসাধারণ গ্রেট ঈর্ষীর রহস্য ভুলে মেরে দিল রহস্যের অবতারণায়।

চাঞ্চল্যকর একটা খবর বেরুলো কাগজে। ফিলাডেলফিয়ার কাছে নাকি একটা অদ্ভুত গাড়ী দেখা গেছে। রাস্তার ওপর দিয়ে অসম্ভব গতিবেগে গাড়ীটা উধাও হয়েছে অনেকের চোখের সামনে দিয়ে—কিন্তু কক্ষচ্যুত উল্কার মত ধেয়ে যাওয়ার দরুণ বিচিত্র যানের বর্ণনা দেওয়ার সাধ্য কারো নেই। ভালো করে দেখাই যায়নি তো বলবে কী? যেন এক ধূলি-ঝঞ্ঝা নিমেষ মধ্যে ছিটকে গেছে রাস্তার এদিক থেকে সেদিকে।

গাড়ী তো নয়, যেন বন্দুকের বুলেট। সব চাইতে আশ্চর্য ব্যাপার, ধোঁয়া বা বাষ্পের লেশ মাত্র দেখা যায়নি গাড়ীর আশে পাশে। পেট্রোলের গন্ধও পাওয়া যায়নি।

খবর পড়ে দারুণ গুলতানি আরম্ভ হয়ে গেলে হাটে বাজারে, অফিসে আদালতে, রাস্তায় ঘাটে। কোন শক্তি বলে নক্ষত্রবেগে ছুটে যায় আশ্চর্য শকট? স্টিমের শক্তি হলে বাষ্প দেখা যেত, পেট্রোলের তেজ হলে ধোঁয়া ভাসত। কিন্তু কিছুই যখন দেখা যায়নি তখন কি ইলেকট্রিসিটিকে কাজে লাগিয়েছে বিস্ময়কর সেই যন্ত্রযান? বিদ্যুৎ-চালিত বলেই কি অমন অবিশ্বাস্য গতিবেগ অর্জন করতে পেরেছে আশ্চর্য গাড়ীটা?

কেউ কেউ বললে, আরে দূর! এ-গাড়ী মানুষের গাড়ী নয়। অন্য গ্রহ থেকে মানুষের চাইতেও বুদ্ধিমান কোনো প্রাণী গাড়ী নিয়ে বেড়াতে এসেছে পৃথিবীতে!

কুসংস্কারাচ্ছন্ন মেয়েরা আরও এক কাঠি এগিয়ে গেল। চোখ বড় বড় করে তারা বললে—'মাথা খারাপ? এ-গাড়ী খোদা পিশাচের গাড়ী না হয়েই যায় না। শয়তান ছাড়া অত জোরে কেউ চালাতে পারে? এত জোরে ছুটে গেল যে অতগুলো লোক কেউ

দেখতেও পেলনা কি-রকম দেখতে গাড়ীটাকে ? শয়তানের গাড়ী কি দেখা যায় কখনো ?

মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে গুজব ছড়িয়ে পড়ল নানা আকারে। শয়তানের অদৃশ্য-গাড়ী নিয়ে কত গল্পই না রচিত হল কতজনের মুখে। রহস্যেঘেরা আজব যানের আকস্মিক আবির্ভাব নিয়ে হৈ-চৈ পড়ল আশপাশের অন্যান্য প্রদেশেও। পুলিশের কাছে ক্রমাগত খবর আসতে লাগল, আশ্চর্য যন্ত্রযান ভোজবাজির মত দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে দেশে দেশে। খসে পড়া তারার মতই ছুটে যাচ্ছে। ধূলোর ঝড়ে গা-ঢাকা দিয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

উইসকনসিনের কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনাটা ঘটল এর পরেই।

খবরটা ফলাও করে ছাপা হয়েছিল সব কাগজেই।

উইসকনসিনের মোটরগাড়ী ক্লাব একটা মোটর রেসের আয়োজন করেছিল তুশ মাইল লম্বা সড়কের ওপর। সড়ক শেষ হয়েছে মিচিগান লেকের পাড়ে। রেস শুরু হল সকাল আটটায়। কাতারে কাতারে লোক জমেছে পথের তুধারে। উল্লাসের অবধি নেই জনসাধারণের মধ্যে। চেঁচামেচি, বাজি ধরাধরি। হৈ-হট্টগোলের মধ্যে খুটুর খুটুর করে যথা সম্ভব দ্রুত গতিতে চলেছে আদ্দিকালের মোটর গাড়ীর দল। এ-যুগের গাড়ীর তুলনায় সে-সব গাড়ী বলেই মনে হয় যেন। চলেছে হাভার্ড-ওয়াটসন, রেনল্ট, আরো আরো কত সনাতনী মডেলের গাড়ী।

আচম্বীতে মাইল তুই পেছনে একটা ভীষণ আওয়াজ শোনা গেল। একটা প্রচণ্ড হট্টগোল—যেন একটা তুমুল ব্যাপার চলেছে সেখানে !

পরমুহূর্তেই দেখা গেল শব্দের উৎসটিকে।

একটা বিপুলাকার ধূলোর মেঘ অবিশ্বাস্য বেগে এগিয়ে আসছে··· আসছে···আসছে ! তুমুল ঘর্ঘর শব্দ উত্থিত হচ্ছে চলমান ধূলি-মেঘের মধ্যে থেকে !

ভালো করে ঠাহর করার অবসর পাওয়া গেল না। তীব্র বেগে অপচ্ছায়ার মত কি যেন একটা সামনে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল পথের সামনের দিকে!

বিভিন্ন কণ্ঠে জাগ্রত হল বিভিন্ন চিৎকার। কেউ চেঁচালো ভয়ে, কেউ বিস্ময়ে।

'নরক থেকে আমদানী সেই যন্ত্রযান!'

'শয়তানের গাড়ী! শয়তানের গাড়ী! ড্রাইভার শয়তান স্বয়ং!'

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা অপসৃত হতেই বহু জনে ছুটল টেলিফোন যন্ত্রের দিকে। সামনে যারা রেসের গাড়ী নিয়ে ছুটছে তাদের হুঁশিয়ার করা দরকার এখুনি! ভীষণ উত্তেজনায় ছুটোছুটি আরম্ভ হয়ে গেল সড়ক বরাবর।

কেউ কেউ উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে প্রস্তাব করল—'খামোকা গুলতানি না মেরে এসো রাস্তার ওপর বাধা ফেলে রাখি। শয়তানের শয়তানি ঘুচে যাবে রাস্তা বন্ধ দেখলে।

আর একদল অমনি মহা চেঁচামেচি করে বললে—আচ্ছা আহাম্মকের দল তো? আরে বাবা, এ-রাস্তার শেষ তো মিচিগান লেকে। সেখানে থামতেই হবে ভূতুড়ে গাড়ীকে!'

মিচিগান লেকের ধারে ঘটল কিন্তু আরও আশ্চর্য ব্যাপার।

বহুদূর থেকে সড়কের ওপর দিয়ে ভেসে এল তুমুল সোরগোল। যেন সহস্রচক্র এক সঙ্গে গড়গড়িয়ে চলেছে, যেন অগণিত যন্ত্র একসঙ্গে মুখর হয়েছে—বিপুল ঐক্যতান ভেসে যাচ্ছে দিকে দিকে।

সেই সঙ্গে ধুলো পাকসাট খেয়ে লাফিয়ে উঠছে শূন্যে। যেন ধুলোর ঘূর্ণিঝড় মহানন্দে তাথৈ তাথৈ নাচছে। পাক সাট খেয়ে সাঁ-সাঁ করে এগিয়ে আসছে দিগন্ত থেকে সড়কের ওপর দিয়ে।

ধুলোর এই ঘূর্ণাবর্তের জন্যেই ওৎপেতে ছিল কাতারে কাতারে মানুষ পথের দুপাশে। মুহূর্তের মধ্যে তীব্র শব্দে বাঁশি বাজল।

হুইসল-এর তীক্ষ্ণ কান ফাটা আওয়াজে সচকিত হয়ে গাড়ীর স্রোত পথ ছেড়ে দিল ধাবমান দৈত্যকে। মিলঅকির বুক চিরে চক্ষের পলকে উধাও হল আজব যান। যেন টুপ করে খসে পড়ল একটা উল্কা।

কিন্তু আশ্চর্য! গতিবেগ হ্রাসের তো কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ভুতুড়ে গাড়ীটার! লেকের জলে ডুব দেবে নাকি?

তখন রাত হয়েছে। সামনের মোড় বেঁকে নিমেষ মধ্যে উধাও হল যেন একটা প্রেতচ্ছায়া।

কিন্তু গেল কোথায়? লণ্ঠন নিয়ে ছুটল জনতা। কোথাও পাত্তা পাওয়া গেল না শয়তান-শকটের! যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে রহস্যধূসর দানব-গাড়ী!

এ ঘটনা যখন ঘটে, আমি তখন ওয়াশিংটনে।

গ্রেট ঈরীর অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। মিস্টার ওয়ার্ড কিন্তু তা সত্ত্বেও সাদর অভ্যর্থনা জানালেন আমাকে।

বললেন -'মন খারাপ করো না, স্ট্রক। সাফল্য কি সব কাজে আসে? পুলিশের কাজেও ব্যর্থতা আছে বইকি।'

একটু থেমে বললেন—কিন্তু এই দানব-গাড়ীটার ব্যাপার কী বলো তো? এত জায়গায় তাকে একবার দেখা গেল, অথচ কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারছে না জিনিষটা কী?'

'উইসকনসিন রেসের পর থেকেই কিন্তু নিপাত্তা হয়েছে দানব-গাড়ী।' বল্‌লাম আমি। 'কেউ আর তার চেহারা দেখেনি।'

'ষ্ট্রক,' বললেন বস্। ব্যাপারটা গোড়া থেকেই অসাধারণ। যেমন ধরো এই খবরটা,' বলে একটা সংবাদ আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন মিস্টার ওয়ার্ড। খবরটা এসেছে বোস্টন থেকে। ম্যাসাচুসেটস আর কানেকটিকাটের মেইন উপকূল বরাবর জলের মধ্যে একটা চলমান বস্তু দেখা গেছে। জিনিসটা বিদ্যুতের মত দ্রুতগতি সম্পন্ন! ফলে সেরা দূরবীন দিয়েও তাকে চোখে চোখে রাখা যায়নি।

বিদ্যুৎগতি সম্পন্ন রহস্যধূসর জলযান সম্পর্কে গুজব রটেছে বিস্তর। এক-একজনের রসনায় এক-একরকম রটনা। একটির সঙ্গে আর একটির মিল নেই। কোনো রটনা থেকেই কিন্তু আঁচ করা যায়না জিনিসটা কি।

সমুদ্র যাদের ঘরবাড়ী, সেই নাবিক-মহলের কল্পনাই অবশ্য ছাড়িয়ে গেল আর সবার গালগল্পকে।

আজগুবী কাহিনীর যেন প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল সমুদ্রবাসীদের মধ্যে। একদল তেড়েমেড়ে বললে—'তিমি! তিমি ছাড়া আর কিছুই নয়।' আরেক দল অমনি অট্ট হেসে বললে—'বাঃ! এ কোন দেশের তিমি হে? তিমি তো জানি পিচকিরি দিয়ে জল ছাড়ে—দূর থেকে দেখা যায় ফোয়ারার মত জলের ধারা। কিন্তু এই জলচর জীবটিকে তো বাপু কোনো দিন জল ছুঁড়তে দেখা যায়নি।'

তবে? তাহলে কে এই আগন্তুক? অথই দরিয়ায় কেন তার আবির্ভাব? কি তার পরিচয়?

আবোল তাবোল কল্পনার ঠেলায় আর কিছু না হোক, প্যানিক অর্থাৎ অমূলক ভীতি বস্তুটা যেন অস্থি মজ্জায় সঞ্চারিত হয়ে গেল নাবিকমহলে। শেষে এমন হোল যে দূর থেকে ছায়াদানবের মত জলচর সেই বিভীষিকাকে দেখা গেলেই ছোটখাট নৌকোগুলো উর্ধ্বশ্বাসে ফিরে আসতে লাগল কাছাকাছি বন্দরে!

একদিন ঘটল ঠিক তার উল্টো অর্থাৎ ছায়াদানবকে দেখে চম্পট না দিয়ে সোজা তার দিকে তেড়ে গেল একটা দ্রুতগামী মার্কিন রণতরী। লড়াই করা তাদের ধর্ম, ভয় তাদের কম। কোথাকার কে একটা জলচর জীব এসে আতংক ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তাকে টিট করা একান্তই দরকার। আরে বাবা, মারের নাম বাবাজী! সুতরাং ছোড়ো গোলা—হুকুম দিলেন রণতরীর অধ্যক্ষ!

সঙ্গে সঙ্গে গুড়ুম গুড়ুম শব্দে চারদিক কাঁপিয়ে কামান দাগা

হল। বাতাস কেটে শন্ শন্ শব্দে ছুটে গেল গোলাগুলো। কিন্তু কার দিকে?

ছায়াদানব ছায়ার মত মিলিয়ে গেছে। সমুদ্র পৃষ্ঠে তার ধ্বকধ্বকে জ্বলন্তচক্ষু আর সুবিশাল দেহের চিহ্ন মাত্র নেই!

মার্কিন রণতরীর এই অভিজ্ঞতার পর শুরু হল নতুন করে জল্পনাকল্পনা। ছায়াদানব কি তাহলে ছায়া দিয়ে গড়া? তোপ দাগলেই মিলিয়ে যায়?

অন্য দল জোর গলায় বললে—'মোটেই না। ছায়াদানব ভুতুড়ে ব্যাপার তো নয়ই—বরং ঠিক তার উল্টো। সবাই যা ভাবছে—তাও নয়। অর্থাৎ তিমি জাতীয় পেল্লায় মাছও নয়। এ হল নতুন ধরনের কোনো নৌকো। এমন একটা নৌকো যাকে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বিস্ময়কর একটা শক্তি······

এই পর্যন্ত পড়ে আমি থামলাম।

মুখের পাইপ হাতে নিয়ে মিষ্টার ওয়ার্ড শুধোলেন—'কি যেন ভাবছো মনে হচ্ছে স্ট্রক?'

'ভাবছি রহস্যজনক নৌকোটার অবিশ্বাস্য গতিবেগের কথা! যে-শক্তির জোরে এমন বিদ্যুৎবেগে ছুটতে পারে আগন্তুক জলযান, নিশ্চয় তা প্রচণ্ড! ঠিক এই রকম প্রচণ্ড শক্তি কিন্তু অদ্ভুত সেই মোটরগাড়ীর মধ্যে দেখা গিয়েছে। মোটর গাড়ীর রহস্যজনক সোফার অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে জলে ডুবে, জলযানের রহস্যজনক চালকও অদৃশ্য হয়েছে জলে ডুব দিয়ে। সুতরাং দুটো রহস্যই একযোগে সমাধান করা দরকার', বললাম আমি।

মিস্টার ওয়ার্ড তখন একটা অদ্ভুত কথা বললেন 'স্ট্রক, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো কী? যেদিন থেকে পিলে চমকানো মোটর গাড়ী গা ঢাকা দিয়েছে, তারপর থেকেই কিন্তু এই সৃষ্টি ছাড়া জলযানটা আবির্ভূত হয়েছে। আকস্মিক কাকতলীয় বলে মনে হচ্ছে কী?'

কথাটা শুনেই টনক নড়ল আমার।

মিস্টার ওয়ার্ড পাইপ টানতে টানতে বলে চললেন—'দুটো যন্ত্রযানের ইঞ্জিনই অসম্ভব শক্তিশালী—গোটা যন্ত্রযানটাকে ছোটাতে পারে সাংঘাতিক বেগে। সুতরাং জনসাধারণের চলাচলের পথে যাতে কোনো বিপদ আপদ না ঘটে, তা দেখার জন্যে পুলিশের তৎপর হওয়ার দরকার হয়ে পড়েছে।'

প্রসঙ্গটা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা করলাম দুজনে।

অনর্গল পাইপ টেনে চললেন মিস্টার ওয়ার্ড। সমস্যার সুরাহা বার করার চেষ্টায় এটা-সেটা নানা বিষয় নিয়ে কথা বলার পর হঠাৎ মিস্টার ওয়ার্ড একটা কথা বললেন।

'স্ট্রিক, তুমি বুঝি খেয়াল করোনি একটা জিনিস? আশ্চর্য জলযান আর আজব মোটর গাড়ীর চেহারায় একটা ফ্যানটাসটিক সাদৃশ্য আছে কিন্তু। কী? তাই না?'

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমি। বেশ বুঝলাম জটিল সমস্যাটা নিয়ে বেশ ভেবেছেন মিস্টার ওয়ার্ড। তাই ঠিক জায়গায় ঘা দিতে পেরেছেন।

থেমে থেমে বললাম আমি—'বুঝেছি। আপনি বলতে চান দুটো যন্ত্রযানই আসলে একই যন্ত্রযান। কেমন?'

নীরবে সায় দিয়ে পাইপ টেনে চললেন মিস্টার ওয়ার্ড।

বাড়ী ফিরে এলাম। হাতে সময় প্রচুর। তাই অহর্নিশ চিন্তা করতে লাগলাম যন্ত্রযান-রহস্য নিয়ে। অদ্ভুত মামলার ভার নিয়ে ভুল করলাম না তো? দুর্বোধ্য এই হেঁয়ালীর সমাধান করতে পারবো? না, গ্রেট ঈরীর কাছে পরাজয় স্বীকারের মত আবার মুখে চুণ কালি মেখে হাস্যাস্পদ হতে হবে?

রোজই বসে বসে ভাবি এই সব কথা কিন্তু কি করে কোন পথে কিভাবে তদন্ত শুরু করব, তা আর ভেবে পাইনা। ঠিক এই রকম

সময়ে একদিন আমার বৃদ্ধা পরিচারিকা একটা লেফাপা তুলে দিল আমার হাতে।

খাম ছিঁড়ে পেলাম একটা চিঠি। চিঠির হস্তাক্ষর রীতিমত বলিষ্ঠ; তার চাইতেও তেজালো চিঠির বয়ান :—

মহাশয়,

গ্রেট ঈরীর অভ্যন্তরে প্রবেশের হুকুম হয়েছিল আপনার ওপর। আপনি ব্যর্থ হয়েছেন পাহাড়ের গায়ে পা রাখবার মত ফাটল না পেয়ে। আর চেষ্টা করবেন না। দ্বিতীয় প্রচেষ্টার পরিণামটা আপনার পক্ষে মোটেই শুভ হবে না। হুঁশিয়ারিটা খেয়াল রাখবেন। যদি না রাখেন, জানবেন আপনার কপালে অশেষ দুর্গতি আছে।

এম, ও, ডব্লিউ,

স্বীকার করতে লজ্জা নেই চিঠিটা এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলার পর হকচকিয়ে গেলাম।

আমার মুখের অবস্থা দেখে বুড়ি দাসী শুধোলো—হলো কি? খারাপ খবর নাকি?'

'না, না, কেউ ঠাট্টা করেছে নিশ্চয়।'

মনকে আমি প্রবোধ দিলাম তাই বলে। নিশ্চয় কোনো রসিক ব্যক্তির রসিকতা অথবা বিকৃত চিন্তাধারা।

মন থেকে চিঠির ব্যাপার ঝেড়ে ফেলে দিলাম। দিন কয়েক পরে বুড়ি দাসী এসে চোখ বড় বড় করে বললে—'দাদাবাবু, কদিন ধরে দেখছি দুটো লোক তোমার ওপর সমানে নজর রাখছে। দোরগোড়া থেকে একশ পা দূরে দাঁড়িয়ে থাকে দুজনে! তুমি বাড়ীর বাইরে পা দিলেই পিছু নেয় তোমার।'

কথাটা শুনেই চনমন করে উঠল আমার মস্তিষ্কের চিন্তাক্লিষ্ট কোষগুলো। মুখে কিন্তু অন্য কথা বললাম।

হেসে বললাম দাসীকে—'ভাল গোয়েন্দা হতে পারবে তুমি। দেখি যদি তোমাকে পুলিশে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়।'

দাসী কিন্তু মুখ গোঁজ করে বললে—'কি জানি বাপু। ঠাট্টাই করো আর যাই করো, তোমার পেছনে নির্ঘাৎ গুপ্তচর লেগেছে—এই বলে দিলাম।'

পরের দু'দিন নতুন কোনো গজগজানি শুনলাম না দাসীর মুখে।

দুদিন পর হন্তদন্ত হয়ে দৌড়ে এল সে—, দাদাবাবু, দাদাবাবু, সেই গুপ্তচর দুজন।'

'কোথায়? কোথায়?'

'জানলার নীচে।'

দৌড়ে গেলাম আমি। জানালার খড়খড়ি নামানো ছিল। একটা কোণ তুলে দেখলাম, ফুটপাতের ওপর দাঁড়িয়ে দুজন বলিষ্ঠ পুরুষ। মাথায় টুপী চোখের ওপর টেনে নামানো। মুখের চেহারা ভাল ভাবে দেখা যাচ্ছে না ওপর থেকে। দুজনের হাতে ছড়ি। চেহারা ভারিক্কি। চাহনি এ বাড়ীর দিকে। খড়খড়ি নামিয়ে শুধোলাম দাসীকে 'এই দুজনই কি কদিন ধরে পেছনে লেগেছে আমার?'

'হ্যাঁ, দাদাবাবু।'

'তোমার ভুল হয়নি তো?

'না গো না।'

'তাহলে যাই', পাইপ কামড়ে বললাম স্মিত মুখে। 'আলাপ করে আসা যাক দুই মক্কেলের সঙ্গে। একবার থানায় নিয়ে ফেলতে পারলে জামাই-আদরের ব্যবস্থা হবে খন।'

মাথায় টুপী আর হাতে ছড়ি নিয়ে তৎক্ষণাৎ নেমে গেলাম সিঁড়ি বেয়ে। কিন্তু বৃথাই।

ফুটপাত শূন্য। অন্তর্হিত হয়েছে গুপ্তচর দুজন!

স্পাই দুজন আর উৎপাত করেনি বাড়ীর সামনে। বুড়ি দাসীর চোখেও পড়েনি তাদের গাঁট্টাগোট্টা বপু। দিন কয়েক পরে তাদের নিয়ে খামাকো মাথা ঘামানোও বন্ধ করলাম!

কিন্তু নতুন উৎপাত দেখা গেল ক্যানসাসের একটা লেকে। রগরগে খবরটা ফলাও করে ছাপা হল খবরের কাগজে। সেই সঙ্গে পুলিশমহলের প্রতি কটাক্ষ যা পড়লে গায়ে বিছুটির জ্বালা ধরে যায়।

হঠাৎ একদিন লেকের জলে অদ্ভুত একটা তোলপাড় ব্যাপার লক্ষ্য করল জেলেরা। জলের তলায় যেন একটা প্রচণ্ড লণ্ডভণ্ড চলছে—তাই উত্তাল হয়ে উঠেছে জলপৃষ্ঠ।

দূরে ভাসমান জেলে নৌকোয় ডানপিটে ধীবর সম্প্রদায় তাই দেখে মাথা চুলকে বললেন—'ব্যাপার কী? সমুদ্র দানব নাকি?'

'সমুদ্র-দানব কি আকাশ দিয়ে উড়ে এল?' বললে আর একজন জেলে! 'লেকের জলের সঙ্গে বাইরের কোনো জলের যোগাযোগ নেই যখন, তখন সমুদ্র-দানব লেকে ঢুকল কি করে?'

জেলেরা তখন নানা রকম গবেষণা করে ঠিক করলে, নিশ্চয় কেউ ডুবো জাহাজ চালিয়ে চালিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট করছে।

তাই শুনে আর একদল মুচকি হেসে বললে—ডানাওয়ালা ডুবো-জাহাজ বাবা? পাহাড় দিয়ে ঘেরা লেক। কোথাও কোনো ফুটো নেই, জলের তলায় সুড়ঙ্গ থাকলেও জানতাম নিশ্চয়। তবে ডুবো-জাহাজটি এলো কোত্থেকে?

জেলেদের আড্ডায় নিত্য গুলতানি চলল মুখরোচক প্রসঙ্গটি নিয়ে, শ'য়ে শ'য়ে চনমনে কাহিনী রচিত হল জল তোলপাড়ের রহস্য নিয়ে। জাহাজের তলা ফাঁসলো ঠিক তারপরেই।

সেদিন ছিল বিশে জুন। মার্কেল নামে একটা স্কুনার (পাল-মাস্তুলওয়ালা দ্রুতগামী জাহাজ) তরতর করে জল কেটে চলেছে লেকের ওপর দিয়ে। আচমকা থরথর করে কেঁপে উঠল অতবড় জাহাজটা। উল্টে যেতে যেতে সামলে নিল কোনমতে।

হৈ-হৈ করে মাঝি মাল্লা ক্যাপ্টেন দৌড়ে এলো ডেকে। লেকের এ-অঞ্চলের নাড়ীনক্ষত্র তাদের নখদর্পণে। চোরা পাহাড় তো দূরের

কথা, জলের গভীরতা এখানে নব্বই ফুটের কম নয়। সুতরাং লেকের তলদেশে মার্কেল-য়ের তলা ঠেকে যায়নি নিশ্চয়। তাসত্ত্বেও অত জোরে ধাক্কা লাগল কিসে?

শুধু ধাক্কা তো নয়—সেই সঙ্গে একটা সাংঘাতিক মড়মড় আওয়াজ শোনা গিয়েছিল। মার্কেল কি তাহলে ফুটো হয়ে গেল?

সত্যিই তাই হয়েছে। বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে ক্যাপ্টেন দেখলেন, মার্কেলের গলুই আর পার্শ্বদেশ ভেঙে ভেতর দিকে ঢুকে গেছে। যেন সুকঠিন কিছুর সংঘর্ষে নিজেকে আস্ত রাখতে পারেনি মজবুত স্কুনার মার্কেল!

কিন্তু সংঘর্ষটা কার সঙ্গে?

সে-প্রশ্ন ভাববার সময় তখন ছিল না। জাহাজ ডুবতে বসেছে!

কিন্তু আয়ু ছিল মার্কেলের। তাই ডুবেও ডুবল না। ডুবু-ডুবু হয়ে ভাঙা জাহাজ কোনমতে ফিরে এল তীরে। ভগ্ন দশা দেখে জল্পনা-কল্পনা শুরু হল তখন থেকেই। ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে রইলেন অভিজ্ঞ নাবিকরা। মাথা নেড়ে বললেন গম্ভীরভাবে—না, আর কোনো সন্দেহ নেই। লেকের জলে সাবমেরিন আছে। জলের ওপরে গা না ভাসিয়ে ঠিক তলা দিয়ে তীরের মত ছুটোছুটি করছে। এই ডুবোজাহাজই তলা ফাঁসিয়েছে মার্কেল-য়ের।

খবরের কাগজে আবার একটা রহস্যের স্বাদ পেয়ে চনমন করে উঠল আমার রহস্য সন্ধানী মনটা। সেই সঙ্গে চিন্তার ঘূর্ণিঝড়ে তালগোল পাকিয়ে গেল বুদ্ধিসুদ্ধি!

প্রথমে এল রহস্যধূসর একটা মোটরগাড়ী। তারপর আবির্ভাব ঘটল রহস্যেঘেরা নৌকোর। এখন আসরে অবতীর্ণ হয়েছে রহস্য-কুটিল সাবমেরিন!

বৃশ্চিক দংশনের মত চিন্তার দংশনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম আমি। তবে কি ধরনের তিনটে যন্ত্রই একই উদ্ভাবকের বিস্ময়কর প্রতিভার বিকাশ?

তার চাইতেও বড় কথা, তিনটে ইঞ্জিনই কি প্রকৃত পক্ষে এক? একই ইঞ্জিনকে তিনভাবে দেখছি আমরা? ডাঙায়, জলের ওপর এবং জলের তলায়?

তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল লেকের জল। বড়-বড় জাল টেনে নেওয়া হল একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত। কিন্তু পণ্ডশ্রমই সার হল।

না। সাবমেরিনকে আর টের পাওয়া যায়নি লেকের জলে। অকস্মাৎ কেউ আর জল তোড়পাড় করেনি, জেলে ডিঙিকে ভয় দেখায় নি, জলতল থেকে ঢুঁ মেরে জাহাজের তলাও ফাঁসায় নি।

যে-রকম অকস্মাৎ আবির্ভাব সেই রকমই অতর্কিত অন্তর্ধান। থেকে গেল শুধু পর্বত প্রমাণ গুজব, অলীক রটনা। সাবমেরিন-কাহিনী শেষ পর্যন্ত কিংবদন্তী হয়ে দাঁড়াত যদি না অত্যাশ্চর্য যন্ত্রযানের আবিষ্কর্তা নিজেই সেই ঐতিহাসিক চিঠিখানা লিখতেন পৃথিবীবাসীদের উদ্দেশে!

ঘটনাটা ঘটল এইভাবে।···

সাতাশে জুন। সকাল বেলা আমার ডাক পড়ল মিস্টার ওয়ার্ডের ঘরে। জাঁকালো গালপাট্টায় হাত বুলিয়ে নিলেন মিস্টার ওয়ার্ড আমি ঘরে ঢোকবার পর। তারপর বললেন উঠে দাঁড়িয়ে—স্ট্রক, ত্রি-রূপী যন্ত্রযানের আবিষ্কারককে আবিষ্কার করতে চাও?···

সে কথা আর বলতে?

ভদ্রলোক আপাততঃ গা-ঢাকা দিয়ে থাকলেও আমার বিশ্বাস আবার তিনি দেখা দেবেন। স্ট্রক, যে-মুহূর্তে তাঁর খবর পাবে, সঙ্গে সঙ্গে ফেউয়ের মত পিছু নিতে হবে। ওয়াশিংটন ছেড়ে যখন তখন বেরিয়ে পড়ার জন্যে তৈরী হয়ে থেকো।

মিস্টার ওয়ার্ডের আদেশ মাথা পেতে নিলাম। বাড়ী এসে জিনিস

পত্র গুছিয়ে নিলাম। ইতিমধ্যে গভর্ণমেণ্ট একটা ইস্তাহার ছাপিয়ে দিল আমেরিকার সমস্ত খবরের কাগজে। অজ্ঞাত আবিষ্কারকের উদ্দেশে অনেক কথাই বলা হল সেই ইস্তাহারে।

দেশজুড়ে দেওয়ালে দেওয়ালে লটকে দেওয়া হল মূল্যবান ইস্তাহারটা। বিশ্বের ইতিহাসে এ-ধরনের বিজ্ঞপ্তির আর দৃষ্টান্ত নেই। সেই প্রথম একটা দেশের সরকার নামহীন, স্বেচ্ছায় আত্ম-গোপনকারী এক আবিষ্কারকে নরম সুরে অনুরোধ করল তাঁর যুগান্তরকারী আবিষ্কারটি গভর্ণমেণ্টকে বিক্রী করার জন্যে। সেই প্রথম লোক সমাজে অদৃশ্য এক অসাধারণ ধীমান পুরুষকে সরকারী ভাবে খোসামোদ করা হল কাগজে কাগজে বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়ে। বলা হল কি-দরে তিনি তাঁর ত্রি-রূপী যন্ত্রযান বেচবেন, তা যেন এখুনি জানানো হয়। শুধু তাই নয়, তিনি যেন আর অন্তরালে না থাকেন, প্রকাশ্যে আবির্ভূত হন।

দেশের লোক কাগজ পড়ে জানল খোদ গভর্নমেণ্টের সেই আবেদনপত্র। কত লোক ভীড় করে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে সাঁটানো বিজ্ঞপ্তি পড়ল। মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল তাদের মধ্যে। কেউ টিটকিরি দিল, কেউ নিশ্চল হল, কেউ বিস্মিত হল।

ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিশ্চয় দুজন পথচারীও সকৌতুকে পাঠ করেছিল আশ্চর্য আবেদন পত্রটি। এরাই তার কিছুদিন আগে ওৎ পেতে বসে থাকত আমার বাড়ীর বাইরে—বেরোলেই ছায়ার মত লেগে থাকত পেছনে!

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হ্যাংলামি দেখে টনক নড়ল বিশ্বের সব কটি শক্তিমান রাষ্ট্রের। সর্বনাশ! না জানি আবিষ্কারটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ! নইলে আমেরিকান গভর্নমেণ্টে এত কাকুতি মিনতি করে আবিষ্কারকের চেহারা দেখবার জন্যে? তাঁর আবিষ্কার কিনে নেওয়ার জন্যে? পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য এই যন্ত্রযানের মালিকানা মার্কিন সরকারের হাতে চলে গেলে তো মুস্কিল তাহলে। শক্তিবৃদ্ধি পাবে

আমেরিকার সামরিক বাহিনীর। পরিণামটা অনুমান করে প্রমাদ গণল অন্যান্য দেশের সামরিক হোমরা চোমরারা।

সুতরাং দিন কয়েকের মধ্যেই পৃথিবীর সব খবরের কাগজেই ছাপা হল মার্কিনী ধাঁচের আবেদন-পত্র। সব দেশেরই কর্ণধাররা গদগদ-ভাবে খোসামোদ জুড়ে দিল অজ্ঞাত বৈজ্ঞানিককে। তিনি যেন দয়া করে আত্মপ্রকাশ করেন এবং কুবের-সম্পদের বিনিময়ে তাঁর যন্ত্রযানের নক্সাটি বিক্রী করে দেন।

ফলে, রেষারেষি শুরু হয়ে গেল দেশে দেশে। গোটা পৃথিবীটা রূপান্তরিত হল একটা সুবিশাল নীলাম ঘরে এবং আজব যন্ত্রযান নীলামে উঠল সারা দুনিয়া জুড়ে! অমুক দেশ এত টাকা দিতে চায়? কুছপরোয়া নেহি' আমার দেশ দেবে তার ডবল টাকা। এইভাবে দর চড়তে লাগল হু-হু করে।

কিন্তু কোনো সাড়া এল না, রহস্যাবৃত আবিষ্কারকের তরফ থেকে।

চিঠিখানা এল তারপরেই।

ছোট্ট একটা চিঠি। পুলিশ অফিসের চিঠির বাক্সে একদিন এসে পৌছোলো মোড়া চিঠিটা।

চিঠির বয়ান অতিশয় উদ্ধত। দাম্ভিক আবিষ্কারক সদম্ভে জানিয়েছেন, তিনি কে এবং কি তাঁর অভিপ্রায়। ছত্রে ছত্রে বিস্ফুরিত হয়েছে তাঁর অপরিমেয় শক্তির অহমিকা!

চিঠিখানা এই :

'আতংক নামক যন্ত্রযানের ডেক থেকে প্রবীণ এবং নবীন পৃথিবীর উদ্দেশে এই চিঠি লেখা হচ্ছে।

আমার আবিষ্কারের যে ক্রয়মূল্য ধার্য করা হয়েছে, তাতে আমি পদাঘাত করছি। আবিষ্কারটা আমার, আমার-ই থাকবে। এবং একে আমি যেভাবে খুশী কাজে লাগাবো। এই আবিষ্কারের দৌলতেই ত্রিভুবন আজ আমার পদানত। চিঠি সই-ও সেইভাবে :

'মাস্টার অফ দি ওয়ার্ল্ড'

চিঠিখানায় হুবহু ব্লক করে ছাপিয়ে দেওয়া হল সব খবরের কাগজে। আমি প্রাতরাশ খেতে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছি চিঠির প্রতিটি পংক্তি, এমন সময়ে চমকে উঠলাম ভূত দেখবার মত!

হাত চিঠির হস্তাক্ষর আমি চিনি। এই হাতেই একটা চিঠি লেখা হয়েছিল আমাকে। ভয়-দেখানো সেই চিঠির লেখক আমাকে হুমকি দিয়েছিল, গ্রেট ঈরীর দিকে ফের যদি পা বাড়াই ফলাফলটা ভাল হবে না।

একই লোক লিখেছে এই চিঠিটাও। অর্থাৎ ফ্যানটাসটিক এই মেশিনের আবিষ্কর্তা, 'আতংক' নামক যন্ত্রযানের কম্যাণ্ডার স্বয়ং আমাকে ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু কেন? গ্রেট ঈরীর পেটের ভেতরে হঠাৎ এক রাত্রে ভুতুড়ে কাণ্ড আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল যেন। রাতারাতি তল্লাট ছেড়ে চম্পট দিয়েছিল বাসিন্দারা। কারণটা অনুসন্ধান করার ভার পড়েছিল আমার ওপর। পাছে গ্রেট ঈরীর অভ্যন্তরে পা দিয়ে তা জেনে ফেলি, তাই ধমকানো হয়েছিল আমাকে। কিন্তু সে-সবের সঙ্গে ভয়ানক শক্তিশালী এই যন্ত্রযানের কি সম্পর্ক?

ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে গেল আমার। চিঠি নিয়ে দৌড়োলাম মিষ্টার ওয়ার্ডের কাছে। তিনি গ্রেট ঈরী সম্পর্কিত হুমকি পত্র আর 'আতংক'র ডেক থেকে লেখা দম্ভ-পত্র দুটো পাশাপাশি রেখে চুলচেরা বিচার করলেন।

তারপর পাইপ কামড়ে ধরে অনেকখানি তামাক পুড়িয়ে রাশি-রাশি ধোঁয়া সৃষ্টি করলেন।

সব শেষে বললেন—'হুম! একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল, ষ্ট্রক। গ্রেট ঈরীর ভেতরে যন্ত্রযান তৈরীর কারখানা বানিয়ে ছিলেন 'আতংক'র মালিক এই জগদীশ্বর ভদ্রলোক। মালপত্র সব রেখে-ছিলেন পাহাড়ের ভেতরে।'

কিন্তু কি করে, মিষ্টার ওয়ার্ড, কি করে? অসহিষ্ণু—কণ্ঠ আমার।

'মানুষ যেখানে পাহাড়-চড়ার সরঞ্জাম নিয়েও পিছনে নেমে আসে—অত মালপত্র সেখানে উঠল কি করে? যন্ত্রযানটাই বা তৈরী হওয়ার পর সেখান থেকে বেরিয়ে এল কি করে?'

'উড়ে।'

'অ্যাঁ।'

'উড়ে।'

'অ্যাঁ?'

'উড়ে, স্টুক, উড়ে,' বলে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন মিষ্টার ওয়ার্ড। ত্রিভুবন এখন যাঁর পায়ের তলায়, সেই তিনি নিশ্চয় তাঁর আজব যন্ত্রযানে ডানাও লাগিয়ে নিয়েছিলেন—যাতে দরকার হলে গ্রেট ঈরীর পেটে ঢুকে বিশ্রাম নেওয়াও যাবে মাঝে মাঝে!'

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম!

'দুনিয়াধিপতি'র এই একখানা চিঠিই দেশ জুড়ে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি করল। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধাপে ধাপে তুঙ্গে চড়তে লাগল উত্তেজনার মাত্রা।

শেষকালে পরিস্থিতি এমন ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল যে সরকারের তরফ থেকে ঔদ্ধত্যের পালটা জবাব দিতেই হল। নইলে জনগণকে আর বাগে রাখা যায় না!

চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে তাই নোটিশ জারী করল আমেরিকান গভর্নমেন্ট।

বিজ্ঞপ্তিটি এই:

এ-হেন পরিস্থিতিতে আমি এক পা বাড়িয়ে বসে আছি বাড়িতে মিষ্টার ওয়ার্ডের হুকুম পেলেই ছুটব। অবশেষে তিনি ডেকে পাঠালেন আমাকে। দুরু দুরু বুকে ছুটলাম তাঁর দপ্তরে। উনি দরজায় দাঁড়িয়েই সংক্ষেপে বললেন—স্টুক, একঘণ্টার মধ্যে বেরোতে হবে।

'কোথায়?'

'টোলেডো। ইরি লেকে দেখা গেছে যন্ত্রটা।

'চললাম তাহলে।'

'এসো' বলতে বলতে যেন পালটে গেলেন মিষ্টার ওয়ার্ড। বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেল তাঁর কড়া গলায়—স্টিক, এবার সফল হতেই হবে।

ছুজন সহকারী পেয়েছিলাম এই গুরুদায়িত্বে। তাদের নাম জন হার্ট আর স্যাব ওয়াকার। তিনজনে মিলে টোলেডো পৌঁছোতেই দেখা হল আর্থার ওয়েলস্-সঙ্গে পূর্ববাবস্থা মত।

শুধোলাম আমি—'খুব দূর নাকি?'

'বিশ মাইল,' বলল ওয়েলস্। 'জায়গাটার নাম ব্ল্যাক রক ক্রীক!'

হোটেলে বাক্স, বিছানা ফেলে বেরিয়ে পড়লাম ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে। লক্ষ্য করলাম বিস্তর খাবার দাবার নিয়েছে ওয়েলস্। অথচ মুখে বলছে যেতে হবে মাত্র বিশ মাইল।

তাই শুধালাম—'এত খাবার কি হবে? এতো দিন কয়েকের রসদ।'

ঠিক। এ-অঞ্চলে ব্ল্যাক রক ক্রীকের মত তুর্গম বনজঙ্গল পাহাড়-পর্বত ঘেরা জায়গা আর ছটি নেই। খিদে পেলে সরাইখানা পাবেন না, ঘুম পেলে ঘর পাবেন না। সুতরাং তৈরী হতে হয়েছে সেইভাবে।

'খুব বেশদিন পাহাড়ে পর্বতে ঘোরার দরকার হবে না যদিও,' বললাম আমি। 'আচমকা গিয়ে পড়লে পালাবার পথ পাবে না, 'আতংক'-র কম্যাণ্ডার—ধরা দিতেই হবে। আর যদি না ধরতে পারি, যদি ভদ্রলোক হাত ফসকে উধাও হন—তাহলে এ অঞ্চলের অন্ততঃ তাঁর টিকি দেখা যাবে না আর!'

ঘর্ঘর শব্দে ধূলো উড়িয়ে ছুটে চলল ঘোড়ায় টানা গাড়ী।

আমি শুধোলাম—'আতংক-কে আপনি দেখেছেন?'

'হ্যাঁ। ছদিন আগে ঘোড়ায় চেপে আসছিলাম জঙ্গলের মধ্যে

দিয়ে। খাড়ির জলে ভাসছিল অদ্ভুত চেহারার একটা সাবমেরিন। বিদঘুটে চেহারা মশাই, নিজের চোখেই দেখবেন চলুন—বললে কি প্রত্যয় হবে ?···

'তা তো যাচ্ছিই। কিন্তু এই দুদিনের মধ্যে সাবমেরিন কি আর সেখানে আছে ? লম্বা দিয়েছে অন্য কোথাও।'

গোঁফে হাত বুলিয়ে ওয়েলস্ বললে—'আছে কিনা, তা এখুনি দেখতে পাবেন। আমার মনে হয় থাকবে। কেননা, গতকাল জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ফেরবার সময়ে একই জায়গায় ভাসতে দেখেছি মেশিনটাকে। আমার বিশ্বাস, চোট খেয়েছে ইঞ্জিন। তাই মেরামতের জন্যে অমন একটা দুর্গম জায়গায় মেশিন আনা হয়েছে, যেখানকার পাহাড় জঙ্গলে কেউ বড় একটা ঢুকতে চায় না। জায়গাটা এমনিতেই খুব নিরিবিলি। সাবমেরিন থেকে অনেক জিনিসপত্র তীরে নামানো হয়েছে দেখলাম—ছড়িয়ে রাখা হয়েছে এলোমেলো-ভাবে···কলকব্জা বিগড়োলে যা হয় আর কি !'

সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ গাড়ী পৌঁছোলো তীরভূমির কিনারায় ঘন জঙ্গলে, হুঁশিয়ার ওয়েলস কিন্তু সেখানে থামল না। গাড়ী নিয়ে গেল আরও গভীর বনে।

বলল—'গাড়ী এখানে থাকুক। কারো চোখে পড়বে না। আর একটু অন্ধকার হলেই হেঁটে খাড়ির মুখে যাবে 'খন।'

গাড়োয়ান ঘোড়া নিয়ে লুকিয়ে রইল জঙ্গলের মধ্যে। আমরা একটা খোলা জায়গায় বসে খেয়ে নিলাম। অন্ধকার গাঢ় হতেই ডাক দিলাম ওয়েলস্‌কে—ওঠা যাক।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম জঙ্গলের প্রান্তে। সামনে বড় বড় পাথরের চাঁই ছড়ানো। ব্ল্যাকরক ক্রীক-এর পাড়ভূমি শুরু হয়েছে এখান থেকেই।

কিন্তু কেউ কোথাও নেই। রাতের আঁধারে দাঁড়িয়ে কেবল আমরা চারজনে। পেছনে জঙ্গল, সামনে লেক।

ওয়েলস্ অবশ্য বললে—'দেখুন-ইনা কি হয়।'

পায়ে-পায়ে এগোলাম সামনে। পাথর টপকে প্রাণটাকে হাতে করে নামতে হল নীচের দিকে। মিনিট কয়েকের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম হ্রদের তীরে। গাঢ় অন্ধকারে ছলছলাৎ শব্দে জল আছড়ে পড়ছে পায়ের কাছে।

কিন্তু জনপ্রাণী নেই আশে পাশে—ডুবোজাহাজ তো দূরের কথা!

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওয়েলস্। আমার অবস্থাও তথৈবচ। জন হার্ট আর নাব ওয়াকার—পা টিপে-টিপে অন্ধকারে গা মিশিয়ে খাড়ির পাড় বরাবর ঘুরে এল বেশ কিছুদূর। উধাও হওয়ার সময়ে জমির ওপর তু' একটা সূত্র হয়ত ফেলে গেছে সাবমেরিন কমাণ্ডার। কিন্তু তন্ন তন্ন করে খুঁজে খালি হাতে ফিরল ত্বজনে।

আমাদের তখনকার মনের অবস্থা অবর্ণনীয়!

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম পায়ের কাছে জল যেন ফুলে উঠছে। জলের মধ্যে যেন একটা আলোড়ন চলছে। জল ঠেলে উঠছে পাহাড়ের গা দিয়ে। 'ঠিক যেন নৌকো যাচ্ছে।'

'ফিসফিস করে উঠল ওয়েল্স্—' দেখছেন না জল ফুলে উঠে আছড়ে পড়ছে।

'কিন্তু নৌকোটা কোথায়? জলের ওপরে?'

'উঁহু। ধাক্কাটা আসছে জলের তলা থেকে।'

নিঃশব্দে নিস্পন্দ দেহে দাঁড়িয়ে রইলাম চারজনে। ইতর প্রাণীরা নাকি অন্ধকারেও দেখতে পায়। আমরাও চেষ্টা করলাম উৎকণ্ঠা-টনটনে সেই মুহূর্তে ইতর প্রাণী হতে: অন্ধকারে দৃষ্টি চালনার প্রাণপণ চেষ্টা করলাম! কানের পর্দাকে যতদূর সম্ভব সজাগ করার প্রয়াস পেলাম রন্ধ্রহীন অন্ধকার আর নৈঃশব্দের মাঝে চোখ আর কান তুটোই টনটনিয়ে উঠল—লাভ কিছুই হল না।

হঠাৎ...নেহাৎই হঠাৎ আমার কেন জানি মনে হল একটা ধুক-

ধুক ধুক-ধুক তরঙ্গ অনুভব করছি বায়ুমণ্ডলে কোথায় যেন নিয়মিত ছন্দে ঢেঁকির পাড় পড়ছে···ইথারের মধ্যে দিয়ে সেই আলোড়ন-ই এসে আছড়ে পড়ছে আমার সত্তায়।

'নৌকো! নৌকো!' আচমকা ফিস ফিস করে উঠল ওয়েলস্।

নিরেট অন্ধকারের মধ্যে আরো নিরেট একটা অন্ধকার দেখলাম যেন। মনে হল আঁধারে গড়া একটা বিশাল দেহ সহসা আবির্ভূত হল আঁধার-পুরী হতে।

কয়েকটা মিনিট দমবন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলাম বললেই চলে। জমাট অন্ধকারটা মনে হল প্রস্তরময় তীরভূমিতে এসে ভিড়েছে—ঠিক যেন জেটিতে নৌকো লেগেছে।

বাতাসের সুরে সুর মিলিয়ে বলল আর্থার ওয়েল্স্—'এখানে থাকা আর নিরাপদ নয়।'

'জানি' সায় দিলাম আমি। ওরা দেখে ফেলতে পারে। চলুন পাহাড়ের ফাটলে গিয়ে গা-ঢাকা দিই।'

বালির পাড় ছেড়ে পিছু হটে এলাম আমরা। বড় বড় পাথরের চাঁই ছোট ছোট টিলার আকারে উঠে গেছে বনের প্রান্ত পর্যন্ত। আমরা গিয়ে ঘাপটি মেরে রইলাম সেই সব শিলাস্তূপের আড়ালে।

নৌকোর ওপর খস্ খস্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ডেকের ওপর কে যেন এক গোছা দড়ি ছুঁড়ে দিল বালুকাবেলার ওপর। ডেক থেকে নিশ্চয় কেউ লাফিয়ে নেমে পড়েছিল বালির ওপর। দড়িটা সে-ই ধরে নিলে সম্ভবতঃ পাহাড়ের খাজে আঁকশি আটকানোর জন্যে।

একই সঙ্গে বালির ওপর মচ্ মচ্ আওয়াজ শুনলাম। কারা যেন হেঁটে আসছে প্রস্তর স্তূপের দিকে · বালি সরে সরে যাচ্ছে তাদের পায়ের তলায়···নিস্তব্ধ রাত্রে খপ খপ শব্দটা জুতোর মচ মচানির সঙ্গে মিলে গিয়ে অদ্ভুত শোনাচ্ছে।

নিশীথরাতের আগন্তুকরা এগোচ্ছে বনের দিকে।

'বলুন এখন কি করব?' নির্দেশের অপেক্ষায় আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল আর্থার ওয়েলস্।

'চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখব' বললাম আমি। 'ওরা যখন ফিরবে, তখন…'

কথাটা শেষ করতে পারলাম না এমন চমকে উঠলাম। আততায়ী দুজনের একজনের হাতে লণ্ঠন জ্বলে উঠেছিল। হঠাৎ সেই লণ্ঠনের আলোর দিকে মুখ ফেরালো অন্যজন।

এ-মুখ আমার চেনা! বাড়ীর সামনে যারা ওৎ পেতে বসে থাকত, রাস্তায় বেরোলেই যারা স্পাইয়ের মত পেছন নিত—এ-লোকটা সেই দুজনের একজন।

মার্জারের মত নিঃশব্দচরণে পিলার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এলাম আমি। প্যান্থারের মত শব্দহীন গতিবেগে নেমে গেলাম নীচে—জেটির উপর।

পাহাড়ের গায়ে দড়ি বাঁধা অবস্থায় নিঃশব্দে ভাসছে আতংক। কিম্ভূত কিমাকার গড়নের একটা কালো দেহ। সামনের দিকে বড় বড় দুটো চোখ দানবের চোখ যেন…আবছা আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে চোখের ভেতর থেকে। সারি সারি কয়েকটা গবাক্ষ দেখা যাচ্ছে। কেবিনের জানলা নিশ্চয়। জ্বলছে ভেতরে।

পেছন থেকে ওয়েলস্-এর মৃদু ডাক কানে এল। ওরা ফিরছে! পিছু হটে এলাম আমি। আততায়ী দুজন জেটির ওপর দাঁড়িয়েছে। দুজনের হাতে দু বাণ্ডিল কাঠ।

'হ্যালো ক্যাপ্টেন!' ডাকছে একজন। ডেক থেকে সাড়া এল।

'আর একটু হলেই বিপদ ডেকে এনেছিলেন আর কি', কানে কানে বলল আর্থার ওয়েলস্—'ওরা তো দেখছি তিনজন।'

'চারজন হতে পারে; বললাম আমি—পাঁচজন কি ছজন হলেও অবাক হবার কিছু নেই।'

বালির ওপর দাঁড়িয়ে একজন নৌকো আরো কাছে নিয়ে আসার নির্দেশ দিলে। মরাল ভঙ্গিমায় প্রস্তর জেটির গা-ঘেঁষে দাঁড়াল ঘনীভূত ছায়াটা।

কাঠের বাণ্ডিল ছুটো ডেকের উপর চালান করে দিয়ে একজন বললে ক্যাপ্টেনকে—'আর একবার গেলেই সব কাঠ উঠে আসবে 'আতংক'র ডেকে।'

"ভালই হল। কাল ভোরের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়া যাবে'খন" ডেকের ওপর অন্ধকারে গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে বলল ক্যাপ্টেন।

চুপি চুপি বললাম সঙ্গীদের—'ওদের মতলবটা এবার বোঝা গেল। কাঠের গাদা 'আতংক'র ওপর তোলা শেষ হলে ওরা ফিরে যাবে যন্ত্রযানের ভেতরে। খেয়েদেয়ে ঘুমোবে ভোর না হওয়া পর্যন্ত। আমরাও সেই সুযোগে চড়াও হব—ঘুম ভাঙবার আগেই কাবু করব সব ক'জনকে।

প্ল্যান মনে ধরল সাঙ্গপাঙ্গদের। ইতিমধ্যে লণ্ঠন হাতে আগন্তুক ছুজন ফের প্রবেশ করেছে জঙ্গলের মধ্যে। আমরা সজাগ রইলাম!

তিন সঙ্গীকে হুকুম দিলাম, রিভলবার তৈরী রাখতে। ছুর্ধর্ষ শত্রুদের সঙ্গে লড়তে যাচ্ছি। রিভলবারই আমাদের একমাত্র ভরসা।

অসহ্য উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটল পাঁচটা মিনিট। আচমকা একটা অঘটন ঘটল।

নিস্তব্ধ রাত্রি। ধড়ফড় করে উঠল অশ্বখুর ধ্বনিতে। সেই সঙ্গে হ্রেষারব চিঁহি চিঁহি চীৎকারে স্তব্ধতা খান খান করে, টকবগ টকবগ শব্দে নীরব নাটিকার সমস্ত নাটকীয়তা চুরমার করে দিয়ে পালাচ্ছে ঊর্ধ্বশ্বাসে!

আমরা সচকিত হতে না হতেই বন থেকে জ্যামুক্ত তীরের মত ছিটকে বেরিয়ে এল ছুটি মূর্তি। 'আতংক'র ছুই আরোহী। প্রাণপণে ছুজনে ছুটছে জেটির দিকে!

বুঝলাম কী হয়েছে। বনের মধ্যে থেকে কাঠ জড়ো করতে গিয়েছিল দুই আগন্তুক। জঙ্গলে লুকোনো আমাদের গাড়ীঘোড়ার আড্ডার সন্ধান পেয়ে ভয়ের চোটে দৌড়োচ্ছে 'আতংক' অভিমুখে!

আমি রিভলবার উঁচিয়ে ধেয়ে গেলাম সামনে—পেছনে আমার সঙ্গীরা। ওরা দুজন মরিয়া হয়ে দৌড়োচ্ছে, সুবিশাল পাথরের ওপর থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে—পা ফসকালেই মারাত্মক জখম হওয়ার সম্ভাবনা আছে জেনেও দৌড়োচ্ছে ক্ষিপ্তের মত।

আচম্বিতে ওদের একজন রিভলবার তাগ করল আমাদের দিকে। বনভূমি কেঁপে উঠল গুলিবর্ষণের শব্দে। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে পা খামচে ধরল জন হার্ট, বুলেট ওর পায়ে লেগেছে।

আমাদের রিভলবারও চুপ করে রইল না। চমকে চমকে উঠল রাতের নৈঃশব্দ। অন্ধকারের বুকচিরে ছুটে গেল পর পর অগ্নিরেখা। কিন্তু বৃথাই বৃথাই। ছুটন্ত অবস্থায় লক্ষ্যস্থির করতে পারলাম না। সামনের দুজনের গায়ে আঁচড়টিও লাগল না।

ওরা পৌঁছে গেছে জলের ধারে। পাহাড়ের খাঁজে আটকানো আঁকশি তোলবার চেষ্টা না করে সটান ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে। সেকেণ্ড কয়েকের মধ্যেই আঁকড়ে ধরল 'আতংক'র ডেক। হাঁচর-পাঁচর করে ওরা ডেকে উঠছে।

ওদের ক্যাপ্টেন বাঘের মত লাফিয়ে এসেছে সামনে। আমাদের গুলিবর্ষণের সামনে দাঁড়িয়েছে নির্ভীকভাবে। রিভলবার নামিয়ে তাগ করল! পরমুহূর্তে আগুন ঝলসে উঠল নলের মুখে।

ওয়েল্‌স্ চেঁচিয়ে উঠেছে। তপ্ত সিসের বুলেট ওকে ঘষটে বেরিয়ে গিয়েছে।

রিভল্‌বার ছোড়ার আর সময় নেই। হাতের কাছে আঁকসির কাছি পেলাম। চারজনে মিলে কাছি ধরে প্রাণপণে টেনে আনতে লাগলাম বিপুলায়তন কৃষ্ণবর্ণ বস্তুটিকে।

ওয়েল্‌স্‌ রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল—'ওরা কিন্তু রশি কেটে পালাতে পারে।'

কিন্তু তার আর দরকার হল না।

আচমকা হ্যাঁচকা টানে পাথরের খাঁজ থেকে উপড়ে এল লোহার আঁকশি। অনেকগুলো হুকের একটা হুক আটকে গেল আমার কোমরবন্ধনীতে। আতংকে চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল আমার। অনুভব করলাম, বিপুল বেগে হিড়হিড় করে বালির ওপর দিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে কাছি—কাছির পেছনে বৃহদাকার 'আতংক!'

'আতংক'র সবকটা ইঞ্জিন বুঝি চালু হয়ে গিয়েছিল একযোগে। মহাশক্তির আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটেছিল যেন তার চলার বেগে—মত্ত প্রভঞ্জনও বুঝি হার মেনে যায় তার নক্ষত্র-গতির কাছে—

নিমেষ মধ্যে বালির ওপর থেকে গিয়ে পড়লাম লেকের জলে। ব্লাকরক ক্রীমের জল কেটে বুঝি উড়ে চলল খ্যাপা 'আতংক'! কাছির শেষ প্রান্তে আঁকশিতে আটকে রইলাম আমি- জন স্ট্রক।

জলের ধারায়, নাকে মুখে জলের প্রচণ্ড ঝাপটায় নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না। কিছুক্ষণের মধ্যেই চৈতন্য লোপ পেল অবশ্য। রেহাই পেলাম যন্ত্রণাময় অসহ্য অভিজ্ঞতার হাত থেকে।

চেতনা ফিরে পেয়ে দেখলাম অদ্ভুত একটা কেবিনের মধ্যে শুয়ে আছি আমি।

কেবিনটা মডার্ণ, সুসজ্জিত। পোর্টহোল পুরু কাঁচ দিয়ে ঢাকা সূর্যের আলো কাঁচের মধ্যে দিয়ে আলোকিত করে তুলেছে ছোট্ট প্রকোষ্ঠ।

এ-আমি কোথায় এলাম? কে আমাকে আনল এখানে? বুঝেছি। 'আতংক'র টানে নাকানি চোবানি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর কোনো সহৃদয় ব্যক্তি আমাকে উদ্ধার করেছেন। আমার

গায়ে চোট নেই। জখমের কোনো দাগ নেই। শুধু-যা বড্ড কাহিল। উঠে বসতেই মাথা ঘুরে গেল অবসাদের জন্যে।

তবুও উঠে বসলাম। বেতের চেয়ারে পাট করে কে যেন রেখে গিয়েছিল আমার শুকনো জামাকাপড়। টলতে টলতে নামলাম বাঙ্ক থেকে। মাথার ওপরে একটা গোলাকার 'হ্যাচ' লক্ষ্য করলাম। পোষাক পরে 'হ্যাচ' ওপর দিকে ঠেলে তুললাম। মুখ বাড়িয়ে দেখলাম ধাতুর রেলিং দেওয়া একটা ডেক। জলের ওপর দিয়ে তর তর করে চলেছে বিশাল জলযান।

উঠে এলাম ডেকে। কোথায় আমরা? এই দুজনকেই দেখেছিলাম ব্লাকরক ক্রীকের পাথর টপকে-টপকে ওঠা নামা করতে। এদের একজন টেলিস্কোপ দিয়ে দিগন্ত পর্যবেক্ষণ করছিল।

আমি কাছে গেলাম! ডাকলাম—ক্যাপ্টেন?

লোকটা আমার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল। তন্ময় হয়ে দিগন্ত দেখতে লাগল দূরবীণ দিয়ে। আমি দেখলাম, লোকটা কথা কইতে নারাজ। তখন পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম গলুইয়ের দিকে।

সেখানে হাল ধরে বসেছিল আর এক ব্যক্তি। খোলা জায়গায় অবশ্য নয়। একটা ধাতুর ঘর। চারদিকে পুরু কাঁচের জানলা। বুঝলাম ঐটেই আতংকর কন্ট্রোলকেবিন। আমি সামনে যেতেই লোকটা ভেতর থেকে হাত নেড়ে আমাকে সরে যেতে বলল!

কি আর করা যায়, কেউ যখন কথা বলবে না, তখন একা-একা ঘুরে দেখা যাক আশ্চর্য যন্ত্রযানকে।

প্রথমেই খটকা লাগল আজব যানের ধাতু দেখে। একটা নতুন ধরনের ধাতুর চাদর দিয়ে মোড়া গোটা 'আতংক'। এ-ধরনের ধাতু আমি কোনদিন দেখিনি নামও শুনিনি।

ডেকের ওপর সাজানো পর পর হ্যাচ। মাঝের 'হ্যাচ' খুলে দেখলাম নীচে একটা ঘর। ইঞ্জিনঘর। হরেক রকম ইঞ্জিন চলছে নিয়মিত ছন্দে—কিন্তু প্রায় নিঃশব্দে! এ-মেশিন তো স্টীম বা পেট্রল

চালিত নয়! নিশ্চয় বিদ্যুৎচালিত! ইলেকট্রিসিটি বানানো হচ্ছে 'আতংক''র মধ্যেই।

যন্ত্রযানের বাইরের নক্সাটা নিঃসন্দেহে নতুন ধরনের। এ ধরনের প্ল্যান যে ইঞ্জিনিয়ারের মগজে আসে, তাঁর মৌলিক প্রতিভা সম্পর্কে দ্বিমত থাকতে পারে না।

হঠাৎ দেখলে মনে হবে যেন কিম্ভূতকিমাকার একটি জল দানব ছুটছে জল কেটে। বান মাছের মত সরু ছুঁচোলো মুখ। মাছের মুড়োর মত মাথা—সেখানে মস্ত সাইজের একজোড়া চোখ। আসলে তা চোখ নয়—পুরু কাঁচে ঢাকা সার্চলাইট। সরু ছুঁচালো মুখটা আসলে একটা সূচগ্র খড়্গ—সামনে যে পড়বে, তার আর রক্ষে নেই। পেছনে ঈষৎ উঁচু কণ্ট্রোল-টাওয়ার। তারও পেছনে মাছের লেজের মত পাখনাযুক্ত প্রান্ত দেশ। মোটামুটি গড়নটা দানবিক মাছের মত। সেই জন্যেই বোধ হয় অমন স্বচ্ছন্দ গতিতে মৎস্য সম্রাটের মত ধেয়ে চলেছে 'আতংক'।

ডেকের সামনের গলুই আর পেছনের গলুইতে অনেকগুলো 'হ্যাচ' অর্থাৎ ধাতুর ঢাকনি। কেবিনে যেতে হলে এই সব 'হ্যাচ' দিয়ে নামতে হয়। মামুলী জাহাজে যা-থাকে অর্থাৎ দড়ি-দড়া, পাল—মাস্তুলের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। সামনের গলুইয়ের দিকে পেরিস্কোপের খানিকটা ডগা দেখা যাচ্ছে। দু'পাশে ভাঁজ করা রয়েছে ডানার মত কি-যেন।

এই শেষের জিনিসটাই বড় ভাবিয়ে তুলল আমাকে। 'আতংক'র ডান পাশে আর বাঁ-পাশে প্রকাণ্ড আকারের চ্যাপ্টা মত কি-যেন রয়েছে ভাঁজ অবস্থায় তা সাপ্টে রয়েছে যন্ত্রযানের গা-বরাবর। যেন ভাজ খুললেই তা দুপাশে মেলে ধরবে নিজেদের।

ক্যাপ্টেন কখন ডেকে উঠবে, সেই পথ চেয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলাম আমি! একটা ভাবনাই রইল সবার ওপরে। 'আতংক' থেকে চম্পট দিতে পারবো তো? যদিও না পারি'

পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য এই যন্ত্রযানের গুপ্তরহস্য না জেনে পালানো ঠিক হবে কি ?

যাঁর পথ চেয়ে বসে থাকা ডেকের ওপর তাঁর দর্শন মিলল বেলা ছুটো নাগাদ। আমি অবশ্য তাঁকে দেখেই চিনলাম। যে দুজন গুপ্তচর মোতায়েন ছিল আমার বাড়ির সামনে— ইনি তাদের একজন।

জাহাজের কন্ট্রোল কেবিনে উনি গেলেন। জটিল যন্ত্রপাতি ঠাসা ছোট্ট ধাতব প্রকোষ্ঠে দাঁড়িয়ে ধরলেন হালের চাকা। ভদ্রলোকের মুখভাব বেশ কঠোর, তীক্ষ্ণ চাহনি লালচে দাড়ি।

ভদ্রলোক আমার সামনে দিয়েই গেলেন, কিন্তু আমার পানে ফিরেও তাকালেন না। আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম কন্ট্রোল কেবিনে, উনি দেখলেন না।

তবুও আমি শুধোলাম—আপনিই ক্যাপ্টেন ?

জবাব নেই।

'কি করতে চান নিয়ে ?' আবার শুধোলাম।

এবারও জবাব দেওয়ার মত সৌজন্য দেখালেন না ধীমান মানুষটি। রাগে পিত্তি পর্যন্ত জ্বলে গেল আমার। অতিকষ্টে সামলে নিলাম নিজেকে। আমার কেবিনের যেখানে হ্যাচ, সেইখানে বসে চুপ করে চেয়ে রইলাম দিগন্ত পানে।

চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনটা খচ্ করে উঠল। আচ্ছা, 'আতংক' তো দিব্বি ছুটছে। যে গতিবেগে যাচ্ছে, সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে যাবে নায়গ্রা নদীর কাছে। ইরি লেকের শেষ সেইখানেই। কিন্তু এ-যন্ত্র যান যত দুর্মদ-ই হোক না কেন, জলপ্রপাতের মধ্যে পড়লে খড়কুটোর মত ভেসে যাবে !

অথচ তরতর করে জল কেটে সেইদিকেই ধেয়ে চলেছে 'আতংক' !

গেল আরো কয়েকটা ঘণ্টা। আমি চুপচাপ বসেই আছি। 'বাফেলো' এসে গেলো বলে। এমন সময়ে অনেক দূরে, লম্বা ধাঁচের ছুটো স্টীমারের দিকে আঙুল তুলে দেখাল 'আতংক'র ছুই নাবিক।

স্টীমারের চেহারা দেখেই বুঝলাম, সাধারণ জলপোত নয়—টর্পেডোধ্বংসী স্টীমার। আর্থার ওয়েল্‌স্ ঝটিতি খবর পাঠিয়েছে কর্তৃপক্ষকে। আমি হুকের টানে ভেসে যেতেই নিশ্চয় টোলেডো ফিরে গিয়ে রণপোত লেলিয়ে দিয়েছে আতংক'র পেছনে!

মাইল তুয়েক তফাতে এসে স্টীমার তুটো তুদিক চলে গেল। ওরা যেন 'আতংক'কে তুপাশে থেকে আক্রমণ করতে চায়। ক্যাপ্টেন বাধা দিলেন না। আরো এগিয়ে আসতে দিলেন তাদের। তারপর টান দিলেন একটা হাতল। দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেল আতংকর স্পাড—প্রপেলারের প্রচণ্ড ধাক্কায় যেন লাফ দিয়ে ধেয়ে গেল লেকের ওপর দিয়ে।

বাঁ দিকের ডেস্ট্রয়ারের ডেকে একতাল ধোয়া লাফিয়ে উঠল। আতংক'র সামনে দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে অদূরে বিস্ফোরিত হল একটা ক্ষেপণাস্ত্র।

ঠিক তখনি আমাকে ঠেলেঠুলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল আমার কেবিনে। বন্ধ হল মাথায় ওপরকার হ্যাচ! অনুভব করলাম ধক-ধক করে চলছে যন্ত্রপাতি।

মাছের মতই জলে ডুব দিয়েছে 'আতংক'।

বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে জল কেটে চললাম। মিনিট দশেকও যায়নি হঠাৎ টের পেলাম ডেকের ওপর যেন একটা গোলমাল চলছে। ধক-ধক করে স্পন্দমান কলকব্জাগুলোর তাল কেটে যাচ্ছে—ছন্দপতন ঘটছে কোথাও।

চমকে উঠলাম। অ্যাকসিডেন্ট নাকি? তাহলে তো জলের ওপরেই ফের ভেসে উঠতে হয়।

না, ভুল হয়নি আমার। অবিলম্বে জলপৃষ্ঠে ভেসে উঠল আতংক। খুলে গেল হ্যাচ। আমি সিঁড়ি বেয়ে লাফিয়ে উঠে এলাম ডেকের ওপর।

ডেস্ট্রয়ার তুটো পেছন ছাড়েনি। গল-গল করে ধোয়া বেরোচ্ছে চিমনী দিয়ে। বেগে ছুটে আসছে 'আতংক' অভিমুখে।

সামনে দেখা দিয়েছে নায়গ্রার বিস্তার। শোনা যাচ্ছে সুগভীর গর্জন। জলপ্রপাতের নির্ঘোষ।

মাষ্টার অফ দি ওয়ার্ল্ড কি বিকৃত মস্তিষ্ক? বিপজ্জনক এই জলধারার মধ্যে ছুটে যাওয়া মানে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে বরণ করা। আর বড় জোর আধ ঘন্টা। তারপরেই জলপ্রপাত টেনে নেবে 'আতংককে' খল-খল অট্টহাসি দিয়ে।

ডেস্ট্রয়ার আর বেশী দূরে নেই। 'আতংকর' ক্যাপ্টেনের তা নিয়ে মাথাব্যথাও নেই।

ব্যাপার কী? ডেস্ট্রয়ারের সাধ্য নেই আর এগোনোর। এরপর পেছন নেওয়া মানেই আতংক-সঙ্কেত জলপ্রপাতের দুনিবার টানের মধ্যে গিয়ে পড়া।

রোমাঞ্চ দেখা দিল আমার সর্বাঙ্গে।

ডেস্ট্রয়াররা থেমে গিয়েছে। কামানের কয়েকটা গোলা শন্-শন্ করে বেরিয়ে গেল 'আতংক'র নীচু ডেকের ওপর দিয়ে।

আর মাত্র কয়েক মিনিট···তারপরেই নায়গ্রার মধ্যে খড়কুটোর মত ভেসে যাবো আমরা।

আমি লাফিয়ে উঠলাম। ডেক-থেকে লাফিয়ে পড়তে গেলাম লেকের জলে। কিন্তু ওদের একজন আমাকে পেছন থেকে আঁকড়ে ধরল সাঁড়াশির মত বাহু পাশে।

আচমকা 'আতংক'র দুপাশে ভাঁজ করা চাপ্টা পাতগুলো ফটাস করে খুলে গেল···যেন ডানা মেলে ধরল ডাইনে-বাঁয়ে। এবার জল-প্রপাতের কিনারায় পৌঁছেই নিঃশব্দে জল থেকে শূন্যে উঠে পড়ল 'আতংক'।

সর্বনাশ। আশ্চর্য এই যন্ত্রযান তাহলে একাধারে মোটর গাড়ী নৌকো, সাবমেরিন আবার উড়োজাহাজ। জলস্থল, অন্তরীক্ষ— ত্রিভুবন তার পায়ের তলায়।

পাখীর মত ব্যোমমার্গে উড়ে চলল 'আতংক'। অনেক নীচে

মিলিয়ে গেল। আধ ঘণ্টা পরে আমি ঘুমিয়ে কাদা হলাম। আমার মনে হয় খাবারের সঙ্গে বুঝি ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কুম্ভকর্ণ নিদ্রাভঙ্গ হওয়ার পর টের পেলাম, 'আতংক' চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। না আছে নড়াচড়া, না আছে ইঞ্জিনের শব্দহীন ধক-ধক ছন্দ।

'হ্যাচ' তুলে বেরোতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না। ওপর থেকে এঁটে দেওয়া হয়েছে ঢাকনি।

বুঝলাম না ক্যাপ্টেনের অভিসন্ধি কি। পুণর্যাত্রা না করা পর্যন্ত কি বন্দী থাকতে হবে আমাকে?

পনের মিনিটও গেল না, খুলে গেল মাথার ওপরকার হ্যাচ। লাফ দিয়ে ডেকে উঠে এলাম আমি। এসে কি দেখলাম?

'আতংক' দাঁড়িয়ে আছে একটা পর্বত-গহ্বরের তলদেশে। গহ্বরের খাড়াই দেওয়াল চারধার দিয়ে উঠে গেছে বহু উঁচুতে—এত উঁচুতে যে কুয়াশায় ঢেকে আছে শীর্ষদেশ, কিছু দেখা যাচ্ছে না।

কুয়াশা অত্যন্ত নিবিড়। ঠাণ্ডা অতিশয় কনকনে। তবে কি আমরা আরো উত্তরে চলে এলাম, না, সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচুতে উঠে বসেছি?

বুঝেছি। দুর্দান্ত দুঃসাহসিকতার পর ক্লান্ত 'আতংক' জিরোতে আসে এখানে। দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার পর মধ্যে মধ্যে এই পর্বত বন্দরেই নিঃসাড়ে পড়ে থাকে শক্তিমান যন্ত্রযান। পাহাড়ঘেরা এই কূপ-টাই তাহলে দুনিয়াধিপতির মোটরের গ্যারেজ, নৌকোর বন্দর, উড়োজাহাজের হ্যাঙ্গার।

ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে পর্বত-গাত্র দেখছি, আর আকাশ পাতাল ভাবছি—এমন সময়ে দেখলাম 'আতংক'র তিন ব্যক্তি একটা গুহায় প্রবেশ করল। মুখোসটার সদ্ব্যবহার করলাম সঙ্গে সঙ্গে। লাফ দিয়ে নামলাম জমিতে। হেঁট হয়ে বসে পড়লাম 'আতংক'র তলদেশে। দেখলাম সেখানে রয়েছে চাকা, টারবাইন স্ক্রু আর ডানা।

অর্থাৎ আতংক দরকার মত চাকার-সাহায্যে ডাঙায় গড়িয়ে চলে, প্রপেলার চালিয়ে জলে ভেসে চলে, আর ডানা মেলে শূন্যে উড়ে চলে!

'আতংক' সত্যিই আতংক। ত্রিভুবনের বিভীষিকা সে—ত্রিভুবনের অধীশ্বর।

কিন্তু আশ্চর্য এই যন্ত্রযানকে চালাচ্ছে যে শক্তি, তার নাম কী? নিঃসন্দেহে তড়িৎ শক্তি। মনে পড়ল লেকের জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহের দৃশ্য। অর্থাৎ 'আতংক'র ইঞ্জিন-রুমেই অফুরন্ত তড়িৎ-শক্তি বানিয়ে নেওয়ার কলকব্জা আছে। পরের প্রশ্নটা আরো বিব্রত করল মস্তিষ্ককে। 'আতংক' এখন কোথায়? এ কোন পর্বত গহ্বরে আশ্রয় নিয়েছে আজব যন্ত্রযান? এটাই কি গ্রেট ঈরীর দুরধিগম্য অভ্যন্তর দেশ? মানুষের অগম্য অঞ্চল বলেই কি ত্রিভুবন-অধিপতি আশ্রয় নেন এখানে? পৃথিবীর কারো শক্তি নেই গ্রেট ঈরীর খাড়াই দেওয়াল টপকে তাঁর ওপর চড়াও হওয়ার। এখানকার সুউচ্চ পাহাড় তার একমাত্র প্রহরী। এই জন্যেই কি মাষ্টার অফদি ওয়ার্ল্ড পালিয়ে এসে ঘাপটি মেরে রয়েছেন প্রকৃতির নিজস্ব কেল্লার মধ্যে?

গহ্বরের তলদেশ পর্যবেক্ষণ করার লোভ সামলাতে পারলাম না। ঠিক মাঝখানে দেখলাম রাশি রাশি ছাই, পোড়া কাঠ—অগ্নিদগ্ধ কলকব্জা, ধাতুর টুকরো।

যেন কোনো সূক্ষ্ম জটিল যন্ত্রকে নিয়ে এখানে অগ্ন্যুৎসব করা হয়েছে। যেন অগ্নি জঠরে নিক্ষেপ করে তাদের ধ্বংস করা হয়েছে। সেই জন্যেই গ্রেট ঈরীর শিখর দেশে লকলকে অগ্নিশিখা দেখা গিয়েছিল। মুহুর্মুহু বিস্ফোরণ শব্দে সারা তল্লাট প্রকম্পিত হয়েছিল, আতংকে প্রাণ উড়ে গিয়েছিল মরগানটন-বাসিন্দাদের।

পেছনে পায়ের আওয়াজ শুনলাম। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখি ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে আছেন। দুহাত ভাঁজ করা বুকের ওপর। চাহনি প্রখর। কোমরে রিভলবার।

পুরোনো প্রশ্নটা নতুন করে শুধোলাম—আপনি-ই কি তুনিয়ার রাজা ?

সেই তুনিয়ার রাজা যে তুনিয়ার কাছে অনেক আগেই প্রমাণ করে দিয়েছি—আমার চাইতে শক্তিমান পুরুষ সেখানে আর কেউ নেই।

'কে আপনি ?' আর কিছু বলতে পারলাম না আমি।

আমি ? হাঃ হাঃ হাঃ! আমি রোবার—আকাশ রাজা রোবার! বুক ঠুকে সদম্ভে বললেন ক্যাপ্টেন।

রোবার! আকাশ রাজা রোবার।

বছর কয়েক আগে তুনিয়ার সব কাগজে ফলাও করে ছাপা হয়েছিল অসাধারণ মানুষ রোবারের বিচিত্র কীর্তিকাহিনী। অত্যাশ্চর্য আকাশযান 'অ্যালবেট্রস' সৃষ্টি করেছিলেন। রোবার। 'অ্যালবেট্রস' আকাশে উড়ত অনেকগুলি প্রপেলারের সাহায্যে। ডেকের বিস্তর মাস্তুলের ওপর অনেকগুলি প্রপেলার বন্ বন্ করে ঘুরে শূন্যে তুলত আকাশযানকে। সামনে আর পেছনে তুটো প্রকাণ্ড প্রপেলারের দৌলতে যে-দিকে খুশী ছুটত আকাশ দৈত্য অ্যালবেট্রস।* অকস্মাৎ একদিন উধাও হয় গিয়েছিল অভিনব আকাশ যান অ্যাবেট্রস। কোথায় গিয়েছিল ? কেউ তা জানেনা। তবে আমি টুকরো-টাকরা যে-খবর পেয়েছি তার ভিত্তিতে লিখছি পরবর্তী কালে কি নিয়ে মেতেছিলেন অ্যালব্রেট্রসের উদ্ভাবক রোবার। যন্ত্রযুগের নতুনতম বিস্ময় আনতে চেয়েছিলেন তিনি। অ্যালব্রেট্রস' তো নিছক আকাশযান—হোক না অভিনব—কিন্তু শুধু আকাশ বিহার করেই পরিতৃপ্ত হতে পারলেন না মহাশক্তিমান রোবার। তিনি চাইলেন আরো একধাপ এগোতে। এমন একটা যন্ত্রদানব বানানোর স্বপ্ন দেখলেন যা একধারে বিজয়কেতন ওড়াবে পঞ্চ ভূতের তিনটি ভূতে—অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, মরুৎ-কে মুঠোয় আনবে। স্থলে, জলে, শূন্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হবে।

দিনের পর দিন নক্সার পর নক্সা এঁকে চললেন রোবার বইপত্র ঘেঁটে। নিজের সমস্ত উদ্ভাবনী কল্পনাকে কাজে লাগিয়ে অবশেষে চূড়ান্তরূপ দিলেন নক্সায়। জন্ম নিল 'আতংক'।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরে এক্স-দ্বীপে 'আতংক'র টুকরো টুকরো অংশগুলো একে একে বানালেন রোবার সঙ্গীসাথী নিয়ে। বিশাল কারখানা বানিয়েছিলেন তিনি এক্স দ্বীপে। অজ্ঞাত সে দ্বীপের হদিশ পাওয়া যায়নি আজও।

খণ্ডাকারে নির্মিত আতংক'র অংশগুলো শূন্যপথে গ্রেট ঈরীতে বহন করে এনেছে 'অ্যালবেট্রস। খণ্ড খণ্ড অংশ জোড়া লাগিয়ে অবশেষে পরিপূর্ণ রূপ নিয়েছে 'আতংক'—ত্রিভুবনের বিস্ময়, ত্রিভুবনের অজেয়, ত্রিভুবনের অধীশ্বর —'আতংক'।

এ-হেন যন্ত্রযানের স্রষ্টিকর্তার মনে অহমিকা আসা স্বাভাবিক। কিন্তু রোবার যেন সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছেন। নিঃসীম ঔদ্ধত্য ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পেয়ে পৌঁছেছে বিপজ্জনক স্তরে। রোবার এখন ধরাকে সরাজ্ঞান করছেন। নিজেকে সত্যি-সত্যিই পৃথিবীর প্রভু বিশ্বাস করছেন। পোকামাকড় মনে করছেন পৃথিবীবাসীদের, খোলামকুচি জ্ঞান করছেন পৃথিবীর সম্পদকে। উনি এখন চাইছেন, ভূগোলকের প্রতিটি মানুষ দাসানুদাস কেনা গোলামের মতন তাঁর পদলেহন করুক, তাকে ভগবানরূপে পূজা করুক?

দেখেশুনে বড় ভয় হল আমার। এত দম্ভ ভাল নয়। শেষ পর্যন্ত অত্যাধিক আস্ফালন বিকারের পর্যায়ে না পৌঁছোয়।

গ্রেট ঈরীর মাঝখানে স্তূপাকার যন্ত্রপাতির দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস

* রোবার দি কনকারার—রোবার হলেন আকাশ রাজা—এই উপন্যাস রোবারের আশ্চর্য উপাখ্যান লিখে গেছেন জুলভার্ণ। আশ্চর্যের বিষয়, এ-যুগের হেলিকপ্টারের সঙ্গে ভার্ণ-কল্পিত অ্যালবেট্রসের কোথায় যেন একটা মিল দেখা যায়।

ফেললাম। অগ্নিদগ্ধ বিস্তর কলকব্জা পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে পড়ে রয়েছে। নিশ্চয় 'অ্যালবেট্রস্'-য়ের ধ্বংসাবশেষ। আগুন লাগাটা হয়ত নেহাতই দুর্ঘটনা। অথবা, নিজের হাতেই আগুন জ্বালিয়েছেন রোবার। ত্রিভুবনজয়ী উন্নত যন্ত্রযান বানিয়ে নেওয়ার পর নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন আকাশযান 'অ্যালবেট্রস'কে।

সারাদিন 'আতংক' নিয়ে ব্যস্ত রইলেন রোবার। সঙ্গীদের নিয়ে মেরামত করে চললেন কত কী! 'আতংক'র বড় রকমের মেরামত দরকার হয়েছিল। গ্রেট ঈরীতে আগমন সেই কারণেই।

মেরামত দেখার চাইতে আমার বেশী নজর ছিল রোবারের ওপর। সামনে লক্ষ্য করছিলাম ভদ্রলোকের হাবভাব কথাবার্তা কাজকর্ম। দেখলাম, রোবার একটা সাংঘাতিক উত্তেজনায় অস্থির হয়ে রয়েছেন। উত্তেজনাটা অজস্র স্ফুলিঙ্গের আকারে যেন ওঁর সব কটি ইন্দ্রিয়কে ছেয়ে ফেলেছে। মুহূর্তের জন্যেও উনি উত্তেজনার প্রভাবমুক্ত হতে পারছেন না, ক্ষণেকের জন্যেও উত্তেজনা ওঁকে রেহাই দিচ্ছে না। প্রতিটি শিরা-উপশিরা-স্নায়ু যেন থর-থর করে কাঁপছে চাপা উত্তেজনায়—অফুরন্ত উৎস হতে উদ্গত সেই সর্বনাশা উত্তেজনা প্রকাশ-মুখ না পেয়ে যেন ফেটে পড়তে চাইছে সহস্র ধারায়।

মাঝে মাঝে ক্ষিপ্তের মত মুষ্টি নিক্ষেপ করছেন আকাশপানে—যেন চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন স্বয়ং ঈশ্বরকে। গুহার মধ্যে পায়চারী করছেন অস্থির চরণে, হঠাৎ থমকে দাঁড়াচ্ছেন ঊর্ধ্বমুখ হয়ে স্পর্ধিত ভঙ্গিমায় এমনভাবে মুষ্টি আস্ফালন করছেন যেন, তৃণজ্ঞান করছেন খোদ স্বর্গ রাজাকেও!

গতিক সুবিধের ঠেকল না। অত্যধিক অহংকারের জন্যে রোবার উন্মাদ হয়ে যাচ্ছেন নাতো?

তিন দিন একনাগাড়ে মেহনৎ করলেন রোবার এবং তাঁর দুই সঙ্গী। তিন দিন পর জিনিসপত্র খাবার দাবার ফের তোলা হল 'আতংক'র ভেতরে।

সেই ফাঁকে রোবারকে আবার জিজ্ঞেস করলাম—'কি করতে চান আমাকে নিয়ে? মুক্তি দেবেন কিনা?'

রোবার তখন বুকে দুহাত ভাঁজ করে তন্ময় হয়ে কি যেন চিন্তা করছিলেন। শূন্য চাহনি দেখে বুঝলাম আমার কথা ওঁর কানে ঢোকেনি। কোনো জবাব না দিয়ে হন হন করে উনি ফের ঢুকে গেলেন গুহার ভেতরে।

অন্য দুই সঙ্গী মালপত্র জড়ো করতে লাগল গ্রেট ঈরীর ঠিক মাঝখানে। স্তূপাকার করে সাজানো হল খালি বাক্স, বাড়তি জিনিসপত্র। অদ্ভুত আকারের বিস্তর কাঠ টেনে আনা হল স্তূপের কাছে। কাঠের বিদঘুটে গড়ন দেখে সন্দেহ হল আমার। নিশ্চয় 'অ্যালবেট্রস-এর কাঠ। সাইজ করে কাটা। এখন তা দিয়ে বহ্ন্যুৎসবের আয়োজন করতে চলেছেন রোবার।

বহ্ন্যুৎসব! ফের অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে চলেছেন রোবার। কিন্তু? রোবার কি এই গোপন ঘাঁটি চিরতরে ছেড়ে দিচ্ছেন? হয়ত তাই। উনি চলে যাবার পর ছাই ছাড়া কিছুই আর থাকবে না এখানে।

নটা নাগাদ রোবারের প্রধান সহকর্মী টম টার্নার আগুন ধরিয়ে দিল কাঠকুটো বাড়তি জিনিসের সেই স্তূপে। দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল আগুন। শিখা লকলকিয়ে উঠল গ্রেট ঈরীর শিখরের উপর।

বেচারী মর্গান্টন-বাসিন্দারা! আরেক দফা আঁতকে উঠবে ওরা আগুন দেখে। ভাববে এই বুঝি শুরু হল অগ্ন্যুৎপাত।

আচমকা টম টার্নার খপ করে আমার হাত চেপে ধরল। ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল 'আতংক'র দিকে। ডেকে ওঠানোর পর ঠেলে নামিয়ে দিল আমার কেবিনের মধ্যে।

আমি লড়তে পারতাম। কিন্তু উদ্যত রিভলবারের সামনে বাহুবল দেখানো বাতুলতার নামান্তর।

সারা রাত বন্দী রইলাম ছোট্ট কেবিনে। বাইরে কি হচ্ছে

দেখবার সুযোগ পেলাম না। তবে অনুভব করলাম, ভূলোক ছেড়ে শূন্যলোকে ভেসে চলেছে 'আতংক'। থপ-থপ শব্দে বাতাসের ওপর আছড়ে পড়ছে সুবিশাল ডানা জোড়া। 'আতংক' যেন যন্ত্রযুগের অতিকায় 'পক্ষীরাজ'—মেঘের কোল দিয়ে পবনদেবের গায়ে ডানা ঝাপটে ভেসে চলেছে বিচিত্র ছন্দে।

কিন্তু কোন দিকে? চলেছি কোন দিকে?

অনেক···অনেকক্ষণ পরে দিনের আলো দেখা গেল পোর্টহোল দিয়ে। আমি 'হ্যাচে হাত দিয়ে দেখলাম ঢাকনি খোলা। নিশ্চয় কেউ খুলে রেখেছে। তিন লাফে বেরিয়ে এলাম ডেকে। দেখলাম ভারি সুন্দর এক দৃশ্য।

নীচে নীল সমুদ্র।

ওপরে নীল আকাশ। পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের বুক চিরে চলেছে 'আতংক'।

দিগন্তে মেঘরাশি জমেছে জমাট তুলোর মত।

সূর্যের অবস্থান দেখে বিচার করলাম। আমরা চলেছি মেক্সিকো উপসাগরের ওপর দিয়ে।

বিকেল হল। 'আতংক' ধীরে ধীরে নেমে পড়ল জলের ওপর। সামুদ্রিক পাখী যেমন উড়তে ক্লান্ত হলে ডানা মুড়ে ভাসতে থাকে জলের ওপর—'আতংক'ও ঠিক সেইভাবে আকাশ পথ থেকে অবতীর্ণ হল সমুদ্র পৃষ্ঠে। দুলতে লাগল ঢেউয়ের দোলায়।

মেঘ দেখে ভয় হয়েছিল ঝড়বৃষ্টি আসবে। কিন্তু সে-রকম কোনো সূচনা দেখা গেল না।

অনায়াস গতিবেগে ঢেউ কেটে এগিয়ে চলেছে 'আতংক'। সন্ধ্যে হল। ঝড়ের সংকেত দেখা দিয়েছে অন্ধকার আকাশে। ডেকে থাকা আর সমীচীন নয়। কেবিনে নেমে যেতে বাধ্য করা হল আমাকে।

তার পাঁচ মিনিট পরেই সাগরের অতলে ডুব দিল 'আতংক'। চারিদিক নিস্তব্ধ। সাগরে তলের সেই নিশ্ছিদ্র নীরবতা, যে না

উপলব্ধি করেছে, তাকে বোঝানো যাবে না কি অপরিসীম শান্তি সেখানে। যেন একটা অখণ্ড প্রশান্তির মধ্যে নিঃসাড়ে ভেসে চলল 'আতংক'। রঙবেরঙের মাছেরা এসে কতই না ডিগবাজি খেল সার্চলাইটের তীব্র আলোর সামনে। আলো দেখে যেন আনন্দের সাড়া পড়ে গেল ওদের মধ্যে। সামুদ্রিক গুল্ম আর প্রবাল স্তূপ শুধু সাক্ষী রইল ডুবোযানের শব্দহীন অগ্রগতির···নিঃশব্দে সঞ্চরমান একটা বিপুল ছায়া-দানব যেন ভেসে গেল সমুদ্রতলের ওপর দিয়ে।

শান্তির রাজ্যে প্রশান্তির প্রলেপ লেগেছিল আমার চোখের পাতাতেও। একটু পরেই তাই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙার পর টের পেলাম তখনো সাগর তলেই অব্যাহত রয়েছে আমাদের গতি।

কিছুক্ষণ পরেই ভাসলাম সমুদ্র পৃষ্ঠে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল দারুণ দুলুনি। উত্তাল ঢেউ যেন লোফালুফি খেলতে লাগল 'আতংক'কে নিয়ে। 'হ্যাচ' খোলা ছিল। উঠে এলাম ডেকে। আকাশের অবস্থা দেখে বুক কেঁপে উঠল। দারুণ ঝড় আসছে।

আকাশ, বাতাস, সমুদ্র—সবারই চেহারা পালটে যাচ্ছে। লালচে মেঘে ছেয়ে গেছে আকাশ। ক্রুর মূর্তি নিয়ে মেঘরাশি যেন তাণ্ডব-নাচের সাজে সাজছে। বাতাসে ধীরে ধীরে জাগ্রত হচ্ছে হুহুংকার। সমুদ্রও বুঝি পাতাল হয়ে গিয়েছে অন্তরীক্ষের দুই মিতার রণমূর্তি দেখে।

আচম্বিতে যেন লক্ষ করতালি বাজিয়ে লাফ দিয়ে এল পাগলা ঝড়। সমুদ্রটাও সেইসঙ্গে আকাশ ছোঁয়া ঢেউ তুলে নেচে উঠল অবিশ্বাস্য উচ্ছ্বাসে। এতক্ষণ যেন ঝড়-দানবকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল মেঘের আড়ালে। আচমকা শেকল ছিঁড়ে উন্মত্তের মতই ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রলয়-নৃত্যের আসরে। হাওয়ার ঝাপটায় যেন অন্ধ হয়ে গেলাম আমি। রেলিং আঁকড়ে রইলাম শক্ত মুঠিতে। আশ্চর্য লোক বটে রোবার? ঝড়ের এই মাতলামির সময়ে কেউ

ওপরে নৌকো রাখে? এই মুহূর্তে তার ডুব দেওয়া উচিত সাগরতলে—সেখানে ঝড় নেই, বাতাস নেই, ঢেউ নেই।

সভয়ে দেখলাম, কণ্ট্রোল কেবিনের মধ্যে হালের চাকা খামচা কি-রকম যেন হয়ে গিয়েছেন রোবার। ধ্বকধ্বক করে জ্বলছে তাঁর দুই চক্ষু। এরকম প্রদীপ্ত চোখ এর আগে আমি দেখিনি। চোখ তো নয় যেন আগুনের মালসা! দুটুকরো জ্বলন্ত অংগার বসানো অক্ষিকোটরে! রুদ্র প্রকৃতির পানে উদ্ধত ভঙ্গিমায় তাকিয়ে আছেন রোবার। অধরোষ্ঠ ঈষৎ উন্মুক্ত—দাঁতের সারি দেখা যাচ্ছে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে। রোবার যেন অট্ট-অট্ট হাসি হাসছেন লক্ষলক্ষ রক্ষ-যক্ষের রুদ্র লীলার রূপ দেখে। সেই হাসির মধ্যে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সীমাহীন তাচ্ছিল্য—বিধ্বংসী প্রকৃতিকেও যেন তৃণজ্ঞান করছেন রোবার—ত্রিভুবনের রাজা রোবার!

সত্যিই কি উন্মাদ হয়ে গেলেন রোবার? আর দেরী করা সমীচীন নয় মোটেই। প্রাণ বাঁচাতে হলে এই মুহূর্তে গোঁৎ দিয়ে নেমে যাওয়া দরকার জলের অতলে!

কিন্তু একী রূপ দেখছি রোবারের? চোখের তারায় এ-কিসের আভাস? কার সংকেত ঝিলিক দিচ্ছে ওঁর অগ্নিগর্ভ চাহনিতে? মহাকালের টংকার শুনছি না ওঁর অট্ট-অট্ট হাসির মধ্যে? এ-যেন মাটির মানুষ নয়—অপার্থিব দুনিয়া থেকে আগন্তুক শরীরী বিভীষিকা অশুভ শক্তি দিয়ে গড়া প্রলয়ংকর দানব!

ঝড়ের হাহাকার আর বাজের দামামা ছাপিয়ে আচম্বিতে একটা চিৎকার শোনা গেল।

রণহুংকার। রোবার চেঁচাচ্ছেন বিকট গলায়:

'আমি রোবার···ত্রিভুবন জয়ী রোবার···স্বর্গ মর্ত্য পাতাল যার পায়ের তলায়···আমি সেই রোবার! রোবার!! রোবার!!!'

বলে সর্বশরীর ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করলেন উন্মাদ বৈজ্ঞানিক। নন্দীভৃঙ্গীর মত দুই স্যাঙাৎ যেন এই হুকুমের প্রতীক্ষাতেই উন্মুখ

হয়েছিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে কড়-কড়-কড়াং-কড়াং শব্দে দুপাশে খুলে গেল বিশাল ডানা। জল ছেড়ে লাফিয়ে উঠল উড়ো জাহাজ··· বাতাস কেটেঝাঁকুনি দিয়ে ধেয়ে গেল তুমুল তুফানের দিকে।

এর পর যা দেখলাম, তা বুঝি শুধু নরকেই দেখা যায়। সহস্র বজ্র মুহুর্মুহু ফেটে পড়তে লাগল আশেপাশে, লকলকে বিজলী ছুটে গেল ডাইনে বাঁয়ে ওপরে নীচে। উড়ন্ত যন্ত্রযানকে প্রতি সেকেণ্ডেই যেন গ্রাস করতে চাইল সহস্র বজ্র তাদের আগুন জিহ্বা দিয়ে···প্রতি সেকেণ্ডেই অলৌকিকভাবে তড়িৎ-শিখার মাঝ দিয়ে ছুটে চলল মহাকায় পক্ষীর মত 'আতংক'।

মত্ত প্রভঞ্জন যেখানে সমস্ত শক্তি নিয়ে কেন্দ্রীভূত, যে ভয়ংকর কেন্দ্রবিন্দুতে লক্ষ অশনি নিষ্ঠুর সংকেত নিয়ে করাল রূপে দৃশ্যমান, রোবার সেই নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে নক্ষত্র বেগে উড়িয়ে নিয়ে চললেন 'আতংক'কে। তড়িৎ-শক্তির সমগ্র ক্ষমতা দিয়ে ডানা আন্দোলন করে ছুটে চলল যন্ত্রযান···ঝনঝন শব্দে কাঁপতে লাগল ধাতব দেহ। কিন্তু রোবারের ভ্রূক্ষেপ নেই। ঘনঘন বিদ্যুৎ ঝলকের আলোয় দেখতে পাচ্ছি তার উদভ্রান্ত উন্মত্ত মুখচ্ছবি, বিস্ফারিত জ্বলন্ত চক্ষু, শুনতে পাচ্ছি তার হা-হা-হা-হা অট্টহাসি।

আমি রোবার ত্রিভুবনজয়ী রোবার—স্বর্গ মর্ত পাতালের রাজা—কে রোধে আমার গতি?

এত দর্প বুঝি সইতে পারলেন না দর্পহারী। এতক্ষণ বুঝি সকৌতুকে সহস্র চক্ষু দিয়ে মদমত্ত রোবারের স্পর্ধিত উর্ধগতি নিরীক্ষণ করছিলেন সুরলোকের অধিপতি। অসুর নিধনের সময় বুঝি এসেছে এবার। চরম মুহূর্তে আমি লাফ দিয়ে রোবারের ফেরাডে যাচ্ছি এমন সময়ে আচম্বিতে ভীষণভাবে কেঁপে উঠল আতংক। লাফিয়ে উঠে মুহূর্তের মধ্যে শতধাবিদীর্ণ হয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল 'আতংক'র ডানা এবং অন্যান্য অংশ।

চূড়ান্ত বজ্র হেনেছেন বজ্রাধিপতি। 'আতংক'র বুক বিদীর্ণ হয়েছে।

তার মানব শরীর বিস্ফোরিত হয়েছে, অহংকারে বেসামাল রোবারের দর্পচূর্ণ হয়েছে!

নিশ্চিহ্ন হয়েছে 'আতংক'!

অনেক ঘন্টা পরে জ্ঞান ফিরে পেলাম।

আমার সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ। মাথা মুখ কপাল ব্যাণ্ডেজে ঢাকা। আমি শুয়ে আছি একটা জাহাজের কেবিনে। দরজার কাছে ভীড় করে রয়েছে কয়েকজন খালাসী। বালিশের কাছে বসে আমার গায়ে মাথায় হাত বুলোচ্ছে একজন অফিসার।

আমি চোখ মেলতেই তিনি বললেন—'আপমি ওটাবা স্টীমারের' কেবিনে রয়েছেন।

'কোথায় পেলেন আমাকে?'

'সমুদ্রে।'

'কোন সমুদ্রে?'

'মেক্সিকো উপসাগরে। বিরাট একটা যন্ত্র ভাঙাচোরা অবস্থায় ভাসছিল জলে। আপনি তার মধ্যে আটকে গিয়েছিলেন। আপনার জ্ঞান ছিল না।'

ভাঙাচোরা যন্ত্রের মধ্যে আটকে ছিলাম। মুহূর্তের মধ্যে চোখের সামনে ভেসে উঠল অবর্ণনীয় সেই নরক দৃশ্য! বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে, বজ্র ফেটে পড়ছে, ঝড় হাহাকার করছে···তারপর ভীষণ একটা শব্দ ···আগুন···মড়মড় শব্দ···শূন্যপথে ছিটকে গেলাম···।

'আতংক' তাহলে আর নেই। ত্রিভুবনজয়ী রোবারও আর নেই। চিরতরে অদৃশ্য হলেন তিনি ভৌত শক্তির সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়ে। বজ্রবিদ্যুৎ যে কেন্দ্রবিন্দুতে সমগ্র সংহার শক্তি নিয়ে নৃত্যশীল—ঠিক সেই কেন্দ্রবিন্দুতে উনি উড়ে গিয়েছিলেন শক্তির মহড়া দিতে···আপন শক্তি যাচাই করতে। তাই দুই সাগরেদ সহ চিরতরে ত্রিভুবন হতে বিদায় নিয়েছেন রোবার—মাষ্টার অফ দি ওয়ার্ল্ড।

'ওটাবা' বন্দরে পৌঁছোলো যথাসময়ে। বাড়ি ফিরে বুড়ি দাসীকে বললাম আমার রোমাঞ্চ কাহিনী। শুনে সে বললে—কেমন, বলেছিলাম, না গ্রেট ঈরীতে পিশাচ আছে?

'দূর!' হেসে বললাম আমি---'রোবার পিশাচ নয়।'

'কিন্তু পিশাচ হবার সব গুণপণাই তো তার ছিল দাদাবাবু, তাই না?' বলল বৃদ্ধ।

মঙ্গলগ্রহের বোবা মেয়ে

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

ডানকান উইভার যখন লেল্লিকে কিনেছিল—না, ওভাবে বললে ঝামেলার সৃষ্টি হতে পারে—লেল্লির কাজের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যখন নগদ এক হাজার পাউণ্ড গুনে দিয়েছিল ডানকান উইভার, তখন কিন্তু ও মনে মনে ভেবে রেখেছিল ছশো, অথবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, সাতশো পাউণ্ডেই কাজ হাসিল করতে পারবে ও।

পোর্ট ক্লার্কের যাকে যাকে এ দামের কথা শুধিয়েছিল ডানকান, তারাই ওকে জানিয়েছিল এটাই উচিত দাম। বন্দর ছাড়িয়ে শহরে ঢোকার পর কিন্তু দেখা গেল জিনিসটা অত সোজা নয়। প্রথম তিনটে মঙ্গল পরিবার তো ভাবে ভঙ্গীতে মেয়ে বিক্রী করার কোন অভিলাষই প্রকাশ করলো না। তারপরের ফ্যামিলি রাজী হলো বটে, কিন্তু ১৫০০ পাউণ্ডের এক কানাকড়িও কম নিতে চাইল না। লেল্লির বাপ-মাও ১৫০০ পাউণ্ড থেকে শুরু করেছিল, কিন্তু ডানকান যখন পরিষ্কার জানিয়ে দিলে যে ওকে নিংড়োলেও অত টাকা পাওয়া যাবে না, তখন দরটা কমে এসে দাঁড়ালো ১০০০ পাউণ্ডে। পোর্ট ক্লার্কে লেল্লিকে নিয়ে ফিরে আসবার পথে মনে মনে হিসেবটা তোলাপাড়া করতে গিয়ে ডানকান দেখলে খুব বেশী দাম ও দেয় নি। ওর চাকরীর মেয়াদ পাঁচ বছর। তাহলে প্রতি বছরে বড় জোর ২০০ পাউণ্ড খরচ হচ্ছে লেল্লির জন্যে। তাছাড়াও, পরে বেচে দেওয়ার সময়েও তো অনায়াসেই চার পাঁচশো পেয়ে যাবে ও। এ দিক দিয়ে ভাবলে, হাজার পাউণ্ড তেমনি কিছু গলাকাটা দর নয়।

শহরে আরও একবার যেতে হলো ওকে। কোম্পানীর এজেন্টের

সঙ্গে দেখা করে পরিস্থিতিটা বুঝিয়ে দিয়ে সব আয়োজন সম্পূর্ণ করার মতলব ছিল ওর।

'বৃহস্পতি IV/II গ্রহে পাঁচ বছরের চুক্তিতে ওয়ে লোড ষ্টেশন সুপারিনটেনডেন্ট হয়ে যাওয়ার বিড়ম্বনাটা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন আপনি? যাই হোক, যে জাহাজে রওনা হবো আমি, সে জাহাজটা মাল নিয়ে আসার জন্যে তো এমনিতেই খালি যাচ্ছে অর্থাৎ যথেষ্ট হাল্কা থাকছে। কাজেই, ঐ জাহাজেই লেল্লির যাওয়ার বন্দোবস্ত করলে কি রকম হয়?' এ প্রস্তাব করার আগেই খোঁজখবর নিয়ে ডানকান জেনেছিল এ ধরনের পরিস্থিতিতে বাড়তি যাত্রী নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয় কোম্পানী। যদিও আইন অনুসারে তা ঠিক নয়।

কয়েকটা লিষ্ট ঘেঁটে কোম্পানীর এজেন্ট জানালে যে বাড়তি যাত্রী নিয়ে যাওয়ায় কোম্পানীর কোন আপত্তি থাকতে পারে বলে মনে হয় না তার। এসব ক্ষেত্রে কোম্পানী সবসময়ে বাড়তি যাত্রীর জন্যে খাবার দাবারের রেশন সরবরাহ করে নামমাত্র মূল্যে। বছরে এজন্যে মাত্র ২০০ পাউণ্ড কেটে নেওয়া হয় মাইনের থেকে।

'কি! একহাজার পাউণ্ড!' রীতিমত চমকে ওঠে ডানকান।

'খুব বেশী নয়, শেষপর্যন্ত পুষিয়ে যায়। পাছে কোনো কর্মচারী বিগড়ে যায়, তাইতো এটুকু করছে কোম্পানী এবং সেজন্যে দাম ধরে নিচ্ছে শুধু রেশনটুকুর। নিঃসঙ্গতার অভিশাপ থেকে রেহাই পেতে হলে এক হাজার পাউণ্ড কি খুব বেশী?'

কিছুক্ষণ নীতিবাগিশের মত কথা কাটাকাটি করলো ডানকান। কিন্তু এত কথার ধার ধারে না এজেন্ট ভদ্রলোক। তাই অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল ডানকানের তর্ক। লেল্লির দামটা তাহলে সব মিলিয়ে একলাফে উঠে গেল ২০০০ পাউণ্ডে—বছরে ৪০০ পাউণ্ড। বছরে ৫০০০ পাউণ্ড মাইনে পাবে ডানকান। বৃহস্পতি IV/IIতে থাকার সময়ে একটা ফার্দিংও খরচ হবে না তা থেকে। ট্যাক্সও লাগবে না। কাজেই বছরে বছরে ফুলে ফেঁপে উঠবে ওর সঞ্চয়ের

পরিমাণ। অনুপাতে ২০০০ পাউণ্ড তেমন কিছু নয়। তাই শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেল ও।

খুশী খুশী স্বরে বলে এজেন্ট। এইতো চাই। চমৎকার! 'সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমি। আপনাকে শুধু একটা কাজ করতে হবে। মেয়েটির গ্রহান্তরে যাত্রার একটা পারমিট আনতে হবে। আপনার বিয়ের সার্টিফিকেট দেখালেই আপনা হতেই পারমিটটা পেয়ে যাবেন আপনি।'

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে ডানকান। 'বিয়ের সার্টিফিকেট! মঙ্গলের মেয়েকে আমি বিয়ে করবো!'

মাথা নাড়ে এজেন্ট ভদ্রলোক। ঈষৎ ভৎসনার সুরে বলে—'এ ছাড়া গ্রহান্তরে যাত্রার পারমিট পাওয়া সম্ভব নয়। দাসত্ব বিরোধী কানুন। সবাই ভাববে আপনি মেয়েটাকে বিক্রী করবার মতলবে আছেন। মেয়েটাকে নিশ্চয় কিনে এনেছেন—এমন সন্দেহও করতে পারে।'

'আমি!' অপমানিতস্বরে বলে ডানকান।

'আশ্চর্য কিছুই নয়। বিয়ের লাইসেন্স বাবদ আপনার খরচ হবে মাত্র দশ পাউণ্ড।'

দিন দুয়েক পরে সার্টিফিকেট আর পারমিটটা নিয়ে ফিরে এল ডানকান। কাগজগুলির উপর চোখ বুলিয়ে নিলে এজেন্ট।

তারপর বললে—'O. K.। আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি আমি। আমার ফী লাগবে একশো পাউণ্ড।'

'আপনার ফী!'

'যে টাকা আপনি লগ্নী করছেন, তা যাতে জলে না যায়, তাই দেখার ফী'. বলে এজেন্ট ভদ্রলোক।

যে ভদ্রলোক গ্রহান্তরে যাত্রার পারমিট দিয়েছে, সে-ও চেয়েছিল একশো পাউণ্ড। তিক্ত গলায় ডানকান বলে:

'মঙ্গলের একটা বোবা মেয়ের জন্যে দেখছি জলের মতই টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে আমার।'

'বোবা?' অকৃত্রিম কৌতূহল প্রকাশ করে এজেণ্ট।

'কথাই বলে না। বিচিত্র জীব এই মঙ্গলবাসীরা।'

'হুম্। বোবার অভিনয় করে ওরা। ওদের মুখের গড়নটাও এমন যে দেখলে পরে মনে হয় বুঝি বোবা। কিন্তু এক সময়ে যে ওরা অপরিসীম ধূর্ত ছিল, তা তো জানেন।'

'একসময়ে, অনেক—অনেক বছর আগে।'

'আমরা এখানে এসে পৌঁছানোর অনেক আগে থেকেই অযথা মাথা ঘামানো বন্ধ করে দিয়েছিল এরা। মৃত্যু হচ্ছিল ওদের গ্রহের। গ্রহের সাথে নিজেরাও মৃত্যুবরণ করে নেওয়ার জন্যে খুশী মনে প্রস্তুত হয়েছিল ওরা।'

'বোবা তো এই কারণেই বলি আমি। সব গ্রহেরই কি মৃত্যু হচ্ছে না?'

'রোদে পিঠ দিয়ে অনেক সময়ে বুড়োদের বসে থাকতে দেখেছেন নিশ্চয়? তার মানে এই নয় যে তারা জরাগ্রস্ত অথর্ব। যে কোন মুহূর্তে তারা ঝিমুনি ঝেড়ে ফেলে আবার তৎপর করে তুলতে পারে তাদের মস্তিষ্ককে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তারা তা চায় না। ভাবে কি হবে অযথা মাথা ঘামিয়ে। যা হবার তা তো হবেই—এই মনোভাব নিয়ে থাকলে অনেক হাঙ্গামা অনায়াসেই এড়ানো যায়।'

'আরে, সে রকম নক্তীর কুড়িটায় একটা মেলে। লেল্লিও নিশ্চয় ঐ ধরনের। বিয়ের সময়ে কি হচ্ছে না হচ্ছে, সে বিষয়েও যখন কোন মেয়ে উচ্চবাচ্য না করে নির্বিকার নির্বিকল্প থাকে, তখন তো আর তাকে বোবা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।'

যাই হোক, দাগবিহগুণ শেষ হলে 'পর দেখা গেল লেল্লির পোষাক এবং অন্যান্য টুকিটাকি জিনিষের জন্যে আরও একশো পাউণ্ড খরচ করা দরকার। তাহলে লগ্নীকৃত অর্থের মোট পরিমাণ দাঁড়ালো

২,৩১০ পাউণ্ড। সত্যিকারের স্মার্ট মেয়ের জন্যে এ টাকা খরচ করলে ক্ষোভের কিছু থাকতো না, কিন্তু লেল্লি······যাকগে, উপায় তো নেই। একবার পকেট থেকে টাকা বার করলে হয় সে টাকা জলে গেল, অথবা জলে যাওয়া বন্ধ করার জন্যেই আরও কিছু খরচ করার দরকার হয়ে পড়ে। তাছাড়া, নির্জন ওয়ে লোড ষ্টেশনের নিঃসঙ্গ জীবনে কিছুটা সঙ্গ তো সে দিতে পারবে······

নেভিগেটিং রুমে ডাক পড়লো ডানকানের। ফার্ষ্ট অফিসার ডেকে পাঠিয়েছেন ডানকানকে তার ভবিষ্যৎ আস্তানা দেখানোর জন্যে।

ওয়াচ-স্ক্রীনের সামনে এসে বললেন তিনি—'ঐ তো দেখা যাচ্ছে।'

এবড়ো-খেবড়ো পার্বত্যভূমির দিকে দৃষ্টি তুলল ডানকান। কোন স্কেল দিয়ে মাপবার উপায় নেই। আরেকটা চাঁদের মত হতে পারে, আবার বাস্কেট বলের মতও হতে পারে। আকার যাই হোক না কেন দূর থেকে মনে হলো যেন একটা পাথরের গোলা ধীরে ধীরে আবর্তিত হচ্ছে মহাশূন্যের মাঝে।

'কত বড়?' শুধোয় ডানকান।

'মোটামুটি চল্লিশ মাইল ব্যাসের।'

'অভিকর্ষ কতখানি?'

'এখনও হিসেব করে দেখা হয় নি। খুবই সামান্য। ধরে নিন, একেবারে নেই—তাহলে খানিকটা আন্দাজ করতে পারবেন।'

'বটে', বলে ডানকান।

মেসরুমে ফিরে আসার সময়ে থমকে দাঁড়ায়। কেবিনের মধ্যে মাথা বাড়িয়ে দিয়ে দেখে বাঙ্কে শুয়ে রয়েছে লেল্লি। চোখের ভ্রম সৃষ্টির জন্যেই স্প্রিংয়ের আচ্ছাদনটা টেনে রেখে দিয়েছে ওর দেহের ওপর। ডানকানকে দেখেই একটা কনুয়ের ওপর ভর দিয়ে একটু ওপরে উঠল ও।

ছোটখাট চেহারা লেল্লির—লম্বায় পাঁচ ফুটের বেশী নয়। মুখ আর হাত খুবই পাতলা। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের এই ভঙ্গুরতা কিন্তু কেবল-

মাত্র অশক্ত হাড়ের গঠনের জন্যেই নয়। পৃথিবীবাসীর দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক রকমের গোল-গোল মনে হবে তার চোখ দুটো। এ চোখ দেখলেই মনে হয় যেন অবাক হয়ে গেছে তার অকলংকিত শুভ্র পুষ্পের মতই নির্দোষ অন্তর। এই অকপট বিস্ময়ের ভাবটি কিন্তু স্থায়ী। কানের তলাতলে নরম অংশটা অস্বাভাবিক রকমের বড়। বাদামী রঙের ঘন চুলের ফাঁক দিয়ে সবসময়ে ঝুলে থাকে কানের এই বিচিত্র প্রান্তটি। গাঢ় বাদামী কেশরাশির ফাঁকে ফাঁকে কখনো-কখনো উজ্জ্বল লালের রোশনাই দেখা যায় আলোর প্রতিফলনে ; গায়ের চামড়া বিরঙ, পাণ্ডুর। বিবর্ণতা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে কপোলের আশ্চর্য রক্তাভায় আর উজ্জ্বল লাল অধরোষ্ঠের পটভূমিকায়।

ডানকান বলে—'হেই, জিনিষপত্র গুছিয়ে নাও।'

'গুছিয়ে নাও ?' দ্বিধাজড়িত স্বরে পুনরাবৃত্তি করে লেলি। গলার স্বরটা অদ্ভুত। জলতরংগের মত অনেকগুলো সুরের প্রতিধ্বনি কেঁপে কেঁপে ওঠে একই স্বরের মধ্যে।

'নিশ্চয় !' বলে, গুছিয়ে নেওয়া কাকে বলে, হাতেকলমে দেখিয়ে দেওয়ার জন্যেই একটা সুটকেশ টেনে নেয় ডানকান। তারপর, কয়েকটা পোষাক ভেতরে ঠেসে দিয়ে হাতের ভঙ্গিমায় নির্দেশ দেয় বাকী যা কিছু আছে ভেতরে রাখতে। লেলির মুখের সেই অকপট বিস্ময়ের ভাবটি একটুকু ফিকে হয়ে গেল না, নতুন ভাবেরও আনাগোনা দেখা গেল না। কিন্তু ডানকানের নির্দেশ যে বুঝেছে, তা স্পষ্ট বোঝা গেল ওর মুখ দেখে।

'আমরা আসছি ?' শুধোয় ও।

'আমরা প্রায় আসছি। কাজেই, তল্পিতল্পা বেঁধে নাও।'

'ইথ—O.K.,' বলে, আচ্ছাদনের আঁকশিটা খুলতে থাকে লেলি।

দরজা বন্ধ করে দেয় ডানকান। তারপর ছোট্ট একটা ঝটকান দিতেই করিডর দিয়ে আস্তে আস্তে ভেসে যায় মেসরুম আর লিভিং রুমের দিকে।

কেবিনের মধ্যে আচ্ছাদনটা সরিয়ে উঠে দাঁড়ায় লেল্লি। আর তখনই বাদামীরঙের আজানুলম্বিত আলখাল্লার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে দেহের কিম্ভূতকিমাকার অনুপাত। মঙ্গলবাসীদের চোখে এ অনুপাত নিঃসন্দেহে সৌন্দর্যের পরিচায়ক। কিন্তু পৃথিবীর মাপকাঠিতে তা খুব উৎকৃষ্ট নয়। মঙ্গলগ্রহের পাতলা বায়ুমণ্ডলের পরিমাণে দীর্ঘকালের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে ওদের ফুসফুসের ক্ষমতা। আনুসঙ্গিক পরিবর্তনও তাই অপরিহার্য হয়ে উঠেছে ওদের দেহে।

ডানকান যখন ঘরে ঢুকল, মহাকাশ জাহাজের পাচক উইজার্ট আপন মনে বকবক করেছিল।

উইজার্টের ধার ধারে না ডানকান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একেই সাধ্য সাধনা করে রাজী করাতে হয়েছিল ভারহীন অবস্থায় কি ভাবে রান্নাবান্না করতে হয় তা লেল্লিকে শিখিয়ে দেওয়ার জন্যে। ৫০ পাউণ্ডের কমে কিছুই শেখাতে রাজী হয় নি উইজার্ট। তাই ডানকানের লগ্নীর অর্থও বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ২৩৬০ পাউণ্ডে।

কোম্পানী প্রায়ই বলত, চল্লিশ বছরের পর অথর্ব হয়ে বসা থাকার তো কারণ নেই, হাড়ভাঙা পরিশ্রমেরও দরকার নেই। মাইনেপত্র যখন ভালই পাওয়া যায়, তখন সঞ্চয়ের পরিমাণটা বাড়িয়ে দিলেই হয়। আর সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি যাদের নেই, তাদের জন্যে রইল অন্য ব্যবস্থা। ডানকানেরও নাবিক হিসেবে কাজের মেয়াদ যখন ফুরোলো, তখন ওর কাছেও এসে পৌঁছালো সেই রুটিন মাফিক প্রস্তাব।

বৃহস্পতি IV/II উপগ্রহে এর আগে যাওয়ার দুর্ভাগ্য হয়নি ডানকানের। কিন্তু জায়গাটা যে ঠিক কি ধরনের হবে, তা ও জানতো। মহাকাশের হেথায় হোথায় বিস্তর বিকটদর্শন মহাজাগতিক নুড়ি দেখা যায় -- বৃহস্পতি IV/II নিশ্চয় সেই রকমই হবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ যখন কোনো বিকল্প প্রস্তাব আনলো না ওর সামনে, তখন বাধ্য হয়ে চুক্তি সই করতে হলো ওকে: প্রতি বছরে ৫০০০ পাউণ্ড

হিসাবে পাঁচ বছর। আর কোনো খরচ নেই। গন্তব্যস্থানে পৌঁছোনোর আগে আধা-ঘুমিয়ে পাঁচমাস অপেক্ষা-পর্ব। এবং ফিরে আসার পর আধা-ঘুমিয়ে 'অভিকর্ষের সাথে খাপ খাইয়ে' নেওয়ার জন্যে আরও ছটি মাস।

সংক্ষেপে, আগামী ছটা বছরের জন্যে ডানকান নিশ্চিন্ত রইল। পাঁচটা বছর কোনো খরচই নেই এবং মেয়াদ অন্তে বিপুল অংকের এককাঁড়ি অর্থও পাওয়া যাবে হাতের মুঠোয়।

কিন্তু যে কাঁটাটা সবসময়ে খচখচ করে মনে বিঁধছে, সেটা হলো উন্মাদ না হয়ে এই পাঁচটা বছর কি নির্জন বাস সম্ভব? মনোবিদ O. K. সার্টিফিকেট দিলেও, আপনার নিজেরই সন্দেহ হবে এ সম্বন্ধে। কেউ কেউ পারে, আবার অনেককে কয়েকমাসের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে হয়েছে মানসিক চিকিৎসার জন্যে! বছর ছয়েক কোনমতে কাটাতে পারলেই বাকী তিনটে বছরও পারবেন নিশ্চয়। কিন্তু এই দুটো বছর কাটানোর উপায় আবিষ্কার…

ডানকান শুধিয়েছিল—'আচ্ছা অপেক্ষা-পর্বর জন্যে আমাকে মঙ্গলে নামিয়ে দিলে হয় না?'

মঙ্গলগ্রহের পোর্ট ক্লার্ক-ঘাঁটির আশপাশে যে কলোনী গড়ে উঠেছে, বিস্তর প্রাক্তন মহাকাশযাত্রী আছে সেখানে। মূল্যবান উপদেশ পাওয়া যায় এদের কাছে। সবই শুনলো ডানকান, কিন্তু বাতিল করল অধিকাংশই। মস্তিষ্কের সুস্থতা বজায় রাখার জন্যে বাইবেল পড়া বা সেক্সপিয়ারের রচনা মুখস্থ করা, প্রতিদিন বিশ্বকোষের তিনটে পাতা কপি করা, অথবা বোতলের মধ্যে মডেল মহাকাশপোত বানানো ইত্যাদি পন্থাগুলো কেবলমাত্র কষ্টকর আর একঘেয়েই বলে মনে হয়েছিল ওর কাছে। শুধু তাই নয়, এসব পদ্ধতি অনুসরণ করলে বাস্তবিকই কোন সুফল ফলবে কিনা, সে সম্পর্কেও বিলক্ষণ সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। যে উপায়টি ওর কাছে একমাত্র বাস্তব আর কার্যকরী উপায় বলে মনে হয়েছিল, তা

হচ্ছে কোন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া। লেল্লিকে কিনেছিল নির্বাসনের সঙ্গী হিসেবেই। ২০৬০ পাউণ্ড সে অনুপাতে তেমন কিছু নয়।

লেল্লিকে এহেন জায়গায় নিয়ে যাওয়ার কথায় আর পাঁচজনের মতামত কিভাবে গড়ে উঠেছে, ডানকান তা জানত বলেই উইজার্টের কথার প্রতিবাদ না করে ও বললো—'এ রকম জায়গায় পৃথিবীর মেয়ে নিয়ে যাওয়ার অনেক ঝঞ্ঝাট ছিল। কিন্তু মঙ্গলের মেয়েরা—

'মঙ্গলের মেয়ে হলেও—' কথাটা শুরু করেও আর শেষ করতে পারলো না উইজার্ট। আচম্বিতে ও শূন্যে ভেসে গেলো ঘরের এদিক থেকে ওদিকে। রকেটের গতি কমিয়ে আনার নলগুলো থেকে অগ্নিবর্ষণ শুরু হয়ে গেছে।

শূন্যে ভাসমান আল্গা জিনিষগুলোকে টেনে এনে যথাস্থানে রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো প্রত্যেকে।

সংজ্ঞা অনুসারে বৃহস্পতি IV.II একটা উপ-চন্দ্র। এবং মঙ্গল আর বৃহস্পতি গ্রহের মাঝখানে যে ছোট ছোট গ্রহ আছে, তাদের অন্যতম। চাঁদের ওপর যে রকম অগুন্তি আগ্নেয়-গহ্বর এবং জ্বালামুখী দেখতে পাওয়া যায়, বৃহস্পতি IV.II এর ওপরে সে রকম কিছু নেই বটে, তবে জমি সমতল নয়, এবড়ো খেবড়ো পাথরের জগৎ। স্যাটেলাইটটা আকারেও বেঢপ—গোলাকার বলা যায় না মোটেই, তবে কাছাকাছি আসে। অদৃশ্য হয়ে যাওয়া কোন এক গ্রহ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল নিরানন্দ পাথরের এই ডেলাটি। প্রশংসা করবার মত কিছুই নেই—শুধু তার অবস্থানটা ছাড়া।

ওয়ে-লোড ষ্টেশনের দরকার হয়ে পড়েছিল। বড় বড় গ্রহের ওপর নামার উপযুক্ত বিশাল মহাকাশপোত তৈরী করলে তা পড়তায় পোষায় না একেবারেই। সেকেলে ধাঁচের ছোট ছোট কয়েকটা মহাকাশযান পৃথিবীর ওপরেই তৈরী করতে হয়েছিল। কাজেই পৃথিবীর বুক থেকেই তাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল মহাকাশ দরিয়ায়।

কিন্তু সর্বপ্রথম চাঁদের ওপর টুকরো টুকরো অংশ নিয়ে গিয়ে জোড়া লাগিয়ে মস্ত একটা জাহাজ বানানোর পর সূত্রপাত হলো নতুন রেওয়াজের। মহাকাশ জাহাজগুলো তখন থেকেই সত্যি সত্যিই 'স্পেশ-শিপ' হয়ে গেল। বিপুল অভিকর্ষের আকর্ষণ কাটিয়ে ওঠার উপযোগী করে জাহাজ বানানোর আর দরকারই রইল না। জ্বালানি, রসদ, মালপত্র আর নাবিকদের নিয়ে এক স্যাটেলাইট থেকে আর এক স্যাটেলাইটের মধ্যে যাতায়াত করতে লাগল জাহাজগুলো। তারপর এল আরও নতুন ধরনের জাহাজ। তারা চাঁদকেও বাতিল করে দিয়ে পৃথিবীর নতুন ঘাঁটি কৃত্রিম উপগ্রহ সিউডোজ-এর ওপর নামতে এবং সেইখান থেকেই মহাকাশে পাড়ি দিতে শুরু করলে।

ওয়ে-লোড আর মূলঘাটির মধ্যে মালপত্রের আদান-প্রদান হয় কতকগুলো সিলিণ্ডারের সাহায্যে। উচ্চ শক্তিসম্পন্ন এই অদ্ভুত চোঙাগুলোর নাম 'ক্রেট'। ছোট ছোট রকেট জাহাজ আনাগোনা করে যাত্রীদের নিয়ে ওয়ে-লোড আর মূলঘাটির মধ্যে। পৃথিবীর স্যাটেলাইট সিউডোজ আর মঙ্গলের প্রধান ওয়ে-লোড ডিমোজ উপগ্রহে এত কাজকর্ম থাকে যে একজন লোককে সর্বদাই তাই নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু অন্যান্য ছোট ছোট ঘাঁটিতে একজন লোকই যথেষ্ট। এসব ওয়ে-লোডের উন্নতি হয়েছে কম বলে। বৃহস্পতি IV II-তে ৮৯ মাস (পৃথিবীর মাস) অন্তর একটা মাত্র জাহাজ এসে নামে। কাজেই কাজের অনুপাতে অবসর থাকে প্রচুর।

আস্তে আস্তে গতি কমে আসতে থাকে জাহাজটার। স্ক্রুর মত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে নামতে থাকে—উপ-চন্দ্রের গতিবেগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে থাকে জাহাজের গতিবেগ। শুরু হয় গাইরোজের তৎপরতা। আস্তে আস্তে উঁচু-নীচু পাণ্ডুরে জমি বড় হয়ে উঠতে থাকে। এগিয়ে আসতে থাকে ছোট্ট দুনিয়াটা—তারপর সারা ওয়্যাচ-স্ক্রীন জুড়ে ভাসতে থাকে বৃহস্পতি IV II। আরও কাছে নিয়ে

আসা হয় জাহাজটাকে। বৈশিষ্ট্যবিহীন ভয়ংকর পাহাড়ের একঘেয়ে সারি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না তখনও।

তারপর, বাঁদিকে পর্দার মধ্যে পিছলে ঢুকে পড়ল ষ্টেশনের দৃশ্যটি। মোটামুটিভাবে সমতল করে রাখা হয়েছে কয়েক একর জমি। পাথুরে দৌরাত্মের মধ্যে একমাত্র শৃঙ্খলার নিদর্শন। একপ্রান্তে রয়েছে একজোড়া অর্ধ-গোলক কুঁড়ে। একটা অপরটার চাইতে অনেক বড়। আর এক প্রান্তে পাশাপাশি সাজানো রয়েছে কয়েকটা 'ক্রেট'। তার পাশেই রকেট নামা-ওঠার জায়গাটা। এদিকে সেদিকে ক্যান-ভাসের কয়েক সারি ছাউনি। কতকগুলো মালপত্তরে ঠাসা—তাই শঙ্কর মত তাদের আকার। আর কতকগুলো শূন্য বা অর্ধশূন্য। ষ্টেশনের পাশেই রয়েছে একটা অতিকায় অধিবৃত্তাকার দর্পন। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন একটা দানবিক ফুল সুশৃঙ্খলভাবে মেলে ধরেছে পাপড়িগুলো। আর, এর পাশেই দেখা যাচ্ছিল নিষ্প্রাণ গ্রহে জীবনের একমাত্র স্পন্দন—সমস্ত দৃশ্যের মধ্যে একটি মাত্র নড়াচড়ার চিহ্ন। স্পেশস্যুট পরা ছোটখাট একটা মূর্তি অংগে ধাতুর অ্যাপ্রন চাপিয়ে উন্মাদের মত হাত নাড়ছিল বড় ডোমটার সামনে। ক্ষিপ্তের মত এই হাতনাড়া অর্থ আসলে ব্যাকুল অভ্যর্থনা।

পর্দার সামনে থেকে সরে গিয়ে কেবিনে প্রবেশ করে ডানকান। দেখে মস্ত একটা স্যুটকেশের সঙ্গে রীতিমত ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে লেল্লি। গতি কমে আসার ফলে স্যুটকেশটা দেওয়ালের সঙ্গে পিষে ফেলতে চাইছিল ওকে। স্যুটকেশটা একদিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ওকে উদ্ধার করে ডানকান।

বলে—'আমরা এসে গেছি। স্পেশ-স্যুট পরে নাও।'

বড় বড় গোল চোখ মেলে ডানকানের পানে তাকায় লেল্লি। কথাটার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ওর মনে কি ধরনের ভাবের উত্থান পতন ঘটলো অথবা কোন চিন্তার আনাগোনা সুরু হলো—তা কিছুই বোঝা গেল না ওর মুখ থেকে। শুধু শুধোলে—'এখ্ পেথ্-ুট্। ইথ—O. K.'

এয়ার-লক ডোমে দাঁড়িয়ে বিদায়ী সুপারিনটেনডেন্ট প্রেশার ডায়ালের চাইতে বেশী মনোযোগ দিলে লেস্লির দিকে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে সে জানতো ঠিক কতখানি প্রেসার ছাড়লে বায়ুচাপে সমতা আসে। তারপর, ডায়ালের কাঁটাটার দিকে না তাকিয়ে খুলে ফেললে মুখের প্লেটটা।

বললে—'আমিও এরকম একজনকে আনলে পারতাম।' ভেতরের দরজাটা খুলে ফেলে সাদরে অভ্যর্থনা জানালে ডানকানদের—'আসুন।'

ডোমটার স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের জন্যে বিদঘুটে আকারের মনে হচ্ছিল প্রধান সিটিং-রুমটাকে। বেয়াড়া আকার ছাড়াও ঘরটা অসম্ভব নোংরা। প্রতিটি জিনিষই এলোমেলোভাবে ছড়ানো।

সুপারিনটেনডেন্ট বুঝতে পারে। বলে—'পরিষ্কার করবো করবো মনে করেও শেষ পর্যন্ত আর হয়ে ওঠেনি।' তারপর তাকায় লেস্লির পানে। ওর মুখ দেখে কিছুমাত্র বোঝা যায় না জায়গাটা সম্বন্ধে তার অভিমত কি। 'মঙ্গলগ্রহের মেয়ে?' শুধোয় ভদ্রলোক।

ডানকান বলে 'হ্যাঁ। অবাক চাহনি নিয়েই ওর জন্ম।'

তখনও একদৃষ্টে লেস্লির পানে তাকিয়ে থাকে ভদ্রলোক। শুধু তাকায় না, আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে থাকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে অন্তরীক্ষের প্রতিটি সৌন্দর্য-কণা। তারপর ফেরে ডানকানের পানে। বলে—'মজার চেহারা কি বলেন?'

ছোট্ট করে জবাব দেয় ডানকান—'যে গ্রহে ওর জন্ম, সে গ্রহে ওকে সবাই সত্যিকারের সুন্দরী বলেই জানে।'

'বটে, বটে। আমার কথা শুনে কিছু মনে করবেন না। এতকাল একলা থাকার ফলে সব কিছু মজার জিনিষ বলে মনে হচ্ছে।' বলে, বিষয় পরিবর্তন করে ভদ্রলোক 'আসুন, জায়গাটা দেখিয়ে দিই আপনাদের।'

যাতে ডানকানের কথা শুনতে পায়, তাই ইঙ্গিতে লেস্লিকে মুখের

প্লেটটা খুলে ফেলতে বলে ডানকান। তারপর, স্যুটটাও খুলে রাখতে নির্দেশ দেয়।

ডোমটা মামুলী ধরনের। দুটো দেওয়াল, দুটো মেঝে—মাঝখানের ফাঁকটা বায়ুশূন্য এবং বাইরেরটি ভেতরের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। পাথরের মধ্যে ধাতুর ডাণ্ডা ঢুকিয়ে দিয়ে শক্ত করে আটকে রাখা হয়েছে গোটা ডোমটি এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ এই ছোট আবাস স্থানটির সাথে বাইরের দুরন্ত পরিবেশের মিল নেই এতটুকু। দৈবাৎ একাধিক কর্মচারী এসে পড়লে যাতে কোনো অসুবিধে না হয়, তাই আরও তিনটে ঘর আছে লিভিংরুমে।

বিদায়ী ভদ্রলোক সব বুঝিয়ে দিলে 'বাকী যা দেখছেন, তা ষ্টেশনের গুদোম, খাবার দাবার, বাতাসের সিলিণ্ডার, টুকরো যন্ত্রপাতি আর জল—জল সম্পর্কে মেয়েটিকে একটু চোখে চোখে রাখবেন। বেশীর ভাগই মেয়েরই ধারণা জলের উৎপত্তি বুঝি শুধু নলের মধ্যেই।'

মাথা নেড়ে ডানকান বললে—'একথা মঙ্গলের মেয়েদের ক্ষেত্রে খাটেনা। মরুভূমির মধ্যে বসবাস করার ফলে জল জিনিষটার ওপর ওদের একটা স্বভাবজাত শ্রদ্ধা আছে।'

ষ্টোরের ধাতব চাদরটা সরিয়ে নিয়ে বিদায়ী ভদ্রলোক বললে— 'দেখেশুনে নিন এগুলো, পরে সই করে দেবেন'খন। কাজকর্ম বিশেষ কিছু নেই এখানে। মালপত্র বলতে শুধু দুষ্প্রাপ্য ধাতুর আকর মিশোনো পাথরের ডেলা। কখন 'ক্রেট' এসে পৌঁচোচ্ছে এখানে, সে খবর ক্যালিষ্টো থেকে পাবেন। আপনি ঐ রেডিও-বেকানটা টিপে দিলেও আপনা হতেই ক্রেটটা নেমে পড়বে ষ্টেশনে। আর এখান থেকে পাঠানোর সময়ে 'টেব্‌ল্‌' অনুসারে কাজ করলেই কোন ঝামেলা হবে না আপনার।' ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে আবার বলে ভদ্রলোক 'পৃথিবীতে থাকার মতই স্বাচ্ছন্দ্য পাবেন এখানে। বই পড়ার অভ্যাস আছে? ঐ দেখুন কত বই।' ঘরের একদিকের দেওয়াল প্রায় অর্ধেক ঠাসা বইয়ের সারিতে।

ডানকান জানালে পড়ুয়া হিসেবে ওর বিশেষ সুনাম নেই।

'গান ভালবাসেন?'

'তা বাসি।'

'হুম। গানটা এড়িয়ে গেলেই ভাল। এরকম অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতার মধ্যে গানের কলিগুলো ক্রমাগত পাক খেতে থাকবে আপনরে মাথার মধ্যে। দাবা খেলেন? আঙুল তুলে দাবাবড়ের ছকটা দেখিয়ে দেয় সে।

মাথানাড়ে ডানকান।

আরও দু'চারটি কথার পর আনন্দে উল্লোল হয়ে বিদায় গ্রহণ করে ভদ্রলোক।

মালপত্র নামানো হলো জাহাজ থেকে! ধাতুর আকর মিশোনো পাথর তোলা হলো জাহাজের খোলে। ক্যালিষ্টো থেকে একটা ছোট্ট ফেরী-রকেট এসে কাজ সেরে চলে গেল। জাহাজের ইনজিনীয়াররা ষ্টেশনের কলকব্জা পরীক্ষা করে যেখানে যা মেরামত করার, পুরোনো অংশ বদলে নতুন অংশ লাগানো, জলের ট্যাঙ্ক ভর্তি করা, বাতাসের শূন্য চোঙাগুলোর চার্জ দেওয়া ইত্যাদি সব কিছুই করলে। সবশেষে O. K. বলার আগে বার বার পরীক্ষা করে দেখে নিলে কোথাও কোনো গলদ আছে কিনা।

একটু আগেই যেখানে প্রাক্তন সুপারিনটেনডেন্ট তাণ্ডব নাচ নেচেছে, সেইখানেই ধাতুর অ্যাপ্রন পরে এসে দাঁড়ালো ডানকান। চোখের সামনে দিয়ে সিধে ওপরে উঠে গেল মহাকাশ জাহাজটা। তীর বেগে নয়, ধীরে ধীরে, জেটগুলোর মৃদু ঠেলায়। কালো আকাশের পটভূমিকায় ঝকমক করতে লাগল জাহাজের লম্বাটে ধরনের আকার। তারপর অগ্নিবর্ষণ সুরু হলো প্রধান জেটগুলোয়। রাশি রাশি সাদা শিখা বেরিয়ে এল ভেতর থেকে দেখতে দেখতে বিন্দুর মত এতটুকু হয়ে গেল অতবড় জাহাজটা এবং তারপরেই তা হারিয়ে গেল শ্রীহীন পর্বতমালার ওদিকে।

আচম্বিতে ডানকানের মনে হলো সে নিজেই যেন একটা বিন্দুর মতোই হারিয়ে গেল। এই অনন্ত মহাকাশে এককণা ধুলোর মতই ভাসছে এই স্যাটেলাইট এবং তারই বুকে বিন্দুর মত রয়ে গেল তার অস্তিত্ব। আশপাশের উদাসীন আকাশের কোন পরিমাপ নেই। নিঃসীম আদিঅন্তবিহীন কালো শূণ্যতার মাঝে বুঝি নিতান্ত অকারনেই, বিনা উদ্দেশ্যেই ভেসে চলেছে তার জননী সূর্যের সাথে আরও নিযুত সূর্য।

স্যাটেলাইটটার রুক্ষ পাথুরে কিনারা, চড়াই আর অসম্ভব খোঁচাখোঁচা শৈলমালারও বুঝি কোনো পরিমাপ নেই। কোনদিকটা যে কাছে আর কোনটা দূরে, তা বোঝার ক্ষমতা ছিল না ওর। উঁচুনীচু জমি আর কালির মত কালো ছায়ার জটিলতা ভেদ করে পাহাড়গুলোর প্রকৃত আকার কিরকম, তাও বুঝতে পারলো না ডানকান। এরকম বিচিত্র চেহারার পাথুরে দেশ পৃথিবী তো দূরের কথা, মঙ্গলেও দেখেনিও। বায়ুমণ্ডলের অভাবে ক্ষয়িত হতে পারেনি খোঁচা খোঁচা পাথরের ধারগুলো; তাই শাণিত ব্লেডের মতই ধারালো এখানকার পাথুরে ফলা। লক্ষ লক্ষ বছর কেটে গেছে। এতটুকু ভোঁতা হয়ে যায়নি এই ধার; যতদিন মহাশূণ্যের মাঝে অস্তিত্ব থাকবে উপগ্রহের, ততদিন এইরকমই ধারালো থেকে যাবে পাথরগুলো।

লক্ষ লক্ষ পরিবর্তনহীন বছর বিস্তৃত হয়ে পড়ল ওর সামনে ওর পেছনে। ও শুধু নিজে নয়, সারা জীবনটাই যেন একটা অকিঞ্চিৎকর ধূলিকণা, একটা ক্ষণস্থায়ী দুর্ঘটনা, ব্রহ্মাণ্ডের অসীম রহস্যের কাছে যা নিতান্তই অদরকারী। চিরন্তন সূর্যদের কিরণধারায় ক্ষণিকের সুযোগের আশায় অদ্ভুত ছোট্ট একটা অণু যেন নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। বাস্তব তো শুধু ঐ আগুনের গোলা আর পাথরের পিণ্ড যা অকল্পনীয় সময়ের মধ্যে দিয়ে, অপরিমেয় শূণ্যতার মধ্যে গড়িয়ে চলেছে তো চলেইছে; চিরটা কাল এমনিভাবেই চলেছে এবং চলবেও চিরকাল ধরে।

উত্তপ্ত স্যুটের মধ্যে শিউরে ওঠে ডানকান। কাঁপুনির স্রোত বয়ে যায় মেরুদণ্ড বেয়ে। জীবনে কোনোদিন এরকম নিঃসঙ্গতা অনুভব করেনি সে। মহাকাশের এই বিশাল, ভয়াবহ, নিষ্ফল একাকীত্ব সম্বন্ধে এভাবে কোনোদিন সচেতন হয়ে ওঠেনি ও। লক্ষ লক্ষ বছর আগে যে আলোক সুদূর কোন নক্ষত্র থেকে নির্গত হয়েছিল, তারই ক্ষীণরশ্মি এসে পড়ে ওর দুই চোখের মণিকায়—থমথমে ভয়াবহ সেই বিপুল তমিস্রার পানে তাকিয়ে অপরিসীম বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায় ডানকান।

নিজেই প্রশ্ন করে নিজেকে—'মানে কি এ সবের ?'

নিরুত্তর প্রশ্নের শব্দই ভেঙে চুরমার করে দেয় ওর তন্ময়তা, সম্বিৎ ফিরে পায় ও। মাথা ঝাঁকিয়ে মগজ থেকে নির্বাসন দেয় যতকিছু মানসকল্পিত বাজে দর্শনবাদ। ফিরে আসে পুরোণো ব্রহ্মাণ্ডে—যে ব্রহ্মাণ্ডের পটভূমিকায় স্পন্দিত হচ্ছে মানুষের এবং আরও ব্যাপক-ভাবে সমস্ত জীবনের ধারা। জোরে জোরে পা ফেলে এয়ারলকের মধ্যে ঢুকে পড়ে ও।

পূর্বতন সুপারিনটেনডেন্ট যেমনটি বলে গেছিল, কাজকর্ম দেখা গেল সেই রকমই খুবই অল্প। পূর্বনির্দিষ্ট সময়ে ক্যালিস্টোর সাথে রেডিও যোগে সংযোগ স্থাপন করলে ডানকান। অপর পক্ষের অস্তিত্ব আছে কিনা, কর্তব্যের খাতিরে শুধু এইটুকু জানার জন্যেই রেডিও মারফৎ কথাবার্তা বলতো না ওরা। অনেকরকম কথা হতো ওদের মধ্যে, মাঝে সাঝে দু'একটা দরকারী খবর পাঠাতো, জানিয়ে দিতো কখন বেকন-সুইচ টিপতে হবে। তারপরেই আস্তে আস্তে ভাসতে ভাসতে নেমে আসতো সিলিণ্ডার ক্রেট। এরপর তা নামিয়ে নিয়ে মাল খালাস করাটা অতি সহজ কাজ।

অত্যল্প ছোট স্যাটেলাইটের দিনটা। আর রাতটা ঝকমক করতো ক্যালিস্টো, আবার কখনো বৃহস্পতির আলোয়। কাজেই ডানকানরা এখানকার রাতদিনের হিসেবকে আমোল না দিয়ে

ক্যালেণ্ডার ঘড়ি অনুসারে দিনপাত করতে লাগল। ক্যালেণ্ডার ঘড়িতে পৃথিবীর গ্রীনউইচ মেরিডিয়ান সেটিংয়ের সময় পাওয়া যেত। প্রথম প্রথম বেশ ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল ডানকানকে জাহাজ থেকে নামিয়ে দেওয়া মালগুলোকে পাচার করার জন্যে। কতকগুলো প্রধান ডোমটায় আনতে হলো। ওদের নিজেদের দরকার সেগুলো তাছাড়া, যে সব জিনিষ বাতাস আর উত্তাপের মধ্যে ভালভাবে সংরক্ষিত থাকে, সেগুলোকে আনতে হলো ডোমের মধ্যে। কিছু গেল বাতাসহীন উত্তাপহীন ছোট্ট ডোমটায়। বেশীরভাগ মালই সযত্নে সিলিণ্ডারের মধ্যে পুরে প্যাড লাগিয়ে ক্যালিষ্টো পাঠাতে হলো। এসব দায়িত্ব শেষ হওয়ার পর বাস্তবিকই আর কোনো কাজই রইল না ওর হাতে।

ডানকান একটা কর্মসূচী তৈরী করে নিলে। নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে এটা সেটা পরীক্ষা করে দেখবে সঠিক আছে কি না। বাইরে বেরিয়ে গিয়ে দেখবে সূর্য-মোটরটা ঠিকমত চলছে কি না। কিন্তু অদরকারী কর্মসূচী অনুসারে কাজ করতে হলে যথেষ্ট মনোবল এবং দৃঢ়তা থাকা দরকার। উদাহরণ স্বরূপ, সূর্য-মোটর এমনভাবে তৈরী যে কেউ দেখাশুনা না করলেও দীর্ঘকালের জন্যে তার মধ্যে এতটুকু গলদ দেখা যাবে না। যদি কোনো গোলমাল দেখা যায়, তাহলে তার একমাত্র করণীয় হলো সঙ্গে সঙ্গে ক্যালিষ্টোতে খবর পাঠিয়ে একটা ফেরী রকেট আনা এবং সেই রকেটেই স্বয়ংক্রিয় মেশিনটাকে ক্যালিষ্টোতে পাঠানো। কোনো জাহাজ এলে তারাই মেরামত করে দিয়ে যাবে মোটরটা। কোম্পানী খুব ভাল করেই সমঝে দিয়েছে ওকে যে কলকব্জার গুরুতর গণ্ডগোল দেখা গেলে মূল্যবান পাথরের ভাঁড়ার নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে স্যাটেলাইট ত্যাগ করতে পারে সে। তবে স্যাটেলাইট ত্যাগ করার জন্যেই কেউ যদি কলকব্জা বিগড়ে দেয় ইচ্ছে করে, তবে তার পরিণামটা খুব সুখপ্রদ হবে না। যাই হোক, প্রোগ্রাম অনুসারে বেশীদিন সময় হত্যা করা সম্ভব হল না ডানকানের পক্ষে।

মাঝে মাঝে ডানকান ভাবত সত্যিসত্যিই কি লেল্লিকে এনে উপকার হয়েছে ওর? বিশুদ্ধ কার্যকরী কোণ থেকে দেখলে, ডানকান ওর মত খাসা রান্নাবান্না করতে পারতো না ঠিক এবং সম্ভবত ওর পূর্বসূরীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে শুওরের খোঁয়াড় বানিয়ে তুলত ঘরটাকে। কিন্তু লেল্লি যদি না থাকত, তাহলে নিজেকে ব্যস্ত রাখার মত প্রচুর কাজ পেত ডানকান। আর, সঙ্গদানের কোণ থেকে বিচার করলে, সে মেয়ে বটে, সঙ্গিনীও বটে, কিন্তু সে ভিন্ গ্রহের মানুষ, বিচিত্র তার প্রকৃতি। অনেকটা আধা-রোবটের মত। তার ওপরে বোবা। মোটেই আমোদপ্রদ নয় এ ধরনের সঙ্গ। এ ছাড়াও মাঝে মাঝে ওর চাহনি দারুণভাবে খিঁচড়ে দিয়েছে ডানকানের মেজাজ। ক্রমশ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল এই মেজাজখিঁচিয়ে হয়ে যাওয়া। ওর চলাফেরা, ওর ভাবভঙ্গী, একান্তই যখন কথা বলে তখন ওর বোকার মত নিছক কাজের কথা, কথা না বলার সময়ে ওর আস্থস্থ নীরবতা, ওর আত্মকেন্দ্রিকতা, ওর সব ব্যাপারেই উদাসীনতা, আর ও না এলে ২,৩৬০ পাউণ্ড পকেটে থাকার সম্ভাবনাটা······সব কিছুই একটু একটু করে জ্বালা ধরিয়ে দিতে লাগল ডানকানের মনে। কিন্তু দুর্বলতাগুলো ঢাকবারও এতটুকু প্রয়াস দেখা গেল না ওর মধ্যে। যেমন ধরা যাক, ওর মুখ। যে কোনো মেয়েই নিজের মুখটি অধিকতর সুন্দর করে তোলার জন্যে এমন কিছু নেই যা করতে বাকী রাখে। কিন্তু লেল্লি সে জাতের মেয়েই নয়! তারপরে ঐ অদ্ভুত ভুরু—ঠিক যেন একটা নেতিয়ে পড়া সঙ! লেল্লি কিন্তু নির্বিকার।

ডানকান একবার ওকে বলেছিল—'ঈশ্বরের দোহাই, তোমার বিটকেল ভুরু দুটোকে একটু সিধে করো। কি করে তা করতে হয়, তা কি এখনো শেখোনি তুমি? মুখের রঙগুলোও তো দেখছি আগাগোড়া ভুল জায়গায় রয়েছে। ঐ ছবিটা দেখো—এবার আয়নায় নিজের মুখটা দেখো। তালতাল লাল রঙ এলোপাতাড়িভাবে ছড়িয়ে পড়েছে মুখময়। আর ঐ চুলগুলোও তেমনি: আবার সামুদ্রিক

গুল্মের মত জট পাকিয়ে উঠেছে। চুল আঁচড়ানোর, চুলে ঢেউ তোলার সব সরঞ্জামই রয়েছে যখন তখন চুল আঁচড়াও। চুল ঢেউ খেলানো করো। আর, ঐ রকম জলকন্যার মত তাকানো বন্ধ করো। আমি জানি, হাজার চেষ্টা করলেও মঙ্গলবাসীর মতই দেখাবে তোমাকে। কিন্তু চেহারাটাকে অন্তত মেজেঘষে সত্যিকারের মেয়ে-মানুষের মতও কি সাজিয়ে রাখতে পারো না?'

রঙীন ছবিটার পানে ক্ষণেক তাকিয়ে রইল লেল্লি। তারপর আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের সঙ্গে ছবিটা মিলিয়ে দেখে একই রকম উদাসীন স্বরে বললে—'ইথ—O. K.।'

নাকের মধ্যে গর্জন করে উঠল ডানকান—'এই আর এক ন্যাকামো—কচি খুকির মত কথা বলা। 'ইথ' নয়—ইয়েস। ই-য়ে-স, ইয়েস। বলো, 'ইয়েস'।'

'ইথ', তৎক্ষণাৎ বললে লেল্লি।

'ওঃ, পার্থক্যটা কি কিছুতেই তোমার মাথায় আসছে না? স্-স্-স্, থ-থ-থ নয়। ইয়ে-স্ স্ স্।'

'ইথ', বলে লেল্লি।

'না।'

এইভাবেই চললো কিছুক্ষণ শিক্ষকতা। শেষে দারুণ রেগে উঠল ডানকান।

"বাঁদরামো হচ্ছে আমার সঙ্গে! সাবধান লেল্লি, বেশী বাড়াবাড়ি করোনা। এবার বলো দিকি: 'ইয়েস'।"

রাগে থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করতে থাকে লেল্লি। তারপর নার্ভাস স্বরে বলে—'ই-য়েথ।

চকিতে ওর মুখের ওপর সজোরে চপেটাঘাত করে ডানকান। এতটা জোরে মারার ইচ্ছে না থাকলেও বেশ জোরেই এসে পড়ে চড়টা। টাল সামলাতে পারে না লেল্লি, বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় মেঝের সঙ্গে ওর চুম্বক সংযোগ। এবং তৎক্ষণাৎ শূন্য দিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে

বাঁ করে ভেসে যায় ঘরের অন্য প্রান্তে। ওদিককার দেওয়ালে প্রতিহত অসহায়ভাবে দেহটা ভাসতে থাকে শূন্যে, নাগালের বাইরে। পেছন পেছন ছুটে গিয়ে কোন রকমে ভাসমান শরীরটা টেনে নামায় ডানকান। তারপর ওকে ছপায়ের ওপর খাড়া করে দিয়ে ডানহাত তোলে শূন্যে আর বাঁ হাত বাড়িয়ে গলার নীচের পোষাকটা তাল পাকিয়ে ধরে মুঠোর মধ্যে।

'আবার' হুংকার দিয়ে ওঠে ডানকান।

অসহায়ভাবে এদিকে ওদিকে দৃষ্টি ঘুরতে থাকে লেল্লির। সজোরে ঝাঁকানি দেয় ডানকান। আবার চেষ্টা শুরু করে লেল্লি। ছবারের বার কোনরকমে বলে—'ইয়েথস্।'

তখনকার মত এতেই সন্তুষ্ট হয় ডানকান।

'দেখছো, চেষ্টা করলেই বলতে পারো। চড়চাপড়েই সবকিছু হয়। তোমার দরকার এখন কড়া শাসন—আর কিছু নয়।'

বলে, ওকে ছেড়ে দেয় ডানকান। সরু সরু রক্তরেখা জমা মুখটা ছহাতে ঢেকে টলতে টলতে ঘরের অন্য প্রান্তে চলে যায় লেল্লি।

ধীরে ধীরে কাটতে থাকে এক একটি সপ্তাহ। শম্বুক গতিতে বয়ে চলে সময়ের প্রবাহ। অস্বাভাবিক দীর্ঘ মনে হয় এক একটি মাসকে। ডানকান প্রায় ভাবে, শেষ পর্যন্ত কি মস্তিষ্কের সুস্থতা বজায় রাখতে পারবে ও এই অসহ্য নির্বাসনের ভারে?

কদাচিৎ ম্যাগাজিনের রচনায় চোখ বুলানো ছাড়া পড়ার বাতিক যার একেবারেই নেই, এ-রকম প্রকৃতি মাঝবয়েসী পুরুষের পক্ষে দিনের পর দিন মাসের পর মাস বইয়ের পাতায় নাক ডুবিয়ে বসে থাকা মোটেই সম্ভব হয় না। জনপ্রিয় রেকর্ডগুলোও শেষকালে একঘেয়ে হয়ে উঠলো ওর কাছে—বাকী গানগুলোর আস্বাদই গ্রহণ করতে পারল না ও। বই পড়ে দাবাখেলা শিখল ডানকান। লেল্লিকেও শেখালো। তারপর খেলাটা রপ্ত করে ক্যালিষ্টোর লোকটাকে নাজেহাল করার জন্যে লেল্লির সঙ্গে বসতো ছক পেতে। কিন্তু আশ্চর্য

উপায়ে প্রতিবারেই কিস্তিমাৎ করতে লাগল লেল্লি। শেষে ডানকান এই সিদ্ধান্তে পৌঁছোলো যে দাবাখেলার মত মনের গড়ন তার নয়।

মাঝে মাঝে রেডিও মারফৎ খবর আর গান বাজনা আমোদ প্রমোদ শুনতে পেত ডানকান। কিন্তু পৃথিবী ভাসছে তখন সূর্যের অপরদিকে, মঙ্গলের অনেকখানি ঢাকা পড়ে গেছে ক্যালিষ্টোর অবস্থান আর বৃহস্পতি IV/II উপগ্রহের আবর্তনের ফলে। কাজেই রেডিও দিয়ে পৃথিবী বা মঙ্গলের গানবাজনা শোনা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাঝে মাঝে ধরা গেলেও তা এতই ক্ষীণ যে কহতব্য নয়।

কাজেই বেশীর ভাগ সময়ে চুপচাপ বসে ফুঁশতে থাকত ডানকান। নিদারুণ রাগ হতো নিজের ওপর। স্যাটেলাইটটাকেও ঘৃণা করতে শুরু করেছিল সমস্ত অন্তর দিয়ে। আর আগুনে ঘি পড়তো লেল্লির আচরণে -তেলেবেগুনে জ্বলে উঠত ডানকান।

ওর প্রতিটি কাজের মধ্যে সেই একঘেয়ে গা ঘিন-ঘিনে ভাবটা দেখলেই রাগ সামলাতে পারতো না ডানকান। একদিন চটে গিয়ে বলল—'ঐ নির্বোধ মুখটায় কি আর কোনরকম ভাব তুমি ফোটাতে পারো না, হাসতে পারো না। কাঁদতে পারো না, পাগলের মত আর কিছুই কি করতে পারো না? ঈশ্বরের দোহাই, যা হয় একটা নতুন ভাব ফুটিয়ে তোলো ঐ মুখে।'

গোল গোল চোখে সমানে ওর পানে তাকিয়ে থাকে লেল্লি— পরিবর্তনের ছায়াপাত তো দূরের কথা সামান্যতম আভাসও পাওয়া যায় না ওর ঐ বিচিত্র মুখে।

'নাও, শুরু করো। যা বলছি, তা শোনো! হাসো!'

সামান্য একটু বেঁকে যায় ওর মুখ।

'এই নাকি হাসি! হাসি কাকে বলে, তা যদি দেখতে চাও, দেখো এই ছবিটা।' পিয়ানোর কী-বোর্ডের মত দাঁত বার করা লাস্যময়ী একটা মেয়ের ছবির দিকে আঙুল তোলে ডানকান। 'ঠিক ঐ

রকম! ঠিক এই রকম।' বলে নিজেও আকর্ণবিস্তৃত হাসি হাসে ডানকান।

'না' বলে লেল্লি। 'পৃথিবীর মানুষের মুখের মত আমার মুখ মোচড়াতে পারে না।'

'মোচড়ানো' দপ করে জ্বলে ওঠে ডানকান। 'মোচড়ানো!' চেয়ারের স্প্রিং আচ্ছাদন থেকে নিজেকে মুক্ত করে লেল্লির দিকে এগিয়ে যায় ও! লেল্লিও পিছুতে থাকে। পিছু হটতে হটতে সেঁটে যায় দেওয়ালের সঙ্গে। 'আমিই মুচড়ে দিচ্ছি তোমার ঐ জঘন্য মুখটাকে। শুরু করো—হাসো।' ওপরে হাত তোলে ডানকান।

দু'হাতে মুখ ঢাকা দিয়ে চীৎকার করে ওঠে লেল্লি—'না! না—না—না!'

ঠিক যেদিন আটমাস পূর্ণ হলো, সেইদিনই ক্যালিস্টো থেকে খবর এলো একটা জাহাজ আসছে এদিকে। দিনছয়েক বাদে জাহাজটার সঙ্গে ডানকান নিজেই রেডিও-সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হলো। জানা গেল, হপ্তাখানেকের মধ্যে এসে পৌঁচোচ্ছে জাহাজটা।

শুরু হলো আবার কাজের আনন্দ। ষ্টোর পরীক্ষা করা, ঘাটতি যা আছে তা লিখে রাখা, নেই-নেই-নেই মন্তব্যগুলো তালিকায় লিখে লিষ্টটা আপ-টু-ডেট করা এবং আরও অনেক প্রস্তুতি-পর্ব নিয়ে দিবারাত্র ব্যস্ত হয়ে রইল ডানকান। কাজের ফাঁকে ফাঁকে গুন্ গুন্ সঙ্গীতও শোনা যেতে লাগল ওর কণ্ঠে। লেল্লিকে দেখলেই আর তেমনভাবে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে না ওর মেজাজ। লেল্লির মনে এ সুখবরের প্রতিক্রিয়া যে কি ধরনের, তা ওর মুখ দেখে বোঝার সাধ্য ছিল না ডানকানের।

কাঁটায় কাঁটায় নির্দিষ্ট সময়ে মাথার ওপর ঝুলতে দেখা গেল জাহাজটাকে। জেটগুলোর উর্ধমুখ প্রক্ষেপণের ফলে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠতে লাগল জাহাজটার আকার। ষ্টেশনে এসে নামার সঙ্গে সঙ্গে এয়ার-লকের মধ্যে দিয়ে ভেতরে গেল ডানকান। দু'চোখে যা

দেখে, মনে হয় তাই বুঝি কতদিনের পুরোনো বন্ধু। সাদরে ওকে অভ্যর্থনা জানায় ক্যাপ্টেন। সবই রুটিন মাফিক—কথাবার্তা আচার ব্যবহার সবই ছকবাঁধা, তবুও তা কত মিষ্টি। এই বাঁধাধরা প্যাটার্ণের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা গেল যখন ক্যাপ্টেন তার পাশের লোকটির সাথে ডানকানের আলাপ করিয়ে দিল।

'সুপারিনটেনডেণ্ট, আপনাকে অবাক করে দেওয়ার একটা খবর এনেছি। ইনি ডক্টর হুইণ্ট। আপনার নির্বাসন যন্ত্রণার কিছু অংশ ইনিও নেবেন।'

করমর্দন করে সবিস্ময়ে শুধোয় ডানকান— 'ডক্টর?'

'ওষুধের নয়—বিজ্ঞানের।' বলেন অ্যালান হুইণ্ট। 'ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে জরীপ করার জন্য কোম্পানী পাঠিয়েছে আমাকে। 'ভূ' শব্দটা যদিও ভুল···এক্ষেত্রে অন্তত তা ব্যবহার করা উচিত নয়। বছর খানেক থাকবো। আশা করি আপনার আপত্তি নেই।'

ডোমে পৌঁছোনোর পর লেল্লিকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন অ্যালান হুইণ্ট। ডানকানের যে একজন সঙ্গিনী আছে, তা তো কেউ তাঁকে বলেনি। ডানকানের কথার মাঝেই তাই তিনি বলে ওঠেন:

'আপনার স্ত্রীর সাথে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন না তো?'

একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে গেলে যতখানি সৌজন্য প্রদর্শনের প্রয়োজনের হয়, তার ধার দিয়েও গেল না ডানকান। অ্যালান হুইণ্টের কণ্ঠে ঈষৎ ভর্ৎসনার সুর শুনে ওর মনও খিঁচড়ে গিয়েছিল। তাছাড়া, এমনভাবে লেল্লিকে সম্ভাষণ জানালেন ভদ্রলোক যেন পৃথিবীরই কন্যা সে। আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য করে ডানকান; লেল্লির গালের সরু সরু রক্তরেখাগুলো অ্যালান হুইণ্টের নজর এড়োয়নি। মনে মনে ভদ্রলোককে ভদ্র ধুরন্ধরের পর্যায়ে ফেলে ডানকান।

গোলমালের সূত্রপাত হলো মাসতিনেক পর থেকেই। এর

আগেও কয়েকবার ঠোকাঠুকি লাগার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই আর হয় নি। না হওয়ার কারণ অধিকাংশ সময়েই ডোমের বাইরে থাকতে হতো অ্যালানকে কাজের খাতিরে। কাজেই অশান্তি ধূমায়িত হলেও বিস্ফোরণের সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু সেদিন আর ঠেকানো গেল না। একটা বই পড়ছিল লেলি। আচমকা মুখ তুলে ও শুধোলে…'নারী স্বাধীনতা' বলতে কি বোঝায়?'

অর্থ টা সবে বলতে শুরু করেছে অ্যালান, প্রথম বাক্যও তখনো শেষ হয়নি, এমন সময়ে ফস করে ডানকান বলে উঠল—'শুনুন—এসব ধারণা ওর মাথায় ঢুকিয়ে দিতে কে বলেছে আপনাকে?'

দুই কাঁধ অল্প ঝাঁকিয়ে অ্যালান বললে—সব বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা তার মাথায় না ঢুকিয়ে দেওয়ার পেছনে কোনো যুক্তি আছে কি? এ অধিকার তো প্রত্যেকেরই আছে।'

'আমি কি বলতে চাইছি তা আপনি বুঝেছেন।'

'আপনাদের মত লোকেরা যারা মনের কথাকে মুখের ভাষায় ব্যক্ত করতে পারেন না, তাদের কথা আমি একদম বুঝতে পারিনা। আর একবার চেষ্টা করুন।'

'ঠিক আছে। আমি যা বলতে চাইছি, তা এই: উদ্ভট কতকগুলো ধারণা নিয়ে এখানে আগমন ঘটেছে আপনার। আবোল তাবোল কতকগুলো কথা দিয়ে ওর সঙ্গে এমন বেয়াড়া ব্যবহার করেন যেন পৃথিবীর কোনো সেরা সুন্দরীর আবির্ভাব ঘটেছে এ অঞ্চলে।'

'আপনি তা লক্ষ্য করেছেন দেখে খুশী হলাম।'

'আপনি কি মনে করেন এ সবের উদ্দেশ্য কি তা আমি বুঝিনি?'

'আপনি যে বোঝেন নি, সে বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত আমি। অত্যন্ত কুৎসিত আপনার মন। আপনার মোটা চিন্তা দিয়ে আপনি মনে করেন মেয়েটাকে বশ করার বদ মতলব রয়েছে আমার। আপনার ঐ দুহাজার তিনশ ষাট পাউণ্ডের মাপকাঠি দিয়ে বিচার

করে তাই আপনার শংকার আর অবধি নেই। কিন্তু দারুণ ভুল করেছেন আমি। আমার কোন কু-অভিপ্রায়ই নেই।'

মুহূর্তের জন্যে থতমত খেয়ে যায় ডানকান। তারপর :

শুধরে দিয়ে বলে—'আমার স্ত্রী! বোবা মঙ্গলবাসী হলেও আমার আইনসম্মত বধূ সে।'

'ঠিক বলেছেন, লেলি মঙ্গল গ্রহেরই বাসিন্দা বটে। যতদূর জানি, সে আপনার বধূও বটে কিন্তু বোবা সে নয় নিশ্চয়। কি অবিশ্বাস্য বেগে পড়াশুনায় উন্নতি করছে ও তা কি কোন দিন লক্ষ্য করেছেন আপনি? কোনো কিছু একবার ওকে দেখিয়ে দিলেই হলো। বারবার সে বিষয়ে আর তালিম দেওয়ার দরকারই হয় না। আপনার মাতৃভাষার মাত্র কয়েকটি শব্দ ছাড়া আপনি এ ভাষায় লেখা বই পড়াতো আপনার ক্ষমতার অতীত! কিন্তু দেখুন ওকে। অপরের ভাষা শিখে নিয়ে কতখানি পাণ্ডিত্য অর্জন করেছে ও।'

'ওকে কিছুই শেখানোর দরকার নেই। আপনার কাজও নয় সেটা। পড়াশুনোর ওর কোনো প্রয়োজনই নেই। না পড়েই বেশ ছিল ও।'

'শত শত বছর পরেও শুনি সেই দাসব্যবসায়ীর কণ্ঠস্বর! যাই হোক, আর কিছু করতে না পারি, ওকে আকাট মূর্খ বানিয়ে রাখার প্ল্যানটা আমি বানচাল করে দিয়েছি।'

'কেন শুনি? না, ও যাতে আপনাকে একটা বিরাট মানুষ বলে মনে করে! ঠিক এই মতলব নিয়েই এত মধুর উক্তি শোনান ওকে, এত করুণা, উদারতা প্রকাশ করেন হাবভাবে কথায় বার্তায়। আপনি যে আমার চাইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ, সেইটাই প্রতিপন্ন করাটাই আপনার মূল লক্ষ্য।'

'সব মেয়ের সঙ্গে যেভাবে কথা বলি, ঠিক সেই ভাবেই কথা বলি ওর সাথেও। বরং আরও একটু সরল হই, প্রাণখোলা হই, কেন না শিক্ষিতা হওয়ার কোনো সুযোগই তো পায় নি ও।'

'আমাদের দুজনের মধ্যে পুরুষ হিসেবে কে যে বড়, তা আমি শীগগিরই দেখিয়ে দেব আপনাকে—'

'তার দরকার হবে না। আপনি যে কি প্রকৃতির লোক, তা আমি এখানে আসামাত্র জেনেছিলাম। প্রকৃতি এ রকম না হলে কি এই জাতীয় কাজে বহাল করা হয় আপনাকে। আপনি যে আসলে একটা পশু, তাও আবিষ্কার করতে আমার বেশীদিন লাগেনি। আপনি কি মনে করেন ওর গালের ঐ রাঙা দাগগুলো আমি দেখিনি? আপনি কি মনে করেন মেয়েটার ওপর আপনার ঐ জানোয়ারের মত অত্যাচার আমি উপভোগ করে এসেছি এতদিন? ইচ্ছা করেই মেয়েটাকে আপনি নিরক্ষর অজ্ঞ রেখে দিয়েছিলেন। প্রতিবাদ করার মত, রুখে দাঁড়াবার মত এতটুকু শক্তি ওর মধ্যে জাগতে দেননি আপনি। অথচ আপনার চাইতে দশগুণ বেশী বুদ্ধিমত্তা আর অনুভূতি আছে ওর মগজের প্রতিটি কোষে। আপনাকে দেখলেই বমনোদ্রেক হয় আমার।'

রাগের মাথায় বমনোদ্রেক হওয়াটা কাকে বলে, তা আর কিছুতেই মনে করতে পারলো না ডানকান। না পারলেও বিশ বছর মহাকাশ ভ্রমণের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে একটা জিনিষ ও শিখেছিল; তাহলো ভারহীন অবস্থায় মারপিট করাটা নিতান্তই হাস্যকর আহাম্মুকি ছাড়া আর কিছুই নয়।

যাই হোক, কোনো মতে তখনকার মত ইতি করে দেওয়া হলো এই তুমুল বিবাদের। আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এল সব কিছুই।

আগের মতই ছোট্ট যানটায় অভিযান চালিয়ে যেতে লাগলেন অ্যালান। পুঁচকে যানটা সঙ্গে এনেছিলেন উনি শুধু এই কাজের জন্যেই। উপগ্রহের অন্য দিকে গিয়ে পাথরের নমুনা সংগ্রহ করে ফিরে আসতেন উনি। তারপর সেগুলো পরীক্ষা করে, সাজিয়ে, সযত্নে লেবেল লাগিয়ে তুলে রাখতেন আধারে। বাকী সময়টা আগের মতই ব্যয় করতে লাগলেন জোন্নিকে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান দান করে।

এ শিক্ষকতা যে শুধু নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্যেই ও করছে না, করা উচিত বলেই করছে—তা অস্বীকার করতে পারেনি ডানকান। কিন্তু ও জানতো, দুয়ে দুয়ে যোগ করলেই চার হয়, এক ঘটনা থেকে সূত্রপাত হয় আর এক ঘটনার। অ্যালানকে আরও নমাস থাকতে হবে এই উপগ্রহে। যতই দিন যাচ্ছে, ততই আদর্শ পুরুষের মত অ্যালানকে শ্রদ্ধাভক্তি করতে শুরু করেছে লেল্লি। যতই দিন যাচ্ছে, ততই মেয়েটাকে তিল তিল করে ধড়িবাজ লোকটা বিগড়ে দিচ্ছে শিক্ষাদানের অজুহাতে কতকগুলো উদ্ভট ধারণা ওর মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে। তারপর ওরা যেদিন প্রস্তুত হবে সবদিক দিয়ে, সেদিনই দরকার হবে পথের কাঁটা ডানকানকে দুজনের মধ্য থেকে সরিয়ে দেওয়ার। ব্যাপারটা বেশী দূর গড়ানোর আগেই তা অংকুরেই বিনাশ করে দেওয়া ভালো। এ নিয়ে যথেষ্ট কেলেংকারী হয়েছে, আর দরকার নেই।

আর দরকারও ছিল না।

একদিন রুটিন মাফিক ছোট্ট যানটা নিয়ে স্যাটেলাইটের অপর দিকে উড়ে গেলেন অ্যালান হুইন্ট। আর ফিরে এলেন না। ব্যাস, আর কিছু না।

লোকটার আচম্বিতে উধাও হওয়া নিয়ে লেল্লি কি ভেবেছে তা বোঝা না গেলেও একটা পরিবর্তন দেখা গেল ওর মধ্যে।

বেশ কয়েকদিন বেশীর ভাগ সময় ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল লিভিং রুমের বড় জানলাটার সামনে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এইভাবে দাঁড়িয়ে থেকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল বাইরের নিঃসীম অন্ধকারের পানে, কচিৎ দু' একটা কম্পমান নিস্তেজ আলোর কণার পানে। ও যে অ্যালানের অপেক্ষায় এভাবে দাঁড়িয়ে ছিল, তা ঠিক নয় এই কারণে যে ছত্রিশ ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর ডানকানের মত সে-ও বুঝেছিল অ্যালানের ফিরে আসার আর কোনো সম্ভাবনা নেই! কোনো কথাই বলতো না ও। ওর জন্মগত অবাক মুখভাবের মধ্যেও এতটুকু

পরিবর্তনের ছোঁয়া দেখা গেল না। স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা গেল শুধু ওর চাহনিতে; এ দৃষ্টি আগের মত আর ততটা প্রাণময় নয়—যেন ঐ চাহনির আরও অন্তরালে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে ও।

লেস্লি কিছু জানে কি না অথবা কিছু আঁচ করতে পেরেছে কি না, তাও বুঝতে পারলো না ডানকান। বুঝতে হলে ওকে জিজ্ঞেস করতে হয়, তাহলেই এই বিস্ময়কর অন্তর্ধান রহস্য ওর মাথায় ঢুকিয়ে দিতে হয়। অবশ্য রহস্য ইতিমধ্যে ওর মাথায় চিন্তার জাল বুনছে কি না, তা কে বলতে পারে? একটা জিনিস স্বীকার করতে না চাইলেও ডানকান মনে মনে বুঝেছিল যে লেস্লি সম্বন্ধে একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছে ও। এতটুকু এই উপগ্রহে দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যুর সম্ভাবনা যে কত কম, তা বোঝবার মত বুদ্ধি নিরেট মাথা প্রাণীরও থাকে। তাই ডানকানের অত ভয়, অত সংশয়! তাই দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল এই কৌতূহলহীন নীরবতা। এরপর থেকেই হুঁশিয়ার হয়ে গেল ডানকান। বাইরে যখন বেরোতো, সঙ্গে একাধিক বাতাসের বোতল নিত। প্রেসার পরীক্ষা করে নিত বেরোবার আগে। এ ছাড়াও, এয়ার-লকের বাইরের দরজা যাতে ওর পেছনে বন্ধ হয়ে না যায়, তাই একটুকরো পাথর সব সময়ে রেখে যেত ফাঁকটায়। লেস্লির আর তার খাবার যেন একই পাত্র থেকে আসে, সেদিকেও সজাগ নজর রাখলো ও। এবং তীক্ষ্ণ চোখে মেয়েটির প্রতিটি গতিবিধিও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে যেত লাগল অস্বাভাবিক কিছু আবিষ্কার করার আশায়। কিন্তু আদৌ কিছু জানে কি না অথবা বাস্তবিকই ওর মনে সন্দেহের মেঘ দেখা দিয়েছে কি না—তা ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারলো না ডানকান।......অ্যালান হুইন্ট চলে যাওয়ার পর থেকেও একবারের জন্যেও আর তার নাম উল্লেখ করেনি লেস্লি।

হপ্তাখানেক স্থায়ী হইল এই বিচিত্র মনোভাব। তারপরেই আচম্বিতে দেখা গেল আর একটা পরিবর্তন। বাইরের নিবিড়

তমিস্রার পানে মনোযোগ দেওয়া একেবারেই ছেড়ে দিলে লেল্লি। তার বদলে শুরু হলো পড়াশুনো। কোনোরকম বাছবিচার না করে দিবারাত্র বইয়ের পাতায় ডুবে রইল ও।

তখনকার মত পড়াশুনোয় বাধা না দেওয়াই সঙ্গত মনে করলো ডানকান। এ রকম পরিস্থিতিতে বিষয়ান্তরে মন গেলেই ভাল। তাই আর হামলা করলো না এ সম্বন্ধে।

ধীরে ধীরে ডানকানের মনের অস্বচ্ছন্দ ভাবটা কেটে যেতে থাকে, ক্রমে ক্রমে সহজ হয়ে উঠতে থাকে ও। সঙ্কটকাল পেরিয়ে এসেছে ও। হয় লেল্লি কিছু অনুমানই করতে পারেনি, অথবা পারলেও এ ব্যাপারে উচ্চবাচ্য না করাই মনস্থ করেছে সে। বইয়ের প্রতি তার অনুরাগ কিন্তু এতটুকু কমলো না। ডানকান কয়েকবার বলেছিল, শুধু সঙ্গ পাওয়ার জন্যেই ১২৬০ পাউণ্ড খরচ করেছে সে, মুখ বুজে বসে থাকার জন্যে নয়। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করলো না লেল্লি। রাশি রাশি কেতাবের পাতায় ওর সেই আশ্চর্য তন্ময়তা দেখে ডানকানের মনে হলো, ষ্টেশনের লাইব্রেরীর মধ্যেই ও যেন জীবনের পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আস্তে আস্তে পটভূমিকার অন্তরালে চলে গেল অ্যালান হুইণ্টের অন্তর্ধান রহস্য। পরের জাহাজটা এসে পৌঁছোলে উদ্বিগ্ন চোখে লেল্লিকে চোখে চোখে রেখেছিল ডানকান। ভয় হয়েছিল নাবিকদের কাছে পাছে কোনো সন্দেহ প্রকাশ করে ফেলে ও। কিন্তু এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করার কোন রকম স্পৃহাই দেখা গেল না ওর মধ্যে। জাহাজটা বিদায় নিলে পর হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ডানকান। শেষ পর্যন্ত ওর অনুমানই আগাগোড়া সত্য হলো। মেয়েটা বাস্তবিকই বোবা; হাঁদা: একটা বাচ্চার মতই অ্যালান হুইণ্টের ঘটনা একেবারেই ভুলে গেছে লেল্লি।

ঘড়ির কাঁটার মতই টিক টিক করে মৃদুমন্দ গতিতে অতিবাহিত হতে থাকে একটির পর একটি মাস। এবং যতই দিন কাটতে থাকে,

তাই লেল্লির বাক্‌শক্তিহীনতা সম্বন্ধে ডানকানের পূর্ব ধারণা একটু একটু করে সংশোধিত করার দরকার হয়ে পড়ে। বইয়ের পাতা থেকে এমন সব জিনিস জানতে আরম্ভ করেছিল ও, যার বিন্দুবিসর্গ জানে না ডানকান। এমন সব প্রশ্ন করত লেল্লি, এমন সব জিনিস বুঝিয়ে দিতে বলত ডানকানকে যে মাঝে মাঝে রীতিমত বিব্রত হয়ে পড়ত। কিন্তু একটা বোবা হাঁদা মঙ্গলের মেয়ের কাছে বিদ্যে বুদ্ধির দিক দিয়ে সে হীন প্রতিপন্ন হয়ে যাবে, তাওতো হতে পারে না। সে বাস্তব জগতের মানুষ, তার যা জ্ঞান সবই অভিজ্ঞতালব্ধ! কাজেই পুঁথিগত বিদ্যার ওপর তার বিরাগ এবং বইয়ের পাতার তথ্য যে নিতান্তই অসার তা লেল্লিকে সমঝে দিতে কসুর করতো না সে। জীবনের যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, বই পড়া জ্ঞান দিয়ে তা সমাধান করা যে একেবারেই সম্ভব নয়, এই তথ্যই বুঝোতো ডানকান। অভিজ্ঞতার উদাহরণও হাজির করতো ও। সংক্ষেপে, লেল্লিকে ডানকান নিজেই শিক্ষাদান করতে শুরু করলে।

এ শিক্ষাও দ্রুত মজ্জাগত করে নিতে লাগল লেল্লি। বাস্তব জীবনের জ্ঞান এবং কেতাবলব্ধ জ্ঞান—কিছুই বাদ গেল না। মঙ্গল-গ্রহের প্রাণীদের সম্বন্ধে ডানকানের ধারণা তখনই সংশোধন করতে হোলো। ওরা একেবারেই হাঁদা বা বোবা নয়; মগজ আছে, কিন্তু সে মগজ খেলাতেই যা সময় লাগে ওদের। একবার জ্ঞানাহরণ পর্ব শুরু হতেই ভ্যাকুম-ক্লীনারের মত তথ্য সঞ্চয় করতে লাগল লেল্লি। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা গেল, ওয়ে-লোড ষ্টেশন সম্বন্ধে সে যা জানে, তার চাইতে বেশী কিছুই জানে না ডানকান! শিক্ষকতা করার অভ্যাস তো নেই-ই, উপরন্তু লেল্লিকে শিক্ষাদান করারও কোনো স্পৃহা ছিল না ডানকানের। কিন্তু নিজেকে কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখার সমস্যাটা এইভাবে সমাধান হয়ে যেতে, এ নিয়ে আর খিটিমিটি করেনি ও। মেয়েটা তার বাস্তব জ্ঞানকে উপযুক্ত সম্মান দিতে পারে, সমাদার জানাতে পারে—মজার হলেও তাই খুশী হয়েছিল ডানকান।

শিক্ষা জিনিষটাকে চিরকালই ডানকান মনে করে সময়ের অযথা অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এখন দেখা গেল এই শিক্ষকতার ফলে মেয়েটাকে মঙ্গলগ্রহে আবার ফিরিয়ে আনতে পারবে ও। অপরিহার্য সেক্রেটারী হওয়ার অনেক গুণই রয়েছে মেয়েটার ·· এরপর থেকেই বুককিপিং আর ফাইনান্সের প্রাথমিক সূত্রগুলো লেল্লিকে পড়াতে শুরু করলো ডানকান—অবশ্য যতটুকু ও জানত, ততটুকুই।

এক একটি মাস অতীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে আসতে থাকে ওর কাজের মেয়াদ। প্রথম প্রথম দিনগুলো যে রকম অসহ্য মনে হয়েছিল, আজকাল আর তেমন মনে হয় না। শেষ পর্যন্ত ওর মনে দৃঢ় বিশ্বাস এসে গিয়েছিল যে অপ্রকৃতিস্থ হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা নেই—এই ভাবেই ও কাটিয়ে দিতে পারবে বাকী কটা মাসও। যতই দৃঢ় হতে থাকে ওর এই আত্মবিশ্বাস ততই সহজতর হয়ে উঠতে থাকে দিনগুলো আর টাকার পাহাড় জমে উঠতে থাকে পৃথিবীর দপ্তরে ওর নামে।

ক্যালিষ্টোতে একটা নতুন খনি আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে মাল আসার পরিমাণ একটু বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ ছাড়া, দৈনিক কর্মসূচীতে আর কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না। মাঝে মাঝে জাহাজ এল অনেক। মালপত্র তুলে নিয়ে চলেও গেল তারা। তারপর এল এমন একটি দিন যেদিন ডানকান নিজেকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলে উঠল—'আর মাত্র একটি জাহাজ। তারপরের জাহাজেই রওনা হবো আমি স্বদেশের দিকে!' এ কথাটা এত তাড়াতাড়ি বলতে পারার আনন্দে বিভোর হয়ে গিয়েছিল ডানকান। কিন্তু ওকে অবাক করে দিয়ে এর চাইতেও তাড়াতাড়ি এল সেই দিনটি যেদিন ও ধাতুর অ্যাপ্রন পরে দাঁড়িয়ে রইল ডোমের বাইরে; আর বিশাল মহাকাশ জাহাজটা তলার জেট চালিয়ে সিধে উঠে গেল ওপরে এবং অবিশ্বাস্য বেগে ধেয়ে গেল কালো আকাশের বুক চিরে। আবার আপন মনেই

বলে ওঠে ডানকান : 'এই শেষবার। এর পরের জাহাজটা যখন মাল নিয়ে আকাশে উঠবে, আমিও থাকবো তার মধ্যে। তার পর বিদায়, বিদায়।'

নির্নিমেষ চোখে অগণিত উজ্জ্বল কণিকার মাঝে অপসৃয়মাণ জ্বলজ্বলে বিন্দুটির পানে তাকিয়ে রইল ডানকান। তারপর এক সময়ে উপগ্রহের আবর্তনের ফলে দিগন্তের নীচে হারিয়ে গেল বিন্দুটা। এয়ার লকের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো ডানকান—এবং দেখলে বন্ধ হয়ে গেছে দরজাটা।

অ্যালান স্কুইন্টের ব্যাপারটা বিস্মৃতির অন্তরালে হারিয়ে গেছে এবং তা নিয়ে তার অহেতুক উদ্বেগের কারণ নেই—এ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর থেকে বাইরে বেরোবার সময়ে দরজার ফাঁকে পাথর রেখে যাওয়ার অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছিল ডানকান। কাজের জন্যে বাইরে বেড়াতে হলে হুহাট করে দরজাটা খুলে রেখে যেত ও এবং ফিরে না আসা পর্যন্ত থাকত ঐ ভাবেই। বাতাস বা অন্য এমন কিছুই নেই এ স্যাটেলাইটে যার ধাক্কায় বন্ধ হয়ে যেতে পারে পাল্লাটা। মেজাজ খিঁচড়ে যায় ওর। শক্ত মুঠিতে ল্যাচ-লিভারটা ধরে ঠেলা দেয় সামনে। একচুলও নড়ে না লিভারটা।

নিশ্চয় আটকে গেছে পাল্লাটা। গালিগালাজ করে ওঠে ও আপন মনে। তারপর মেটাল অ্যাপ্রণের কিনারায় হেঁটে গিয়ে জেট চালিয়ে ডোমের ধার দিয়ে দিয়ে উড়ে যায় অপর দিকে—যেখানে বড় জানালাটা আছে। স্প্রিংয়ের আচ্ছাদন লাগিয়ে একটা চেয়ারে বসেছিল লেলি। দেখে মনে হলো যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন ও। এয়ার লকের ভেতরের দরজাটা খোলা পড়ে রয়েছে। কাজে কাজেই বাইরের দরজা কিছুতেই নড়ানো সম্ভব নয়। শুধু সেফটি-লকিং কৌশলই নয়, ডোমের ভেতরকার বায়ুর চাপই বন্ধ করে রাখবে দরজাটাকে।

পর-পর দুটি পুরু কাঁচ দিয়ে ঢাকা জানলার বাইরের কাঁচে টোকা

মেরে লেল্লির দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে ডানকান। টোকার শব্দ এ জানলার ভেতর দিয়ে ডোমের মধ্যে যাওয়া সম্ভব নয়। তবুও লেল্লি মুখ তুললে সম্ভবত ডানকানের নড়াচড়ার জন্যে। মাথা ঘুরিয়ে গোল গোল চোখে একদৃষ্টে ডানকানের পানে তাকিয়ে রইল ও—নিস্পন্দ দেহে এতটুকু নড়াচড়ার লক্ষণ দেখা গেল না। ডানকানও বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে তার পানে। তখনও ওর চুলের রাশি তরঙ্গায়িত রয়েছে বটে কিন্তু যে ভুরু, রঙ এবং টুকিটাকি মেকআপ দিয়ে ডানকান ওর মুখখানাকে যতদূর সম্ভব পৃথিবীর মেয়ের মুখের মত করে তুলতে চেয়েছিল তার সবই হয়েছে অদৃশ্য। আগের মতই মৃদু বিস্ময় ভঙ্গীর মধ্যে থেকে ওর পাথরের মত কঠিন চোখ দুটো অপলকে তাকিয়ে রইল ডানকানের পানে।

নিদারুণ আশংকায় শিউরে উঠল ডানকান। মনে হলো বুঝি কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে সব কিছুই এমন কি ওর হৃদযন্ত্রের ধুকপুকুনিও স্তব্ধ হয়ে গেছে।

শুধু লেল্লির কাছে নয়, নিজের কাছেও এমন ভান করে ডানকান যেন কিছুই বুঝতে পারেনি সে। ইঙ্গিতে ভেতরের দরজাটা বন্ধ করে দিতে বলে ডানকান। কিন্তু একটা আঙুলও না নাড়িয়ে সমানে অনিমেষে ওর পানে তাকিয়ে থাকে লেল্লি। তারপরেই ডানকান লক্ষ্য করে লেল্লির হাতে খোলা বইটা। ষ্টেশনের লাইব্রেরীর বই ওটা নয়। কবিতার বই, নীল প্রচ্ছদ দিয়ে বাঁধানো। এক সময়ে অ্যালান হুইণ্টই ছিলেন বইটার মালিক।...

নিমেষে নিঃসীম আতংক ছড়িয়ে পড়ে ডানকানের স্নায়ুতে স্নায়ুতে, শরীরের প্রতিটি শিরায় উপশিরায়। চকিতে মাথা নীচু করে বুকের ওপর লাগানো সারি সারি ছোট ছোট ডায়ালগুলো দেখে নেয় ও। তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। বাতাস সরবরাহের কলকব্জায় কোনো কারচুপি করে নি লেল্লি। বাতাস যা আছে, তাতে এখনও তিরিশ ঘণ্টা শ্বাসপ্রশ্বাস চালানো যাবে। কপালের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম

জমে উঠেছিল। এবার তা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে থাকে। ধীরে ধীরে আশ্বস্ত হয়ে উঠতে থাকে ডানকান। সংহত করে নেয় নিজেকে। জেটের ওপর আঙুল ছোঁয়াতেই আবার শূন্যপথে ভাসতে ভাসতে ফিরে আসে ও মেটাল অ্যাপ্রনের কাছে। অ্যাপ্রনের মধ্যে চুম্বক-বুট লাগিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়ায় ও। তারপর শুরু হয় চিন্তা।

কি জঘন্য মেয়ে! আগাগোড়া এমন অভিনয় করেছে যে ডানকান ভেবেছে বুঝি সব কিছুই ভুলে গেছে ও। নিশ্চিন্ত মনে নিজের কাজ নিয়ে ডানকান যখন ব্যস্ত থেকেছে তখনই অল্প অল্প করে গড়ে তুলেছে ওর সর্বনাশা পরিকল্পনা, প্রস্তুত হয়েছে এবং অপেক্ষা করেছে আজকের এই মুহূর্তটির—যখন বাড়ী যাওয়ার উল্লাসে উচ্ছ্বসিত ওর অন্তর। বেশ কয়েক মিনিট কেটে যাওয়ার পর ওর ক্রোধ আর আতংক মিশানো উত্তাল ভাবটা থিতিয়ে আসে একটু একটু করে।

তিরিশ ঘণ্টা! অনেক কিছুই করা যায় এ সময়ের মধ্যে। বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি কোন রকমেই ডোমের মধ্যে ফিরে যাওয়া সম্ভব না হয়, তখন যে কোনো একটা সিলিণ্ডার ক্রেটের মধ্যে নিজেকে ঢুকিয়ে মরিয়া হয়ে ক্যালিস্টোর দিকে প্রক্ষিপ্ত হলেই চলবে 'খন।

পরে হুইন্টের ব্যাপারটা যদি লেল্লি ফাঁস করেও দেয়, তাতে বিশেষ কোনো ক্ষতি হবে কি? হুইন্ট যে কিভাবে অন্তর্হিত হয়েছে, তা লেল্লি জানে না এবং এ বিষয়ে ডানকানের কোন সন্দেহই নেই। কাজেই মহাকাশের অভিশাপে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেছে লেল্লি—এই কথাটা রটিয়ে দিতে পারলেই ওর সব কথাই পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দিতে পারবে ডানকান।

...সে যাই হোক, কিন্তু আপাতত এই বিপদজনক পরিস্থিতির এখুনি একটা সমাপ্তি দরকার। সিলিণ্ডার ক্রেটের মতলবটায় ঝুঁকি আছে যথেষ্ট এবং ওটা এড়াতে পারলেই খুশী হবে ডানকান। অন্যান্য উপায়গুলো আগে খতিয়ে দেখা যায়।

জেট চালিয়ে ছোটো ডোমটার কাছে ভেসে যায় ডানকান। সূর্য

মোটর চালিত প্রধান ব্যাটারীগুলো থেকে পাওয়ার আসে প্রথমে এখানে এবং এখান থেকে যায় বড় ডোমটার মধ্যে। পটাপট করে সুইচগুলো উঠিয়ে দিয়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলে ও। তারপর চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ। প্রতীক্ষা। অন্তরিত (ইনসুলেটেড) ডোম থেকে সব উত্তাপ বেরিয়ে গিয়ে ঠাণ্ডা হতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগবে। কিন্তু উত্তাপ সামান্য কমে গিয়ে ঠাণ্ডা অনুভূত হতে বেশী সময় লাগবে না। থার্মোমিটারেও ধরা পড়বে তাপমাত্রার এই তারতম্য। ডোমের মধ্যে অবশ্য ছোট ছোট কম ভোল্টেজের অল্প ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাটারী আছে বটে, কিন্তু তা দিয়ে লেল্লির প্রয়োজন মিটবে না। ব্যাটারীগুলো এক লাইনে রাখলেও কিস্সু হবে না।

ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করলো ডানকান। বহুদূরের সূর্য অস্ত গেল দিগন্তের ওদিকে, আস্তে আস্তে ভেসে উঠতে লাগল ক্যালিষ্টোর বিশাল বৃত্তাকার বহিরেখা। বড় ডোমটার দিকে আবার জেট চালিয়ে ভেসে গেল ও ফলাফল দেখার জন্যে। ও যখন পৌঁছোলো, ঠিক তখনই গোটা দুই জরুরী বাতির আলোয় স্পেশসুট পরতে ব্যস্ত লেল্লি।

দাঁত কিড়মিড় করে ওঠে ডানকান। তাপমাত্রা কমিয়ে নিদারুণ ঠাণ্ডায় ওকে শায়েস্তা করার সহজ উপায়টি তাহলে এইভাবে ব্যর্থ হলো। স্পেশসুটের ভেতরে থাকার ফলে শুধু উত্তাপই পাবে না ও, বাতাস সরবরাহের পরিমাণও হবে ডানকানের চাইতে অনেক বেশী। তাছাড়াও বাড়তি বোতল তো এন্তার রয়েছে ডোমের ভেতরে। ডোমের হাওয়া ঠাণ্ডায় জমে শক্ত হয়ে গেলেও ওর কোনো বিপদের শংকা নেই।

মাথায় হেলমেটটা না গলানো পর্যন্ত অপেক্ষা করলো ডানকান। তারপর পট করে টিপে দিলে নিজের রেডিওর সুইচটা। ডানকানের কণ্ঠ শুনে ক্ষণেকের জন্যে থমকে যায় লেল্লি। কিন্তু কোনো উত্তর দেয় না। আর তারপরেই ইচ্ছে করেই সুইচ টিপে বন্ধ করে দেয় রিসিভারটা। ডানকান কিন্তু তখনও চালু রাখে ওর রেডিও।

লেস্লির বুদ্ধিবিবেচনা ফিরে না আসা পর্যন্ত রেডিও খুলে রাখাই সঙ্গত মনে করলো ও।

অ্যাপ্রনের মধ্যে আবার ফিরে আসে ডানকান। আবার শুরু হয় দ্রুত চিন্তা। ওর ইচ্ছে ছিল ডোমটার কোনো ক্ষতি না করে ভেতরে ঢোকা। কিন্তু দেখা গেল তাপমাত্রা কমিয়ে ঠাণ্ডায় লেস্লিকে জমিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। এটা অবশ্য ঠিক যে স্পেশস্যুট পরা অবস্থায় খাদ্য পানীয় গ্রহণ করার উপায় নেই লেস্লির। কিন্তু ডানকানেরও তো সেই একই অবস্থা। এখন একমাত্র উপায় হলো ডোমটাকে নিয়ে পড়া।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আবার ছোট ডোমে ফিরে যায় ডানকান। ইলেক্ট্রিক্যাল কাটার-টা নিয়ে ফিরে আসে বড় ডোমের পাশে। কাটারের তারটা শূন্যে ভাসতে থাকে ওর পেছনে। ধাতুর দেওয়ালের পাশে এসে আর একবারও ভেবে নেয় ওর পরবর্তী কাজের পরিণাম। বাইরের দেওয়ালের খানিকটা কেটে সরিয়ে ফেলতে পারলেই বায়ুশূন্য ফাঁকা জায়গা আর তার পরেই অন্তারক (ইনস্যুলেটেড) বস্তুর স্তর। মাখনের মতই কেটে ফেলা যায় এ স্তরটাকে। আগুন লাগবারও কোন সম্ভাবনা নেই, কেন না অক্সিজেন তো নেই। সবচেয়ে গুরুত্ব হচ্ছে ভেতরকার ধাতুর দেওয়ালটা কাটা। প্রথমে ছোট্ট কয়েকটা ফুটো করে ভেতরকার বাতাসের চাপটা কমে আসবার সময় দিয়ে তফাতে সরে দাঁড়ানোই ভালো। হঠাৎ যদি বাতাসটা হুস্ করে বেরিয়ে আসে, তাহলেই ওর নিভার অবস্থায় বহুদূরে ছিটকে ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আর, লেস্লি তখন কি করবে? ফুটোগুলো তাড়াতাড়ি বন্ধ করবার চেষ্টা করবে ও। বুদ্ধি করে যদি অ্যাসবেসটস্ প্যাকিং আনে তাহলে একটু মুস্কিল হবে নিশ্চয়। ···একবার ভেতরে ঢুকতে পারলে নতুন করে দেওয়াল ফুটো ওয়েল্ডিং করে মেরামত করে নিয়ে সিলিণ্ডারের বাতাস দিয়ে ডোমটা ভরিয়ে ফেলা যাবে 'খন। ···ইনস্যুলেটেড বস্তু খানিকটা নষ্ট হবে ঠিকই, কিন্তু তা অতি সামান্য।

তাতে কোনো ক্ষতিই হবে না ডোমের···ঠিক আছে, এবার শুরু করা যাক্ কাজটা···

অ্যাপ্রনের মধ্যে ম্যাগনেটিক বুট লাগিয়ে জমির সাথে নিজেকে গেঁথে রাখার চেষ্টা করতে থাকে, মুঠি পাকিয়ে নাড়তে থাকে শূন্যে— কিন্তু লেল্লি সমানে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে ওর পানে। কয়েক মিনিট পরে একটা চেয়ারে গিয়ে বসে ও। স্প্রিং-কভারটা লাগিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে নির্বিকার নির্বিকল্প মুখে?

হেলমেটের মধ্যেই এবার চেঁচিয়ে ওঠে ডানকান—'ঠিক আছে, তবে তাই হোক, ডোমশুদ্ধ তোমাকেও খতম করে দিই তাহলে!' কিন্তু মুখে আস্ফালন করলে কি হবে, মনে মনে তো ডোমের বা নিজের কোনো ক্ষতি করার বাসনাই ওর নেই!

ঐ বোকা-বোকা মুখের অন্তরালে কোন্ ষড়যন্ত্রের জালবোনা চলেছে এতোদিন, তা ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারেনি ডানকান। ও কি সত্য সত্যই অটল সংকল্পে স্থির, না, নিছক তামাসা জুড়েছে ওকে নিয়ে? লেল্লিই যদি সুইচ টিপে বিস্ফোরণ ঘটাবার হুমকি দিত, তাহলে না হয় ওরই শেষ মুহূর্তের স্নায়বিক বিপর্যয়ের সম্ভাবনার ওপর ঝুঁকি নিয়ে সাহস করে এগিয়ে যেতে পারত ডানকান! কিন্তু ব্যাপারটা তো তা নয়। এক্ষেত্রে সুইচ তো টিপছে ডানকান নিজেই। যে মুহূর্তে ভেতরের দেওয়ালে ছিদ্র সৃষ্টি করবে সে, সেই মুহূর্তেই রেণু রেণু হয়ে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়বে গোটা ডোমটা।

আবার ফিরে যায় ও অ্যাপ্রনের মধ্যে জমির ওপর সিধে হয়ে দাঁড়ানোর জন্যে। উপায় নিশ্চয় আছে···বায়ুচাপ না কমিয়ে কোন রকমে ডোমের ভেতরে ঢুকে পড়ার কোনো উপায়ই কি নেই? আছে···নিশ্চয় আছে···বেশ কয়েক মিনিট এই নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে ডানকান···উপায় থাকলেও তা কতদূর সফল হবে তা বলা মুস্কিল···কেন না, শেষমুহূর্তে মহা আতংকে লেল্লি নিজে থেকেই যে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দেবে না, তার কি কোন নিশ্চয়তা আছে?

না···কোনো উপায়ই নেই। সিলিণ্ডার জেটে করে ক্যালিষ্টো রওনা হওয়া ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই।

কালো আকাশে বিশাল থালার মত ঝুলছিল ক্যালিষ্টো। তারও ওদিকে ভাসছে বৃহস্পতি, আকারে অনেক ছোটো হলেও উজ্জ্বলতায় হার মানিয়েছে ক্যালিষ্টোকে। ক্রেটের মধ্যে থেকে মহাকাশে পাড়ি দেওয়াটা তো মুস্কিলের ব্যাপার নয়, যত ভাবনা নামার সমস্যা নিয়ে। বেশী করে প্যাড ঠেসে দিলে পুরোপুরি না হলেও খানিকটা সুরাহা হতে পারে সমস্যাটার।···তারপর, ক্যালিষ্টোর লোকেরাই ওকে আবার ফেরৎ পাঠিয়ে দেবে'খন এই স্যাটেলাইটে এবং তারাই ডোমের মধ্যে প্রবেশ করার যা হয় একটা উপায় শেষ পর্যন্ত বার করবেই। আর, ভেতরে একবার পা দিতে পারলে লেস্লির কপালে অনেক দুর্গতিই লেখা আছে···অভাবনীয় দুর্গতি,···

সমতলভূমির ওদিকে তিনটে সিলিণ্ডার পর-পর দাঁড় করানো ছিল। ক্যালিষ্টো পাঠাবার জন্যে চার্জ দিয়ে তৈরী রাখা হয়েছে প্রতিটি সিলিণ্ডার। আর দেরী করাটা সমীচীন হবে না। বাতাসের ভাঁড়ার তো ফুরিয়ে আসছে।

সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে মন স্থির করে ফেলল ডানকান। দৃঢ় পদক্ষেপে এবার ও বেরিয়ে পড়ে মেটাল অ্যাপ্রনের বাইরে। জেটের ওপর আঙুল স্পর্শ করতেই সমতলভূমির ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে ও এগিয়ে গেল সিলিণ্ডারগুলোর দিকে। সবচেয়ে কাছেরটাকে র‍্যাম্পে চড়াতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না ওকে—অনেকদিনের অভিজ্ঞতা তো। কতখানি কোণ করে ক্যালিষ্টো হেলে পড়েছে তা আর একবার দেখে নেওয়ার পর দৃঢ়তর হয়ে ওঠে—ওর সংকল্প। কোনো ভয় নেই, নির্বিঘ্নেই পৌঁছে যাবে ও। কাছাকাছি যাওয়ার পর কমিউনিকেশন রেডিও মারফৎ ওদের ডাক পাঠালেই ওরাই সিলিণ্ডারটা নামিয়ে নেবে'খন।

বেশী প্যাড ছিল না সিলিণ্ডারটায়। বাধ্য হয়ে তাই পাশেরগুলো

থেকে প্যাড এনে ভেতরে ঠেসে দেয় ডানকান। তারপর ট্রিগার টিপে নিজেকে সমেত সিলিণ্ডারটা ক্যালিষ্টোর দিকে ছুঁড়ে দেওয়ার ঠিক আগে ক্ষণেকের জন্যে ও থমকে গিয়ে সজাগ চোখে সব কিছু ঠিক আছে কিনা তা দেখে নিতে গিয়েছিল। আর ঠিক তখনি ও অনুভব করলে যেন অল্প অল্প শীত করছে ওর। নবটা তুলে দিয়ে মাথা নীচু করে বুকে লাগানো মিটারটার ওপর চোখ রাখতে নিমেষের মধ্যে দিবালোকের মতই সুস্পষ্ট হয়ে গেল ওর কাছে সব কিছু···লেল্লি গোড়া থেকেই জানতো নতুন বাতাসের বোতল নেওয়ার আগে ডানকান তা পরখ করে নেবে। কাজেই সেদিক দিয়ে না গিয়ে হয় ব্যাটারী, আর না হয় সারকিটটাকেই বিগড়ে দিয়েছে ও। ভোল্টেজ এমনই কমে এসেছে যে কাঁটাটা শেষ প্রান্তে ছুঁই ছুঁই করছে। স্যুটের মধ্যে উত্তাপ বেরিয়ে যাওয়া শুরু হয়েছে তাহলে অনেকক্ষণ আগে থেকেই।

আর যে বেশীক্ষণ যুঝতে পারবে না ও, তা বুঝতে পারে ডানকান। খুব জোর আর কয়েক মিনিট টিমটিম করে জ্বলবে ওর আয়ুর প্রদীপ। তারপর সব অন্ধকার। ছুরিকাহতের মতই আতঙ্কের প্রথম আকস্মিক আঘাতে অবশ হয়ে গিয়েছিল ওর অন্তর। আর তারপরেই ভয়ের কণাটুকুও মুছে যায় মন থেকে, সে স্থানে অধিকার করে প্রচণ্ড নিষ্ফল ক্রোধ। লেল্লির চালাকিতে শেষ সুযোগটাও হাতের কাছেও এসে যখন ফস্কে গেল, তখন শেষ মুহূর্তে ডানকানও ওকে রেহাই দেবে না। ওতো যাবেই, কিন্তু যাওয়ার আগে শুধু একটা ছোট্ট ছিদ্র ডোমের ধাতব দেওয়ালে···তাহলেই নিঃসঙ্গ হবে না ওর পরলোক যাত্রা···

শীতের কামড় দেহের সর্ব অংশ দিয়ে অনুভব করতে আরম্ভ করেছিল ডানকান—স্যুটের মধ্যে দিয়ে যেন কনকনে বরফের স্রোত ঢুকে পড়ছিল হু-হু করে। জেটের নিয়ন্ত্রণ বোতামটা টিপে ধরতেই দারুণ বেগে ডোমের দিকে ছিটকে এল ওর দেহ।

ঠাণ্ডার কামড় এবার অসহ্য হয়ে উঠেছে। হাত আর পা-ই

অবশ হয়ে যাচ্ছে সবার আগে। কেবলমাত্র নিদারুণ প্রচেষ্টার ফলেই কোনোরকমে জেট নিয়ন্ত্রণ করে ডোমের পাশে থেমে পড়তে সক্ষম হয় ও। আরও একটু প্রচেষ্টা দরকার। কেননা তখনও শূন্যে ভাসছে ডানকান। জমি থেকে এক গজ কি তারও কিছু বেশী ওপরে ভাসমান দেহটাকে নামাতে হবে নীচে। কাটারটাকে যেখানে রেখে গিয়েছিল, ঠিক সেইখানেই পড়ে রয়েছে যন্ত্রটা। নাগালের বাইরে, কয়েক ফুট দূরে। এই ব্যবধানটুকু পেরিয়ে যন্ত্রটাকে যেভাবেই হোক ঝাঁপিয়ে ধরতে হবে ওকে। মরিয়া হয়ে স্যুটের মধ্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল ও কোনো রকমে কণ্ট্রোল-বোতামটা টিপে নীচের দিকে নেমে আসার। এতো শুধু চেষ্টা নয়, মরণ-পণে লড়াই। কিন্তু হায়রে, শৈত্যের দংশনে একেবারেই নিঃসাড় হয়ে গেছে আঙুলগুলো। দেহের আর মনের শেষ শক্তিবিন্দুটুকুও নিংড়ে ঢেলেও আঙুলটাকে কিছুতেই নড়াতে পারলো না ডানকান। অশ্রুর ধারা নেমে আসে ওর গাল বেয়ে, কখনও নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে আবার কখনও খাবি খেতে খেতে আপ্রাণ চেষ্টা করে আঙুলগুলোকে বশে আনতে। অকল্পনীয় ঠাণ্ডার প্রবাহ তখন বাহু হয়ে উঠে আসছে ওপর দিকে। আর তারপরেই, একটা আতীব্র বেদনা অনুভব করে ও বুকের মধ্যে—যেন আচমকা ছুরি দিয়ে কেটে ফালাফালা করে দেওয়া হলো ওর বক্ষের যন্ত্র। এমনই তীব্র সে বেদনা যে হাউ-হাউ করে এবার ও কেঁদে ওঠে। দম আটকে আসতে থাকে ওর···আরও বাতাসের জন্যে হাঁ করতেই ফুসফুসের মধ্যে অনুতপ্ত বাতাস ধেয়ে গিয়ে চিরতরে বরফ-কঠিন করে তোলে হৃদযন্ত্রটিকে।

ডোমের লিভিংরুমে দাঁড়িয়ে ছিল লেল্লি, নির্বিকার মুখে প্রতীক্ষা করছিল সেই মুহূর্তটির। অস্বাভাবিক বেগে সমতল ভূমির ওপর দিয়ে স্পেসস্যুট পরা মূর্তিটিকে উড়ে আসতে দেখেছে ও। এর অর্থ কি, তাও বুঝেছিল। বিস্ফোরণ ঘটাবার কলকব্জাগুলো বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে পুরু রবারের একটা টুকরো হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল চুপচাপ।

ডোমের দেওয়ালে ফুটো দেখা গেলেই রবারের টুকরো দিয়ে তা চেপে ধরতে হবে কিছুক্ষণের জন্মে। এক মিনিট যায়, দু মিনিট যায়···পাঁচ মিনিট কেটে যাওয়ার পর জানলার সামনে এগিয়ে যায় ও। কাঁচের একদম কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে পাশের দিকে তাকাতেই স্পেশস্যুট পরা একটা পায়ের সবটা এবং আর একটা পায়ের খানিকটা দেখতে পেল ও। অনুভূমিক অবস্থায় জমি থেকে কয়েক ফুট ওপরে শূন্যে ভাসছিল পা দুটো। কয়েক মিনিট নির্নিমেষ চোখে এ দৃশ্য দেখলো লেল্লি।

তারপর জানালা ছেড়ে ফিরে এল ঘরের মধ্যে। রবারের টুকরোটায় সামান্য ঠেলা দিতেই শূন্যে ভাসতে ভাসতে তা উড়ে গেল ঘরের অন্য প্রান্তে। সেকেণ্ড খানিক কি দুয়েকের জন্যে কি ভেবে নিলে ও। তারপর বইয়ের তাকের সামনে গিয়ে বিশ্বকোষের শেষখণ্ডটা টেনে নামালো। পাতার পর পাতা উল্টে গিয়ে থমকে গেল এক জায়গায়। 'বিধবা' শব্দটির প্রকৃত ব্যাখ্যা, অর্থ এবং অবস্থা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে অনাবিল তৃপ্তিতে ভরে উঠল ওর সারা অন্তর।

কে ওখানে

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

কৃত্রিম উপগ্রহের নিয়ন্ত্রণ-দপ্তর থেকে যখন ডাক পড়ল আমার, আমি তখন পর্যবেক্ষণ-বুদ্‌বুদে সেদিনের কাজ কতদূর এগোলো, তারই রিপোর্ট লিখতে ব্যস্ত। পর্যবেক্ষণ-বুদ্‌বুদটা আসলে একটা কাঁচের তৈরী গম্বুজ-কার্যালয়। মহাকাশ-ষ্টেশনের অক্ষরেখা থেকে ঠেলে বেরিয়ে থাকে এই অফিস। গোলচাকার নাভিস্থানে টুপী পরালে যে রকম দেখতে হয়, কাঁচের পর্যবেক্ষণ-বুদ্‌বুদকেও অনেকটা দেখতে সেই রকম। কাজ করার পক্ষে জায়গাটা অবশ্য বিশেষ আরামপ্রদ নয়। কেননা, চোখের সামনে যে দৃশ্য দেখছিলাম, তা বাস্তবিকই অভিভূত করে তোলে যে কোন মানুষকে। মাত্র কয়েক গজ দূরেই দেখছিলাম অনেকটা ধীর-গতি ব্যালে নাচের মত—নির্মাণ-বাহিনীর লোকজনেরা খণ্ড খণ্ড অংশগুলো জুড়ে ষ্টেশন তৈরী করতে ব্যস্ত। খাপে খাপে মিলিয়ে এ যেন অতিকায় একটা হেঁয়ালী সমাধানের প্রয়াস। তারও ওদিকে বিশ হাজার মাইল নীচে, দেখা যাচ্ছিল নীল-সবুজ আভায় সমুজ্জ্বল সম্পূর্ণ পৃথিবীকে। ছায়া-পথের অগণিত তারকা-ধূলির পটভূমিকায় ভাসমান পৃথিবীর সে এক অপরূপ রূপ।

জবাব দিলাম আমি, ষ্টেশন সুপারভাইজার কথা বলছি। কি ব্যাপার?'

'মাইল দুয়েক দূরে একটা ছোট্ট প্রতিধ্বনি ধরা পড়ছে আমাদের রাডারে। প্রায় নিশ্চল বললেই চলে প্রতিধ্বনিটাকে। Sirius-এর পাঁচ ডিগ্রী পশ্চিমে। জিনিসটার একটা চাক্ষুষ রিপোর্ট দিতে পারবেন কি?'

আমাদের কক্ষপথের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে, এমন কোন জিনিষ আর যাই হোক্ না কেন, উল্কা হ'তে পারে না কোন মতেই। হতে পারে, আমরাই কোন জিনিষ ফেলে দিয়েছি। শক্ত করে ধরে না রাখার ফলে আমাদেরই কোন যন্ত্রপাতি হয়তো ভেসে বেরিয়ে গেছে মহাকাশ-ষ্টেশনের বাইরে। কিন্তু আমার এ অনুমানের গলদটা কোনখানে, তা চোখে বাইনাকুলার লাগাতেই ধরা পড়ল। অরাঅনের চার পাশের আকাশ তন্ন তন্ন করে খুঁজতে গিয়েই দেখতে পেলাম জিনিষটাকে। মহাকাশের এই যাত্রীটি মানুষেরই হাতে গড়া হলেও আমাদের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।

নিয়ন্ত্রণ-দপ্তরকে বললাম, 'পেয়েছি। অন্য কারও পরীক্ষামূলক স্যাটেলাইট মনে হচ্ছে। আকারে 'শঙ্কু'র (CONE) মত, চারটে অ্যান্টেনা, আর নীচের দিকের গড়নটা অনেকটা আতশী কাঁচের মত। ডিজাইন দেখে মনে হচ্ছে, ১৯৬০ সালের গোড়ার দিকে ইউনাইটেড ষ্টেটস বিমানবাহিনী থেকে যে কৃত্রিম উপগ্রহটা ছাড়া হয়েছিল, খুব সম্ভব সেইটাই। উপগ্রহগুলোর বেতার প্রেরক যন্ত্র বিকল হয়ে যাওয়ার পর বিমানবাহিনী থেকে সেগুলোর আর কোন হদিশ পাওয়া যায় নি। এই কক্ষপথেই স্যাটেলাইট পাঠানোর কয়েকটা প্রচেষ্টা হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত দেখছি ব্যর্থ হয় নি ওরা।'

নথিপত্র ঘেঁটে আমার অনুমান যাচাই করে নিতে বেশী সময় লাগল না নিয়ন্ত্রণ-দপ্তরের। কুড়ি বছর আগে হারিয়ে যাওয়া ছন্নছাড়া স্যাটেলাইট আবিষ্কারের বৃত্তান্ত শুনে ওয়াশিংটন যে সম্পূর্ণ নির্বিকার এবং তাকে আবার আমরা হারিয়ে ফেললেই যে তারা সুখী হবে—এ খবরটা জানতেও বেশী সময় লাগল না।

নিয়ন্ত্রণ-দপ্তর জানালে, 'কিন্তু আমরা তো আর তা করতে পারি না। ওকে কেউ না চাইলেও আমাদের মহাকাশ পরিভ্রমণের পক্ষে রীতিমত বিপদজনক তার এই অস্তিত্ব। সুতরাং যে কেউ একজনকে বেরিয়ে গিয়ে স্যাটেলাইটটাকে টেনে আনতে হবে স্পেস-ষ্টেশনের ওপর।'

সেই 'যে কেউ একজন' যে আমাকেই হতে হবে, তা আমি বুঝলাম। নির্মাণ-বাহিনীর প্রত্যেকেই এমন মিলেমিশে কাজ করছে যে, ওদের মধ্যে থেকে কাউকে বিচ্ছিন্ন করে আনার সাহস হলো না আমার। নির্ধারিত সময় থেকে আমরা তো এমনিতেই পিছিয়ে পড়েছি, তার ওপর আরও একটা দিন দেরী হওয়া মানেই দশ লক্ষ ডলারের অপব্যয়। পৃথিবীর ওপরে জালের মত ছড়ানো সব ক'টা রেডিও আর টেলিভিশন ষ্টেশনগুলো অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে সেই বিশেষ মুহূর্তটির যখন তারা অবহেলে তাদের অনুষ্ঠানসূচী পাঠাতে পারবে আমাদের মাধ্যমে। এবং তখনই সম্পূর্ণ হবে সত্যিকারের সর্বপ্রথম পৃথিবীব্যাপী অনুষ্ঠান বিতরণ। সুমেরু থেকে কুমেরু পর্যন্ত সারা দুনিয়া জুড়ে চলবে T. V. এবং রেডিওর আনন্দ-উল্লাস।

'আমিই যাচ্ছি ওটা নিয়ে আসতে,' বললাম আমি। বায়ুপথ দিয়ে আসা বায়ুস্রোতে যাতে টেবিলের ওপরের কাগজপত্র উড়ে গিয়ে ঘরময় ছড়িয়ে না পড়ে, তাই পটাং করে একটা স্থিতিস্থাপক পট্টি লাগিয়ে দিলাম কাগজপত্রের ওপর। বাইরে ভাবভঙ্গী এমন করলাম অথবা করার প্রয়াস পেলাম, যেন একটা বিরাট উপকার করে সবাইকে বাধিত করতে চলেছি আমি। ভেতরে ভেতরে কিন্তু বিন্দুমাত্র অসন্তোষ দানা বেঁধে ওঠেনি আমার মনে। হপ্তা দুয়েক হলো স্পেস-ষ্টেশনের বাইরে বেরোনোর সুযোগ পাই নি আমি। ষ্টোরের নির্ধারিত কাজকর্ম, প্রতিদিনকার রিপোর্ট, এবং মহাকাশ-ষ্টেশন সুপারভাইজারের জীবনের আরও অনেক চাকচিক্যময় উপাদান নিয়ে বিলক্ষণ হাঁপিয়ে উঠেছিলাম আমি।

এয়ার-লকে যাওয়ার পথে আমাদের ষ্টাফের শুধু একজনকেই পেরিয়ে যেতে হলো আমায়! সে টমি। টমি একটা বেড়াল এবং তাকে সম্প্রতি সংগ্রহ করেছি আমরা। পৃথিবী থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে মানুষের কাছে পোষা জন্তু জানোয়ার যে কতখানি আদরণীয়, তা বলে বোঝানো যায় না। ভারহীন পরিবেশে মানিয়ে

নেওয়ার মত জানোয়ারের সংখ্যাও কিন্তু বেশী নেই! মহাকাশ-পোশাকের মধ্যে নিজেকে সেঁধোনোর সময়ে করুণ কান্নার সুরে মিউ মিউ করে উঠল টমি। কিন্তু আমি তখন বেজায় ব্যস্ত। তার সঙ্গে খেলা করার মত সময় আমার ছিল না।

এইখানে আপনাদের একটা জিনিস মনে করিয়ে দিতে চাই। ষ্টেশনের ওপরে আমরা যে পোশাক অথবা সুট ব্যবহার করি, এবং চাঁদের ওপর চলেফিরে বেড়ানোর জন্যে যে ধরনের নমনীয় সুট ব্যবহার করি—এই দুইয়ের মধ্যে কিন্তু যথেষ্ট পার্থক্য আছে। একটার সঙ্গে আর একটার কোন মিলই নেই। স্পেস-ষ্টেশনের সুটগুলো কিন্তু আসলে এক একটা ক্ষুদে মহাকাশ-পোত। শুধু একজন মানুষকে স্থান দেওয়ার মতই স্বল্প পরিসর। অনেকটা কেঠো চোঙার মত দেখতে। লম্বায় সাত ফুট। অল্প-শক্তির অগ্রতাড়ন জেট অর্থাৎ প্রোপালসন জেট লাগানো। ওপরের দিকে চালকের হাত রাখার জন্যে অনেকটা অ্যাকর্ডিয়ন বাদ্যযন্ত্রের মত দেখতে দুটো হাতা আছে দুদিকে। সাধারণত আপনার হাত দুটো থাকে সুটের ভেতরের দিকে। বুকের সামনে রাখা হস্তচালিত নিয়ন্ত্রণগুলো নাড়া-চাড়া করেই সুটকে খুশীমত এদিকে ওদিকে চালান আপনি।

সম্পূর্ণ নিজস্ব মহাকাশ-পোতের ভেতরে জাঁকিয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে পাওয়ারের সুইচটা টিপে দিলাম। তারপর, যন্ত্রপাতির ক্ষুদে প্যানেলটার কাঁটাগুলো ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে নিলাম। নিশ্চয় শুনে থাকবেন, সুটের ভেতর সেঁধোনোর সময়ে মহাকাশ-মানুষেরা প্রায় বিড় বিড় করে একটা শব্দ আওড়াতে থাকে। এই জাদু শব্দটা হলো FORB। শব্দটা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনে পড়ে যায় Fuel, Oxygen, Radio আর Battery—এই চারটি জিনিস ঠিক আছে কিনা তা তাদের দেখে নিতে হবে। সব কটাই দেখলাম নিরাপদ সীমার মধ্যেই। সুতরাং স্বচ্ছ গোলার্ধটা মাথার ওপর নামিয়ে দিয়ে বহির্জগতের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে

ফেললাম নিজেকে। বেশী দূর যাচ্ছি না, তাই স্যুটের ভেতরকার খুপরিগুলো পরীক্ষা করার প্রয়োজন দেখলাম না। দূরবর্তী কোন অভিযানে বেরোলে খাবারদাবার আর বিশেষ কয়েকটা যন্ত্রপাতি থাকে এই সব খুপরিতে।

কনভেয়র-বেল্ট-য়ের ওপর দিয়ে কাৎ হয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে নেমে পড়লাম এয়ার-লকে অর্থাৎ বায়ুহীন আর বায়ুময়—এই দুই জগতের মধ্যেকার প্রকোষ্ঠে। এগিয়ে যাওয়ার সময়ে মনে হচ্ছিল আমি যেন উত্তর আমেরিকার একটা রেডইণ্ডিয়ান খোকা। পিঠে করে আমার মা বয়ে নিয়ে চলেছে আমাকে। তারপর পাম্পগুলো চলতে শুরু করল। বায়ুচাপ কমে এসে শূন্য হয়ে যেতেই খুলে গেল বাইরের দিকের দরজা। এয়ার-লকের মধ্যে যতটুকু বাতাস তখনও থেকে গেছিল, তারই ধাক্কায় আমি ছিটকে গেলাম তারার জগতের দিকে। খুব আস্তে আস্তে ডিগবাজি খেতে খেতে এগিয়ে গেলাম আমি।

মাত্র বারো ফুট দূরেই রয়েছে আমাদের ষ্টেশন। তবুও কিন্তু আমি একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্বনির্ভর গ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার ছোট্ট জগতের মধ্যে আমি একেবারে একা। ক্ষুদে, সচল, বায়ুনিরোধক সিলিণ্ডারের মধ্যে বন্ধ আমি। সারা ব্রহ্মাণ্ডটা অতি অপরূপ সুষমা নিয়ে দুলছিল চোখের সামনে। তবুও কিন্তু আমার নিজের স্যুটের মধ্যেই আমার নড়াচড়ার কোন ক্ষমতাই নেই। কুশন আঁটা আসন আর নিরাপদ বন্ধনীর বাঁধনে একটু পাশ ফেরারও কোন উপায় ছিল না আমার। অবশ্য সব ক'টা খুপরি আর নিয়ন্ত্রণ আমার হাত-পায়ের নাগালের মধ্যেই থাকায় কাজকর্মের কোন অসুবিধা ছিল না।

মহাকাশে আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে সূর্য। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আপনি একদম অন্ধ হয়ে যাবেন সূর্যের দারুণ প্রখরতায়। তাই, খুব সন্তর্পণে, অত্যন্ত হুঁশিয়ার হয়ে, স্যুটের যে

দিকে 'রাত্ত', সেদিকের কালো ফিল্টার খুলে দিলাম আমি। মাথা ঘুরিয়ে তাকালাম বাইরে, তারাদের পানে। সঙ্গে সঙ্গে হেলমেটের বাইরের দিককার সূর্যাবরণটাকে স্বয়ংচালিত করে দিলাম যাতে স্যুটের ঘুলঘুলির সাথে আমার চোখ যেদিকেই ফিরুক না কেন, তপনদেবের অসহ্য দীপ্তি থেকে সব সময়ে তা আড়ালে থাকে।

অচিরেই দেখতে পেলাম আমার লক্ষ্যবস্তু। ঝকমকে রুপোর একটা কণা। আশপাশের তারার পটভূমিকায় জিনিসটার ধাতব দীপ্তি দেখলেই বোঝা যায় তা নক্ষত্রলোকের কেউ নয়। জেট নিয়ন্ত্রণ পেডালের ওপর টুক করে পায়ের ধাক্কা মারতেই অনুভব করলাম গতিবেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। খুবই মৃদু সেই বেগবৃদ্ধি। কিন্তু তবুও তা বোঝা যায়। বোঝা যায় স্বল্প-শক্তির রকেটগুলো স্টেশন থেকে ঠেলে নিয়ে চলেছে আমাকে। এক নাগাড়ে দশ সেকেণ্ড রকেটগুলো সক্রিয় রাখার পর হিসেব করে দেখলাম গতিবেগ বেশ ভালই উঠেছে! কাজেই বন্ধ করে দিলাম জেটগুলো। এই গতিবেগেই বাকী পথটা পেরিয়ে যেতে মিনিট পাঁচেক লাগবে আমার। তারপর বেওয়ারিশ বস্তুটাকে উদ্ধার করে ফিরে আসতে তত সময়ও লাগবে না।

আর, ঠিক এই মুহূর্তে, অতলস্পর্শ গহ্বরের ভিতরে যাত্রা শুরু করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, জানতে পারলাম ভয়ঙ্কর রকমের একটা কিছু গোলমাল হয়েছে।

স্পেস-স্যুটের ভেতরে কিন্তু কখনও নিথর স্তব্ধতা বিরাজ করে না। সব সময়েই আপনি শুনতে পাবেন অক্সিজেন বেরোনোর মৃদু হিস্ হিস্ শব্দ, পাখা এবং মোটর চলার আবছা ঘস্ ঘস্ আওয়াজ, আপনার নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের ফিসফিসানি—এমন কি, কিছুক্ষণ কান খাড়া করে থাকলে নিজের হৃদযন্ত্রের ছন্দময় ধুকপুকুনিও শুনতে পাবেন। এই শব্দগুলোই বাইরের শূন্যতার মধ্যে বেরোতে না পেরে স্যুটের মধ্যেই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে থাকে। মহাকাশের

মাঝে তারাই হলো জীবনের অলক্ষ্য পটভূমিকা, কেননা শব্দগুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আপনি তখনই সজাগ হয়ে ওঠেন যখন পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে এদের মধ্যে।

সে পরিবর্তনই এখন এসেছিল; পরিচিত শব্দগুলোর সাথে আরও একটা আওয়াজ মিশেছিল যা আমি সনাক্ত করতে পারলাম না। মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে নিয়মিত ব্যবধানে জেগে উঠছিল চাপা ধপ ধপ শব্দটা! সেই সাথে কখনো-সখনো শোনা যাচ্ছিল আরও একটা শব্দ। আঁচড়ানোর শব্দ। ধাতুর ওপর ধাতু ঘষার শব্দ।

নিমেষের মধ্যে আমি মহাভয়ে যেন জমে বরফ হয়ে গেলাম। দম বন্ধ করে শুধু চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চেষ্টা করলাম অজানা অচেনা পরদেশী শব্দটার অবস্থান নির্ণয় করতে। কন্ট্রোল-বোর্ডের মিটার-গুলো থেকে কোন সূত্র পাওয়া গেল না। সব ক'টা কাঁটাই পাথরের মত অনড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল স্কেলগুলোর ওপর। লাল বাতিগুলোর দপ্‌দপে জ্বলা-নেভাও দেখতে পেলাম না—আসন্ন বিপদের সময়ে এরাই হুঁশিয়ার করে তোলে মহাকাশ-যাত্রীকে। এই সব দেখেই একটু সান্ত্বনা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তা খুব বেশী নয়। এ ধরনের ব্যাপারে আমার সহজাত প্রবৃত্তির ওপরেই আস্থা রাখার শিক্ষাই আমি পেয়েছিলাম অনেকদিন আগে। এদেরই বিপদজ্ঞাপক সঙ্কেত-চমকে এবার বিমূঢ় হয়ে পড়লাম আমি। বার বার এরাই আমাকে হুঁশিয়ার করে তুললে, ফিরে চল, ফিরে চল ষ্টেশনে, আর বেশী দেরী হওয়ার আগেই এ জায়গা ছেড়ে পালাও···

আজও সেই শেষ ক'টা মিনিট আমি মনে করতে চাই না। জোয়ারের জলের মত উচ্ছল ফেনিল আতঙ্ক-বন্যায় ধীরে ধীরে ভেসে গেল আমার মনের দুকূল। ব্রহ্মাণ্ডের রহস্যের সামনে দাঁড়িয়ে যে যুক্তিবত্তা, যে বিতর্ক মানুষমাত্রই খাড়া করে, তার সবই আচ্ছন্ন হয়ে গেল এই প্রলয়ঙ্কর আতঙ্ক-বন্যায়। সেদিনই উপলব্ধি করেছিলাম

উন্মত্ততার সম্মুখীন হওয়া কি জিনিস: এ ছাড়া সে ঘটনাকে আর কোনভাবে বোঝানো সম্ভব নয়।

কেননা, আর সম্ভব ছিল না। সম্ভব ছিল না মনকে চোখ ঠারানোর। সম্ভব ছিল না শিহরণ-জাগানো শব্দটাকে বিগড়ানো-কলকব্জার আওয়াজ বলে চালিয়ে দিয়ে মনের সাথে লুকোচুরি খেলার চেষ্টা। সম্পূর্ণ নিভৃতে নিরালায় থাকলেও, জাগতিক মানবিক বা পার্থিব যে কোন বস্তু থেকে বহুদূরে থাকা সত্ত্বেও, আমি আর একা ছিলাম না। শব্দহীন শূন্যতা আমার কর্ণরন্ধ্রে বহন করে আনছিল জীবনের আবছা কিন্তু নির্ভুল স্পন্দনধ্বনি।

সেই প্রথম, হৃৎপিণ্ড-জমানো মুহূর্তটায় মনে হয়েছিল আমার স্যুটের মধ্যে কিছু একটা ঢোকার চেষ্টা করছে—অদৃশ্য সেই ‥স্তুটি মহাকাশের নির্মম, নিষ্ঠুর, নির্দয় বায়ুশূন্য শূন্যতা থেকে আশ্রয় খুঁজছে আমার স্যুটের ভেতরে। উন্মাদের মত মাথা ঘুরিয়েছিলাম আমি আমার সুদূর বর্মের ভেতরে, সূর্য যেদিকে আছে সেদিককার চোখ-ধাঁধানো, নিষিদ্ধ শঙ্কুটার দিকে না তাকিয়ে সারা ব্রহ্মাণ্ডের যতদূর চোখ যায়, ততদূর দেখেছিলাম বারে বারে। কিন্তু কিছুই নেই। থাকতেও পারে না—কিন্তু তবুও সেই জোরালো আঁচড়ানোর শব্দটা আগের চাইতেও অনেক সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল!

আমাদের সম্বন্ধে অনেক আবোল-তাবোল জিনিস লেখা হলেও জানবেন মহাকাশ-মানুষেরা কুসংস্কারে বিশ্বাসী নয়। এর মধ্যে এতটুকু সত্য নেই। কিন্তু আমার সেই অবস্থায়, যখন যুক্তি-বুদ্ধির ঐশ্বর্য নিঃশেষিত, যখন আচমকা আমার মনে পড়ে গেল ষ্টেশনের অনতিদূরে আমি যেখানে আছি, ঠিক ঐ জায়গাতেই এসে মরণপথের পথিক হয়েছিল বার্নি সামার, তখন কি আমার বিশৃঙ্খল চিন্তার জন্যে আমাকে দোষারোপ করতে পারতেন আপনি?

'অসম্ভব দুর্ঘটনা' বলে যে ঘটনাগুলোর ওপর আমরা যবনিকা টেনে দিই, এও ছিল সেই জাতীয় একটা দুর্ঘটনা। একই সাথে

তিনটে জিনিসে গোলমাল দেখা দিয়েছিল। বার্নির অক্সিজেন রেগুলেটর হঠাৎ যেন ক্ষেপে গিয়ে হু হু করে বাড়িয়ে দিয়েছিল বায়ুচাপ, অতিরিক্ত বায়ু বার করে দিয়ে বায়ুর সমতা বজায় রাখার সেফটি-ভাল্‌বটিও বিগড়েছিল সঙ্গে সঙ্গে—এবং হঠাৎ ভেঙে গেছিল একটা খারাপ সন্ধিস্থল। এক সেকেণ্ডের ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশের মধ্যেই ওর স্যুট খুলে গিয়েছিল মহাকাশের মধ্যে।

বার্নিকে আমি চিনি না। তার সঙ্গে জীবনে আলাপ হয় নি আমার। কিন্তু আচম্বিতে তার পরিণতি যেন অপরিসীম গুরুত্ব নিয়ে দেখা দিল আমার মধ্যে। আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। ভয়াবহ একটা ধারণা গুঁড়ি মেরে ঢুকে পড়েছিল আমার মনের মধ্যে। এ ধরনের জিনিস নিয়ে কেউ অবশ্য আলোচনা করেন। জখম হলেও একটা স্পেস-স্যুটের দাম এত বেশী যে তা ফেলে দেওয়া যায় না, জখম হওয়ার ফলে স্যুটের ভেতরকার মানুষটি নিহত হলেও নয়। আবার তা সারিয়ে নেওয়া হয়, নতুন ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হয়, তারপর দেওয়া হয় আর কাউকে···

স্বদেশ পৃথিবী থেকে অনেক, অনেক দূরে তারাদের মাঝে গতায়ু হয় যে মানুষ, তার আত্মা যায় কোথায়? তুমি কি তাহলে এতদিন এখানেই ছিলে, বার্নি? তোমার হারিয়ে যাওয়া অনেক দূরের বাড়ীর সঙ্গে যে জিনিসটির এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সেই সর্বশেষ বস্তুটিকে আঁকড়ে ধরার জন্যেই কি এখানে তুমি ওৎ পেতে ছিলে সুদীর্ঘকাল ধ'রে?

চারদিক থেকে ঘিরে আসা নৈশ-দুঃস্বপ্নের সাথে প্রাণপণে লড়াই চলছে আমার মনের। আঁচড়ানোর আর মৃদু-নরম হাতড়ানোর শব্দগুলো এবার যেন দশদিক থেকেই আসতে শুরু করেছে। নিমজ্জমান ব্যক্তির মতই শেষ আশাটিকে আঁকড়ে ধরলাম আমি। নিজের মস্তিষ্কের সুস্থতা বজায় রাখতে হলে এখন শুধু আমার প্রমাণ করা দরকার যে এ স্যুট বার্নির স্যুট নয়—যে ধাতব দেওয়ালের আবরণে আমি বন্দী, তা কোনদিনই অন্য কারও কফিন হয়ে দাঁড়ায় নি।

বেশ কয়েকবার চেষ্টা করার পর ডানদিকের বোতামটা টিপতে পারলাম আমি। জরুরী বেতার-তরঙ্গের সুইচ টিপে দিলাম আমার প্রেরক-যন্ত্রে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিলাম—স্টেশন! বিপদে পড়েছি আমি! রেকর্ড ঘেঁটে আমার সুটের ইতিহাস কি ছিল, তা দেখুন, আর—

কথাটা আর কোনদিনই শেষ করতে পারি নি। সবাই বলে আমার আর্ত চীৎকারে সেদিন রীতিমত জখম হয়ে গেছিল মাইক্রো-ফোন। কিন্তু আপনিই বলুন, আশপাশের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় স্পেস-সুটের মধ্যে যে মানুষটি একেবারেই একাকী, হঠাৎ যদি কিছু একটা খুব নরমভাবে, আলতোভাবে তার ঘাড়ের পেছন দিকে চাপড়াতে থাকে, তখন কোন মানুষ আর্ত চীৎকার না করে থাকতে পারে কি?

নিরাপদ বন্ধনী থাকা সত্ত্বেও নিশ্চয় সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলাম আমি, দড়াম করে আছড়ে পড়েছিলাম কন্ট্রোল-প্যানেলের ওপরের কিনারায়। মিনিট কয়েক পরে উদ্ধারবাহিনী এসে যখন পৌঁচেছিল, তখনও আমি অচেতন ছিলাম। আর, কপালের ওপর ফুটে উঠেছিল একটা লাল দগদগে ক্ষত চিহ্ন।

আর তাই, সারা স্যাটেলাইট রিলে সিস্টেমের মধ্যে, আমিই শুধু জানি আসলে সেদিন কি ঘটেছিল। ঘণ্টাখানেক পরে জ্ঞান ফিরে আসার পর দেখেছিলাম আমাদের গোটা মেডিক্যাল ষ্টাফ এসে জড়ো হয়েছে আমার বিছানার চারপাশে। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ সময় আমার দিকে তাকানোর মত কোনরকম মাথাব্যথাই দেখলাম না কোন ডাক্তারের। তিনটে ছোট ছোট সুন্দর বেড়াল ছানার সঙ্গে খেলাধূলায় রীতিমত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল ডাক্তাররা। আমাদের টমি, যার নামকরণটাই হয়েছে একটা বিরাট ভুল, শাবক তিনটিকে অতি যত্নে, অতি নিভৃতে লালন-পালন করেছিল আমারই সুটের তিন নম্বর নিরালা খুপরিটিতে।

অস্ত্র প্রতিযোগিতা

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

আগেও বলেছি, হ্যারি পার্ভিসকে টেক্কা মারবার মত বক্তা এখনো পাওয়া যায়নি। 'হোয়াইট হার্ট' মদের আড্ডায় সে আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। হ্যারি পারভিস বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের একটি খনি তাতে সন্দেহ নেই—কিন্তু এত খবর সে পায় কোত্থেকে বলতে পারেন? রয়াল সোসাইটির অত সদস্যর সঙ্গে তার দহরম মহরম ঘটে কি করে সেটাও একটা প্রশ্ন। অনেকে ওর গালগল্পর একবর্ণও বিশ্বাস করে না। অতটা বাড়াবাড়িও ভাল নয়। বিল টেম্পলকে সেই কথাই বলছিলাম।

'হ্যারি পারভিসকে তোমরা অষ্টপ্রহর দাঁতে পিষছো। অথচ, মজা জোগাতে তার ত্রুটি নেই।'

বিল খেঁকিয়ে উঠল—'ওসব কথা বাইরে গিয়ে বলো।' হ্যারির খানকয়েক সিরিয়াস গল্প নাকি কোন এক আমেরিকান সম্পাদক ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে—কারণ গল্প পড়ে মজা পাওয়া যায়নি—হাসিও আসেনি।

বাইরে তখন বরফ পড়ছে। জানলা দিয়ে তুষারপাতের দৃশ্য দেখে ঝটিতি বললে বিল—'থাক, থাক, আজকে আর বাইরে গিয়ে কাজ নেই। গরম পড়লে যেও। আপাততঃ আর এক গেলাস জুস খাবার ইচ্ছে থাকলে বলো।'

'ধন্যবাদ,' বললাম আমি। 'শুধু আনারস কেন, তার সঙ্গে জিন পর্যন্ত খাবো তোমার পকেট খসানোর জন্য।'

এর বেশী কথাবার্তা এগোলো না। হঠাৎ ঘরে ঢুকল হ্যারি পারভিস—সঙ্গে এক অচেনা ভদ্রলোক।

'হ্যালো, ফ্রেণ্ডস! আলাপ করিয়ে দিচ্ছি—আমার বন্ধু সলি ব্রামবার্গ। হলিউডের সেরা স্পেশাল-এফেক্টস ম্যান।'

বিরস বদনে সলি বললে—'হলিউডের মধ্যে আর নেই—এখন বাইরে।'

'ঐ হল গিয়ে। বন্ধুগণ, সলি এসেছে বৃটিশ ফিল্ম শিল্পে ওর প্রতিভার ভেল্কী দেখাতে।'

'বৃটিশ ফিল্মে শিল্প আছে নাকি? স্টুডিওর আশে পাশে ঘুরলে সেরকম তো মনে হয় না!' সলির মন্তব্য।

'আছে হে, আছে। সেরকম রমরমা না থাকলেও, আছে। প্রমোদকর চাপিয়ে দেউলে করতে বসেছে সরকার—আবার অর্থ সাহায্য দিয়ে বাঁচাতেও চাইছে। এদেশে কাজ কারবার ঐ ভাবেই হয়। হেই, ভিজিটরদের খাতা কই? দু গেলাস মালঝালও দিয়ে যেও। সলির দিনকাল বড় খারাপ যাচ্ছে—তাকত চাই।'

মিস্টার ব্রামবার্গ লোকটার চেহারা এমনিতেই নেতিয়ে পড়া কুত্তার মত। তাছাড়াও যেন মাথার ওপর দিয়ে একটা ঝড় গেছে। খুব কষ্ট পেয়েছে। ভদ্রলোকের সার্টের কলারটা বোতাম দিয়ে বুকের মাঝখানে লাগানো। সুটখানা দেখবার মত। ব্যাপারটা কি বুঝলাম না। মার্কিন বিরোধী কথাবার্তা শুরু হলেই গেছি—এখুনি তুবড়ি ছোটাবে আমাদের আদরের কমুনিস্ট—এই মুহূর্তে অবশ্য সে কোণে বসে দাবা খেলায় মত্ত।

সহানুভূতি যেন উথলে উঠল প্রত্যেকের স্বরে। জন তো বলেই ফেলল—'বলেছো ভাল। পেট খালি করার একটা সুযোগ তো পাবে। একজনেরই বক্তৃতা শুনে শুনে কান পচে গেছে—নতুন লোকের কথা মন্দ লাগবে না।'

ঝটিতি জবাব দিল হ্যারি—'অত বিনয় দেখিয়ো না জন। তোমার বকবকানি শুনে শুনেও কিন্তু এখনো কান পচেনি আমার। কিন্তু সলি কি রাজী হবে নিজের কথাই গোড়া থেকে শুরু করতে?'

সলি বললে—'আমি পারব না। তুমিই বল।'

আমার কানে কানে জন বললে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—'আমি জানতাম শেষ পর্যন্ত ওই বলবে।'

'কোত্থেকে শুরু করব বলো? লিলিয়ান রস যখন তোমার ইন্টারভিউ নিতে এল, তখন থেকে বলি?'

শিউরে উঠে বললে সলি—'আরে না! যেখান থেকে হোক আরম্ভ কর, ঐখান থেকে ছাড়া। 'ক্যাপ্টেন জুম' সিরিয়াল তোলার সময় থেকেই শুরু এই কাহিনীর।'

কে যেন বাজখাই গলায় বলে উঠল—'ক্যাপ্টেন জুম! কি সর্বনাশ, আপনিই সেই অকথ্য ছ্যাবলামির স্রষ্টা?'

হ্যারি অমনি মোলায়েম সুরে বললে—'কি আশ্চর্য! এত ঝট করে কারো পিণ্ডি চটকানো উচিত নয়। সমালোচনা যাকে তাকে করা যায় না। খেটে খেতে হবে তো? চাকরী করতে গেলে অমন অনেক কিছু করতে হয়। তাছাড়া, ক্যাপ্টেন জুম ছবি বাচ্চাদের ভালো লাগে। বড়দিনও এসে গেলো। তাদের বুক ভেঙ্গে দিতে মন চায়?'

'ক্যাপ্টেন জুম' বাচ্চাদের ভালো লাগলে তাদের ঘাড় ভেঙ্গে ছাড়ব, এই বলে দিলাম।'

'কি অসংযত কথাবার্তা! সলি, আমার বন্ধুর হয়ে ক্ষমা চাইছি। প্রথম সিরিয়ালটার নাম কি ছিল যেন?'

'ক্যাপ্টেন জুম এবং মঙ্গলের ভয়ংকর।'

'ঠিক, ঠিক। ভাল কথা, মঙ্গলের সব কিছুই ভয়ংকর হতে যাবে কেন বলতে পারো? ওয়েলস লোকটাই যত নষ্টের মূল—শুরু করেছেন তিনিই। এমন একদিন আসবে, আন্তঃগ্রহ মোকদ্দমায় নির্ঘাৎ ঘায়েল হবে পৃথিবী। বেঁচে যাবো যদি প্রমাণ করতে পারি যে, মঙ্গলবাসীরাও আমাদের কড়া কড়া কথা বলেছে।'

'আমি নিজে কিন্তু 'মঙ্গলের ভয়ংকর' দেখিনি এবং সেজন্যে আমি

খুবই খুশী। (কে যেন পেছন থেকে ককিয়ে উঠল—আমি দেখেছি। অনেক চেষ্টা করছি—ভুলতে পারছি না কিছুতেই) ছবির গল্প নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। গল্পটা লিখেছিল তিনজন মাতাল একটা মদের আড্ডায় বসে। গল্পের ভয়ংকরের ভয়ে মদ খাওয়া, না, মদের নেশায় অমন গল্প লেখা—সঠিক বলতে পারব না। মোট কথা, ছবি তুলতে গিয়ে স্পেশাল এফেক্ট সৃষ্টি করার জন্যে ডিরেক্টর তলব করলেন সলিকে—আমাদের গল্প শুরু হল তখন থেকেই।

'প্রথমেই তৈরী করতে হল মঙ্গলগ্রহ। 'কনকোয়েস্ট অফ স্পেশ' নিয়ে আধ ঘণ্টা কাটিয়ে সে একটা স্কেচ ফেলে দিলে ছুতোরদের হাতে। তৈরী হল একটা অতি পরিপক্ক কমলা লেবু—আশে পাশে অগুন্তি নক্ষত্র—সব কিছুই ভাসছে শূন্যে। এই পর্যন্ত বেশ সহজ। কিন্তু কঠিন হল মঙ্গলগ্রহীদের শহর। অপার্থিব ভিন গ্রহীদের স্থাপত্য কল্পনা করা এত সহজ নয় এবং শুধু কল্পনা করলেই হবে না—তার একটা মানে থাকা চাই! শেষ পর্যন্ত মাথা খাটিয়ে তৈরী হল একটা কিম্ভূতকিমাকার বস্তু। দরজা জানলার বালাই না থাকলেও তরবারি যুদ্ধ আর ব্যায়ামবীরদের দেহের ভেল্কী দেখানোর জায়গা রইল প্রচুর। তরবারি যুদ্ধের কথা চিত্রনাট্যেই লেখা ছিল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—তরবারি যুদ্ধ। অতি উন্নত সেই সভ্যতার হাতে রয়েছে অ্যাটমিক পাওয়ার, ডেথ রে, স্পেশ শিপ, টেলিভিশন এবং বহুবিধ আধুনিক সরঞ্জাম। অথচ ক্যাপ্টেন জুম আর কুচুটে সম্রাট ক্লুগ যেই সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হল—ঘড়ির কাঁটা পেছিয়ে গেল শ'দুই বছর পেছনে। সৈনিকরা ভয়াল দর্শন করাল ডেথ রে বাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল বটে—কিন্তু লড়াই তেমন জমল না। মাঝে মাঝে স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি তাড়িয়ে নিয়ে গেল ক্যাপ্টেন জুমকে—বেচারীর প্যান্ট পুড়ে গেল ফুলকি পড়ে—তার বেশী কিছু না। মৃত্যু রশ্মির গতিবেগ আলোর বেশী নয় বলেই ক্যাপ্টেন জুম সেফ চোঁ চাঁ দৌড়ে কলা দেখালো মঙ্গলের ভয়ংকরদের।

'তা সত্বেও কারুকার্য করা রে-গানগুলো দেখে মাথা টিপ টিপ করতে লাগল প্রত্যেকের। হলিউডের এই এক পাগলামি। অতি সামান্য বিষয় নিয়ে এত খুঁটিয়ে দেখে যে কোনো মানেই হয় না। 'ক্যাপ্টেন জুম'য়ের ডিরেক্টরের মাথাতেও পোকা নড়ে উঠল রে-গান সম্পর্কে। ফলে, 'মার্ক ওয়ান' রে-গানের ডিজাইন তৈরী করল সলি। জিনিসটা বাজুকা আর ব্লানডারবাস গাদা বন্দুকে মাঝামাঝি একটা কিছু। দেখে বেশ মনে ধরল পরিচালক মশায়ের। কিন্তু একদিন পরেই ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে স্টুডিওতে এলেন। হাতে একটা লাল প্লাষ্টিকের বিচিত্র রে-গান। তাতে বোতাম আছে, লেন্স আছে, লিভারও আছে।

'বললেন হাঁপাতে হাঁপাতে—সুপার মার্কেট থেকে ছেলে নিয়ে এল। দশ প্যাকেট চুইংগাম কিনলেই একটা ফ্রি দিচ্ছে। দেখতে সুন্দর। কাজেও ভাল। আমাদেরটা একদম রাবিশ!

'বলেই লিভারে চাপ দিলেন। অমনি পিচকিরির মত জল ছিটকে গেল ক্যাপ্টেন জুমের স্পেশশিপের ওপাশে, নিভিয়ে দিল একটা জ্বলন্ত সিগারেট, দৌড়ে এল সিগারেটের মালিক, স্টুডিওর মালিকদের দেখেই বিড় বিড় করে ইউনিয়নের নামে শাসাতে শাসাতে চম্পট দিল নিজের জায়গায়।

'একটু বিরক্ত হয়েই রে-গানটা পরখ করল সলি। বিরক্তি মিলিয়ে গেল ডিজাইন দেখে। হাতে নিয়েই উধাও হল নিজের অফিসে।

'জন্ম নিল মার্ক টু রে-গান। তাতে সব রইল—বাড়তি যুক্ত হল একটা টেলিভিশন স্ক্রীন। হঠাৎ কোনো আপদ সামনে এলে টি-ভি সেট চালিয়ে দিয়ে ছবি তোলার ব্যবস্থাও রইল রে-গানের মধ্যে।

'পরিচালক দারুণ খুশী হলেন। তৎক্ষণাৎ উৎপাদন আরম্ভ হয়ে গেল মার্ক টু-য়ের। সম্রাট ক্লুগের পৈশাচিক কাণ্ডকারখানার জন্যে বিশেষ করে তৈরী হল মার্ক-টু (এ)—মডেল হিসেবে ঈষৎ পৃথক

মার্ক-টু থেকে। দুপক্ষের এক অস্ত্র থাকলে লড়াই জমে না। আগেই বলেছি, প্যানডেমিক প্রোডাকসন্স কোনো ব্যাপারেই খুঁত রাখতে চায় না।

'বেশ চলছিল। অভিনেতারা (আদৌ যদি ওদের অভিনয়কে অভিনয় বলা যায়) দরকার মত খটাখট ট্রিগার টিপে যাবে রে-গানের —আগুনের ফুলকি আর ঝলক পরে উঠবে নেগেটিভে—ডার্ক রুমে বসে জনা দুই লোক তন্ময় হয়ে রইল শুধু তাই নিয়ে। হঠাৎ পরিচালকের মাথায় খেলে গেল আর একটা খাসা মতলব।

'সলিকে ডেকে বললেন—শোনো হে, আমি এর চাইতেও জব্বর গান তৈরী করতে চাই। বলেই ছেলের আনা খেলনা রে-গানের ঘোড়া টিপে দিলেন। সাঁ করে জলের পিচকিরি তেড়ে গেল সলির দিকে। সময়মত ডাইভ না দিলে ভিজে একসা হয়ে যেত বেচারা।

'বলল করুণ কণ্ঠে—বলেন কি! আবার গোড়া থেকে শুটিং হবে নাকি?

'না···না···না···না···না! যা উঠেছে, তা থাকুক। কিন্তু নকল বন্দুক মনে হচ্ছে রে-গানগুলোকে। সামনের হপ্তায় শুটিং হবে 'শামুক-মানবদের ক্রীতদাস' পর্ব। শামুক-মানবরা বন্দুক চালাতে জানে—লিখেছে চিত্রনাট্যে। সুতরাং—

'জন্ম নিল মার্ক থ্রি রে-গান। জিভ বেরিয়ে গেল বেচারী সলির, ডিজাইন অভিনব তো বটেই, কার্যকলাপও অদ্ভুত। পরিচালক যেমনটি চেয়েছিলেন—হুবহু তাই। সলি যে কতবড় মৌলিক আবিষ্কারক—মার্ক থ্রি তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে গেলেই জবাব আসে মুখের মত। কথাটা আমার নয়—প্রফেসর টয়েনবি'র।

'মার্ক-থ্রি উৎপাদন করতে উন্নত ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যেবুদ্ধির দরকার ছিল। ভাগ্যক্রমে জুটে গেল একজন টেকনিসিয়ান—এ ধরনের উদ্ভট দৃষ্টিতে হাত পাকিয়েছে আগেই। মার্ক-থ্রি দৃষ্টির মূলেও সে।

(হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই—গুঙিয়ে উঠে বলল মিস্টার গ্রামবার্গ।) রে-গানের মূল পদ্ধতিটা খুব সোজা ; একটা খুদে কিন্তু শক্তিশালী ইলেকট্রিক ফ্যানের সামনে থেকে যে হাওয়ার ঝড় বইবে—তাতে উড়িয়ে দাও খুব সূক্ষ্ম রাশি রাশি পাউডার। ঠিকমত করতে পারলে এমন দৃশ্য দেখা যাবে রক্ত হিম হয়ে যেতে বাধ্য। অভিনেতারা তাই দেখে শিউরে উঠল—ফলে অভিনয়টা বেশ স্বাভাবিক মনে হল !

'ঠিক তিনটে দিনের জন্যে আনন্দে রইলেন প্রযোজক। তারপরেই ভয়াবহ একটা সন্দেহ উঁকি দিল মগজে।

'বললেন—সলি, খাসা রে-গান দিয়েছ শামুক-মানবদের। ক্যাপ্টেন জুমের প্যান্ট খুলে ছাড়বে। কিন্তু ও বেচারীকেও তো আরো সাংঘাতিক অস্ত্র দিতে হবে।

'এতদিনে সলি বুঝল, অস্ত্র প্রতিযোগিতায় জড়িয়ে পড়ছে সে—গ্রহে গ্রহে যুদ্ধের অস্ত্র জোগাতে হচ্ছে তাকে।

'শুরু হল মার্ক-ফোর প্রস্তুতি পর্ব। একটা অক্সিঅ্যাসিটিলিন বার্নারের ওপর নানারকম কেমিক্যাল ছড়িয়ে দিতেই ঠিকরে এল হরেক রকম রঙ। 'ডিমোসের শেষদিন' পর্ব শুটিং শুরু হতেই স্টুডিওতে রঙীন ছবি তোলা আরম্ভ হওয়ায় সুবিধে হয়ে গেল। তামা বা ষ্ট্রনসিয়াম অথবা বেরিয়াম দিয়ে খুশীমত রঙ বানিয়ে দিল সলি।

'এত করেও আশা মিটল না প্যানডেমিক প্রোডাকসন্সের। মাইকেল এঞ্জেলো, রেমব্রানডট, টিটিয়ানের চাইতেও বেশী খুঁতখুঁতে এই হলিউডের লোকগুলো। মেট্রোগোল্ড্‌ইন মেয়রের সিংহদের মাথায় লেখা 'শিল্পের খাতিরেই শিল্প' দেখে যারা মুখ বেঁকিয়ে হাসেন—তাঁরা যেন একবার হলিউড ঘুরে আসেন।

'সিরিয়াল তুলতে গিয়ে সলির তৈরী সব কটা মার্কের বৃত্তান্ত আমার মনে নেই। একটা থেকে ঠিকরে বেরিয়েছিল রঙীন ধোঁয়ার রিং। আরেকটার হাইফ্রিকোয়েন্সি জেনারেটর থেকে এমন বড় বড়

স্ফুলিঙ্গ ছুটে গিয়েছিল যে আঁৎকে না উঠে উপায় ছিল না—অথচ একদম আঁচ ছিল না ফুলকিগুলোয়। তোড়ে জল বেরিয়েছিল একটা থেকে—আলোর প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল জলে মধ্যে—অন্ধকারে সে দৃশ্য দেখে লোম খাড়া হয়ে গিয়েছিল অভিনেতাদের। সবশেষে এল মার্ক ১২।'

'মার্ক ১৩।' শুধরে দিলে মিস্টার ব্লামবার্গ।

'ঠিক-ঠিক! অশুভ ১৩ বলেই তো এমন সর্বনেশে যন্ত্রের উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছিল। মার্ক ১৩ কিন্তু মুড়ে রাখার মত অস্ত্র নয়। মঙ্গলের চাঁদ ফোবোসের ওপর বসিয়ে পৃথিবীকে খতম করার জন্যে মার্ক ১৩র সৃষ্টি। বৈজ্ঞানিক নির্মাণ পদ্ধতি সলি আমাকে বলেছিল বটে, কিন্তু অত জটিলতা আমার সরল মন ধরে রাখতে পারেনি··· তাছাড়া 'ক্যাপ্টেন জুম'য়ের পেছনে যে সব প্রতিভা কাজ করেছে, আমি তাদের সমকক্ষও নই। মার্ক ১৩ কি করতে পারে—তা বলতে পারি: কি করে করবে, তা বলতে পারব না। পৃথিবীর বায়ুস্তরে অক্সিজেন আর নাইট্রোজেনের মিলন ঘটিয়ে দুর্ভাগা পৃথিবীবাসীদের বারোটা বাজিয়ে দেওয়াই মার্ক ১৩র মূল লক্ষ্য। দু'শ ইঞ্চি টেলিস্কোপ আর বিমান বিধ্বংসী কামান জোড়া লাগালে যা হয়--- মার্ক ১৩ দেখতে তাই। ছ ফুট উঁচু। রেডিও টিউব আছে বিস্তর, আর আছে একটা সাংঘাতিক শক্তিশালী চুম্বক। মার্ক ১৩ কে তৈরী করা হয়েছিল সারি সারি বৈদ্যুতিক দ্যুতি সৃষ্টির জন্যে ম্যাগনেটের দৌলতে দ্যুতিগুলোকে বিভিন্ন আকার দেওয়া যেত। আবিষ্কারক অন্ততঃ তাই চেয়েছিল। তাকে অবিশ্বাস করারও কোনো কারণ দেখি না।

'নিয়তি খুব বাঁচিয়ে দিল সলিকে। মার্ক ১৩ প্রথম চালু করার সময়ে স্টুডিওতে সে ছিল না। সেইদিনই যেতে হয়েছিল মেক্সিকোতে। খবরটা টেলিফোন মারফৎ পেল সেইখানেই বসে।

'মার্ক ১৩ অদ্ভুত কাজ দিয়েছে। ঠিক কি ঘটেছে, তা কেউ জানে

না। স্রেফ দৈব জোরে কেউ মরেনি। ফায়ার ডিপার্টমেন্ট লাগোয়া স্টুডিওগুলোয় আগুন ছড়িয়ে পড়তে দেয়নি। অবিশ্বাস্য, কিন্তু যা ঘটেছে তা মিথ্যে হয় কি করে?

'মার্ক ১৩-কে তৈরী করা হয়েছিল মিথ্যে মৃত্যুরশ্মি বর্ষণের জন্যে—কিন্তু দেখা গেল সত্যিসত্যিই মারণ-রশ্মি বর্ষণ করছে। প্রোজেকটরের মধ্যে থেকে এমন কিছু ছিটকে এসেছে যা স্টুডিওর দেওয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে বাইরে—দেওয়ালের অস্তিত্বই যেন নেই। এক মুহূর্ত পরে দেখা গেল সত্যিই দেওয়ালটা নেই—মস্ত একটা ফুটো দেওয়ালের গায়ে—কিনারা থেকে তখনো ধোঁয়া বেরোচ্ছে! ছাদটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল তারপরেই…

'গোয়েন্দা দপ্তর খুঁজছে সলিকে। আমেরিকার দপ্তর আর পারমাণবিক বিভাগ ধ্বংসস্তূপ নিয়ে পরীক্ষা করছে এই মুহূর্তেও। স্রেফ ভুল করে এমন অস্ত্র বানিয়ে ফেলেছে, সলি যদি তা প্রমাণ করতে পারে, তাহলেই বাঁচোয়া। নইলে সীমান্তের বাইরে থাকাই মঙ্গল।

'সলি কিন্তু নির্দোষ। কিন্তু প্রমাণ কী? 'ক্যাপ্টেন জুন'কে নিয়ে সলি অবশ্য বেদম হয়ে পড়েছিল বুঝি। সে যাই হোক, বৃটিশ ফিল্মে সলির কাজ জুটিয়ে দেবার ক্ষমতা কারো থাকলে এগিয়ে এসো। তবে হ্যাঁ, ঐতিহাসিক ছবি হওয়া চাই। তীর ধনুকের চেয়ে উন্নত কোনো অস্ত্র দিয়ে মাথা ঘামাবে না সলি।'

তারার পাথর

পাঁচশো বছর আগে একটা উল্কা পড়েছিল আপার রাইন-এর তীরে জার্মান নগরী Enzisheim-এর অনতিদূরে। সুরলোকের দেওয়া এই উপহারটিকে গির্জের দেওয়ালের সঙ্গে শেকল দিয়ে বেঁধে রেখে দিলে নগরবাসীরা। ওপরে খোদাই করে লিখে রাখলে এই কটি কথা:

'এই পাথর সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কিছু জানে।

প্রত্যেকেই কিছু কিছু জানে।

কিন্তু কেউই সবকিছু জানে না।'

পামির উল্কাপিণ্ডের ইতিহাস সম্বন্ধে যখনি কোনো কিছু ভাবতে বসি মনের পর্দায় ভেসে ওঠে এই প্রাচীন শিলালিপিটি। সত্যিই তাই। এ সম্বন্ধে অনেক খবরই রাখি আমি, আর পাঁচজন যা জানে তার চাইতে অনেক···অনেক বেশী এই খবরের পরিমাণ। কিন্তু তবুও সবকিছুই যে জানি, এমন কথা বলতে পারি না।

মাসছয়েক আগে উল্কাপাতের প্রথম খবরটা বেরোয় দৈনিকে। খুবই সংক্ষিপ্ত খবর। পামির মালভূমিতে নাকি একটা বিরাট উল্কাপিণ্ড পড়েছে। তৎক্ষণাৎ জেগে উঠল আমার কৌতূহল।

দৈনিকের পরবর্তী খবর পড়ে জানতে পারলাম পামিরে উল্কাপিণ্ড যেখানে পড়েছে, এর মধ্যেই সেখানে একটা অভিযানবাহিনী পৌঁছে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, চার হাজার মিটার উচ্চতা থেকে হেলিকপ্টার দিয়ে পিণ্ডটাকে নামিয়েও আনা হয়েছে। বিরাট পাথর। লম্বায় কমসেকম তিন মিটার। ওজনে চার টনেরও বেশী।

খবরটা পড়া শেষ হওয়ার পর ভাবছি কাল সকালেই নিকোনভকে ফোন করতে হবে এ সম্পর্কে, এমন সময়ে ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোনটা। ফোন করছে নিকোনভ স্বয়ং। নিকোনভ আমার

স্কুলের বন্ধু। পুরো নাম ইয়েভজেনি নিকোনভ। অসাধারণ আত্ম-সংযম আর ব্যক্তিত্বের অধিকারী সে। কোনোদিন তাকে উত্তেজিত হতে বা আত্মসংযম হারাতে দেখিনি আমি। কিন্তু সেদিন তার কথা শুরু হতে না হতেই বুঝলাম সৃষ্টিছাড়া কিছু একটা ঘটেছে। ভাঙা ভাঙা স্বরে কথা বলছিল ও। কথাগুলো এমনই জড়িয়ে যাচ্ছিল যে, বেশ কিছুক্ষণ গেল ও কি বলতে চায় তা বুঝে উঠতে।

শুধু এইটুকুই বুঝলাম : এখুনি, এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে ইনষ্টিটিউট অফ অ্যাসট্রোফিজিক্সে আসতে হবে আমাকে।

একটা গাড়ী ডাকিয়ে আনলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই যেন উড়ে চললাম জনহীন শান্ত পথ বেয়ে।

আলোয় আলোয় ঝলমল করছিল ইনষ্টিটিউট অফ অ্যাসট্রো-ফিজিক্সের লম্বা বাড়ীটা।

ভীমরুলের চাকের মতই গুম্ গুম করছিল গোটা ইনষ্টিটিউট। চাপা উত্তেজনা নিয়ে করিডর বেয়ে ক্রমাগত দ্রুতপায়ে আনাগোনা করছিল বিস্তর লোক। আধখোলা দরজাগুলোর ভেতর দিয়ে ভেসে আসছিল উত্তেজিত কথাবার্তা।

সোজা উঠে গেলাম নিকোনভের অফিসে। চৌকাঠের ওপরেই মুখোমুখি হয়ে গেলাম ওর সঙ্গে।

নিঃশব্দে আমার করমর্দন করলে নিকোনভ। দ্রুত, নার্ভাস, শব্দহীন করমর্দনের মধ্যে দিয়ে ওর বিপুল উত্তেজনার কিছুটা সংক্রামিত করে দিলে আমার মধ্যে।

শুধোলাম —'পামির উল্কা ?'

'হ্যাঁ', উত্তর দিলে ও।

স্তূপাকার কতকগুলো ফোটোগ্রাফ বার করে আমার সামনে মেলে ধরলে ও। সবগুলোই উল্কার ফোটো। সন্তর্পণে পরীক্ষা করলাম সবকটা ছবি। এসব ছবি থেকে কি আশা করা উচিত, তা না জানলেও অসাধারণ কিছু শোনার জন্যে তৈরি করে রেখেছিলাম মনকে।

কিন্তু স্বচক্ষে আর ছবির মধ্যে দেখা ডজনখানেক উল্কার মতই দেখতে এই উল্কাপিণ্ডটি। টাকুর মত লম্বাটে আকারের একটা পাথরের চাঁই। সারাগায়ে অগণিত ছিদ্র। আর প্রচণ্ড উত্তাপে গলে যাওয়া কিনারা।

ফোটোগুলো ফিরিয়ে দিলাম নিকোনভকে। মাথা নেড়ে অদ্ভুত চাপা গলায় ও বললে :

'এটা উল্কা নয়। পাথরের ঢাকনার নিচে রয়েছে একটা ধাতুর চোঙা। আর চোঙার মধ্যে রয়েছে একটা জীবন্ত প্রাণী।'

স্মরণীয় সেই রাতটির দিকে পেছন ফিরে তাকিয়ে আজ আমি সত্যিই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি এই জন্যে যে, নিকোনভের ঐ কথাক'টির অর্থ বুঝে উঠতেই বেশ খানিকটা সময় কেটে গিয়েছিল সেদিন। এমন-কিছু জটিল অর্থ নয়, খুবই সহজ। এতই সহজ যে, সবকিছুই মনে হতে লাগল যেন অসম্ভব, অবাস্তব এবং অলৌকিক।

উল্কাপিণ্ড নয়, মহাকাশ থেকে পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছে এক আশ্চর্য স্পেশশিপ। সাত সেন্টিমিটার পুরু পাথরের আবরণটা ঢেকে রেখে দিয়েছে ভেতরকার ভারী গাঢ় রঙের ধাতুটাকে। নিকোনভের অনুমান (এবং পরে তা সমর্থিতও হয়েছিল), উল্কার সংঘর্ষ থেকে মহাকাশ যানটাকে রক্ষা করার জন্যে এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি রোধ করার জন্যেই পাথর দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়েছে গোটা স্পেশশিপটাকে। পাথরের গায়ে অগণিত ছিদ্র দেখে আমি ভুল ধারণা করেছিলাম। আসলে উল্কার সংঘাত থেকেই সৃষ্টি এ সব ছিদ্র এবং খাঁজের। আর তার সংখ্যা এতই বেশী যে, একবার চোখ বোলালেই বোঝা যায় অনেক ···অনেক বছর ধরে মহাশূন্যে পাড়ি জমিয়েছে এই বিচিত্র যন্ত্রযান।

নিকোনভ বললে—'চোঙাটা নিরেট ধাতু দিয়ে তৈরী হলে বিশ টনের কম হতো না তার ওজন। কিন্তু এ চোঙার ওজন দু'টনের সামান্য বেশী। তিন জায়গায় খুব সূক্ষ্ম তারের গোছা লাগানো আছে। ছেঁড়া তার। দেখে মনে হয় যেন এক সময়ে চোঙার বাইরে

কতকগুলো যন্ত্রপাতি লাগানো ছিল। কিন্তু পৃথিবীর ওপর প্রচণ্ড বেগে পড়ার সময় তা ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে। তারগুলোর ছেঁড়া প্রান্তে গ্যালভানোমিটার লাগিয়ে খুব মৃদু বিদ্যুৎতরঙ্গও ধরতে পেরেছি আমরা।'

আপত্তি জানিয়ে বললাম—'কিন্তু চোঙার মধ্যে যে জীবন্ত প্রাণী আছে, এমন কথা কি করে বলছো তুমি, তা তো বুঝলাম না। আমার তো বিশ্বাস খুব সম্ভব এটা একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।'

চট করে উত্তর দিলে নিকোনভ। বললে—'না, জীবন্ত প্রাণী। কেননা, সে সমানে নক করছে চোঙাটার গায়ে।'

'নক করছে?' হতভম্ব হয়ে প্রতিধ্বনি করলাম ওর কথার।

কাঁপা স্বরে ও বললে—'হ্যাঁ, নক করছে। চোঙার কাছাকাছি যেতে গেলেই ভেতর থেকে কে যেন টোকা দিচ্ছে বার বার। কি এক বিচিত্র উপায়ে ধাতুর আর পাথরেও দেওয়াল ভেদ করে বাইরের সবকিছুই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার চোখের পর্দায়...'

ফোন বেজে উঠল। ছো মেরে রিসিভারটা তুলে নিলে নিকোনভ। তারপরেই দেখলাম মুখের ভাব পালটে গেল ওর।

আস্তে আস্তে রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললে ও—'চোঙাটা নিয়ে আলট্রাসোনিক টেস্ট করা হলো এইমাত্র। ধাতুটা কুড়ি মিলিমিটারের চাইতেও কম পুরু। ভেতরে আর কোনো ধাতু নেই...'

খটকা লাগল আমার। মনে হলো, কোথায় যেন একটা গলতি গেছে ওর যুক্তি ধারায়।

বললাম—'শোনো, শোনো, যে চোঙা লম্বায় তিন মিটারও নয়, যার ব্যাস প্রায় ৬০ সেন্টিমিটার, তার মধ্যে জীবন্ত প্রাণীর বসবাস কি সম্ভব? জল আর খাবারের কথা না হয় বাদই দিলাম। এসব ছাড়াও শীতাতপনিয়ন্ত্রণের আর বায়ুর সমতা রাখার উপযোগী শক্তিশালী কলকব্জার জায়গাও হিসেবের মধ্যে কিন্তু ধরা হয় নি।'

নিকোনভ বললে—'সবুর, সবুর। মিনিট পনেরোর মধ্যেই স্বচক্ষে দেখে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা যাবে'খন।'

একগুঁয়ের মত তবুও বললাম আমি—'কিন্তু তোমার অনুমানে যে কল্পনার বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি থেকে যাচ্ছে, তা তোমায় স্বীকার করতেই হবে, বন্ধু। ও চোঙার মধ্যে মানুষের মত কোনো জীব থাকতেই পারে না।'

'মানুষের মত জীব বলতে কি বোঝাচ্ছো তুমি?'

'যে জীব চিন্তা করতে পারে।'

'হাতপা সমেত তো?' এই প্রথম নিকোনভকে মিটিমিটি হাসতে দেখলাম।

'তা তো বটেই,' জবাব দিলাম আমি।

'এরকম ধরনের জীব অবশ্য স্পেশশিপটার মধ্যে নেই। তবে চিন্তা করতে পারে, এরকম একটা প্রাণী যে আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাকে দেখতে কি রকম, তা বলা শক্ত।'

একমত হতে পারলাম না আমি। ওকে মনে করিয়ে দিলাম বিরাট বিরাট ভৌগোলিক আবিষ্কারের আগে কিভাবে ইউরোপবাসীরা কল্পনা করত অজ্ঞাত দেশের অধিবাসীদের। দু'হাত অথবা কুকুর মাথাওয়ালা মানুষ, বামন, দৈত্য—সবকিছুই স্থান পেয়েছিল তাদের আজগুবি কল্পনাবিলাসে। পরে দেখা গেল অবিকল ইউরোপবাসীদের মতই সৃষ্টি করা হয়েছে অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা আর নিউজিল্যাণ্ডের অধিবাসীদের। জীবনধারার অবস্থা এক, ক্রমবিকাশের আইনকানুনও এক এবং এসবের ফলাফলও অভিন্ন।

নিকোনভ বললে—'খাঁটি কথাই বলেছো। কিন্তু ভায়া, বুঝিয়ে দেবে কি চোঙার ভেতরকার ঐ প্রাণীটার জীবন যে-যে অবস্থার মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে, তা যে পৃথিবীর ওপরকার অবস্থার সমান—এমন ধারণা কি করে গজিয়ে উঠলো তোমার মগজে?'

বুঝিয়ে দিলাম। বায়ুচাপ, উত্তাপ আর বিকিরণের অত্যন্ত সংকীর্ণ

পরিধির মধ্যেই উচ্চতর প্রোটিন-জীবের অস্তিত্ব এবং ক্রমবিকাশ সম্ভব। কাজেকাজেই, ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র একই প্যাটার্নকে মেনে চলতে হবে জীবজগতের বিবর্তনকে।

নিকোনভ বললে—'মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, প্রোটিন সংশ্লেষণ সম্বন্ধে তুমি যা কিছু বললে, সে সম্পর্কে এতটুকু দ্বিমত নেই আমার। কিন্তু জানো তো, স্থাপত্যবিদ্যার অ আ ক খ না জানলেও ইট তৈরীর অনেক কলাকৌশল জানা সম্ভব? স্পষ্ট কথার জন্যে নিশ্চয় মাপ করবে আমায়।'

রাগ করলাম না আমি। সত্যি কথা বলতে কি অন্যান্য গ্রহে জৈব পদার্থের বিবর্তন সম্বন্ধে কোনদিনই বিশেষ কিছু ভাবিনি। বিষয়টা তো আর আমার এখতিয়ারে পড়ছে না।

নিকোনভ কিন্তু থামলো না 'কুকুরের মাথাওয়ালা মানুষের মধ্যযুগীয় কল্পনা কালক্রমে আজগুবি প্রতিপন্ন হয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু আবহাওয়া ছাড়া অন্যান্য অবস্থাগুলো পৃথিবীর সব জায়গাতেই মোটামুটি একরকম। যেখানে তা পালটেছে, সেখানেই প্রকারভেদ দেখা গিয়েছে মানুষের মধ্যে। পেরুভিয়ান অ্যানডিজ-য়ে সাড়ে তিনশো কিলোমিটার উঁচুতে বামন ইণ্ডিয়ানদের একটা জাত থাকে। এদের ওজন গড়ে পঞ্চাশ কিলোগ্রামের বেশী নয়। কিন্তু এদের বুকের বেড় আর ফুসফুসের বিস্তার যে কোন ইউরোপবাসীর চেয়ে গড়ে দেড় গুণ বেশী। পর্বত অঞ্চলের পাতলা বাতাসের মধ্যে জীবনকে মানিয়ে নেওয়ার ফলে আস্তে আস্তে পালটে গেছে দেহযন্ত্রের মূল বৈশিষ্টাগুলো। আচ্ছা, ভাবো তো অন্যান্য গ্রহের অবস্থাগুলো। হুবহু পৃথিবীর মত তা নয়, কেমন? তাহলেই কল্পনা করে নাও সেখানকার জীবজগৎকে। প্রথমেই আসছে মহাকর্ষশক্তি। এ পয়েন্টটা নিশ্চয় ভুলে গিয়েছিলে তুমি। বুধ গ্রহের মহাকর্ষ পৃথিবীর মহাকর্ষের চার ভাগের এক ভাগ। কাজেই বুধ গ্রহে যদি লোক থাকে, তবে তাদের নিম্নপ্রত্যঙ্গগুলো খুব উন্নত না হলেও চলবে।

বৃহস্পতির ওপরে যে মহাকর্ষ, তা পৃথিবীর চাইতে অনেক···অনেক বেশী। কাজেই, আমরা যতদূর জানি এ-ধরনের অবস্থায় সেখানকার মেরুদণ্ডী জীবরা দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্যে দিয়েও খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার মত অবস্থায় কোনোদিনই পৌঁছোতে পারবে না।'

ওর নিরেট যুক্তিধারার মধ্যে একটা জবর অসঙ্গতি লক্ষ্য করে সুযোগ ছাড়লাম না আমি।

বললাম—'মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, তুমি হলে গিয়ে একজন নামকরা জ্যোতিপদার্থবিদ্। নাক্ষত্রিক আবহাওয়ার ভৌতিক বিশ্লেষণের ব্যাপারে এ-যুগের সবচেয়ে বড় পণ্ডিত। কাজেই যতক্ষণ শুধু গ্রহ নিয়ে বক্তিমে দিচ্ছ, আমি পুরোপুরিই একমত তোমার সঙ্গে। কিন্তু ইঁট তৈরীর সব কায়দাকানুনই হয়ত একজনের পক্ষে জানা সম্ভব···, আমি যা বলতে চাই, তা এই ; যে হাত ছাড়া কায়িক শ্রম সম্ভব নয় এবং যে কায়িক শ্রম না থাকলে মানুষই সৃষ্ট হতো না—সেই হাতকেই বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছো তুমি। কেননা, দেহ যদি অনুভূমিক অবস্থায় থাকে, তাহলে দেহের ভর রাখবার জন্যে চারটে হাতপাকেই জমির ওপর রাখতে হবে।'

'তা তো হবেই। কিন্তু শুধু চারটে হাত পা-ই বা থাকতে যাবে কেন ?'

'তার মানে ? তুমি কি হাতওয়ালা মানুষের কথা বলতে চাও ?'

'হয়তো চাই। যে গ্রহে মহাকর্ষ অকল্পনীয়ভাবে বিপুল সে গ্রহের মেরুদণ্ডী জীবদের এইভাবেই বেড়ে ওঠাটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এ ছাড়াও আরও কয়েকটা ভাববার দিক আছে। যেমন ধর না কেন, সে গ্রহের উপরিভাগের অবস্থা। পৃথিবী যদি স্থায়ীভাবে সমুদ্র আচ্ছাদিত থাকতো, তাহলে সম্পূর্ণ অন্য পথে শুরু হতো প্রাণীজগতের বিবর্তন, তাই নয় কি ?'

'জলকন্যা ?' ঠাট্টার সুরে বললাম আমি।

'খুব সম্ভব তাই', অবিচলিত স্বরে বলল নিকোনভ। 'শুকনো

জমির ওপরে জীবন যে গতিতে এগিয়ে চলেছে, তার চাইতে অনেক আস্তে, কিন্তু বিরামবিহীনভাবে উন্নততর পথে এগিয়ে চলেছে সমুদ্র অঞ্চলের জীবন। ব্রহ্মাণ্ডের যেখানেই থাকুক না কেন, যুক্তিনিষ্ঠ প্রত্যেক জীবের কয়েকটি একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস থাকা দরকার : প্রথম, সমুন্নত মগজ ; দ্বিতীয় জটিল স্নায়ুমণ্ডলী ; তৃতীয়, কাজ করা আর চলাফেরার উপযোগী দেহযন্ত্র। কিন্তু এসব থাকা সত্ত্বেও তাদের মোটামুটি চেহারা ঠিক কি রকম হবে, তা বলা বাস্তবিকই কঠিন।'

আমি কিন্তু এত সহজে নুয়ে পড়ার পাত্র নই। তাই গোঁভরে বললাম—'বুঝলাম। কিন্তু আমাদের এই গ্রহে যে যে অবস্থা রয়েছে, হুবহু সেই অবস্থাগুলো অন্য গ্রহে আমাদেরই মত দেখতে চিন্তাক্ষম প্রাণীর অস্তিত্ব না থাকাটাই খুব অসম্ভব, তাই নয় কি ?'

'না, তা অসম্ভব নয়। কিন্তু খুবই অবাস্তব। এক কথায় তাই তো বলতে ইচ্ছে করে There are more things on heaven and earth···'

সেদিনের সব কথা আজ আর মনে নেই। বাধার পর বাধা পড়ছিল—অনবরত বেজে চলেছিল টেলিফোনের ঘণ্টা, হন্তদন্ত হয়ে এন্তার লোক আসা-যাওয়া করছিল ঘরের মধ্যে। আর ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিল নিকোনভ। আজ কিন্তু বুঝতে পারছি কতখানি তাৎপর্য লুকিয়ে ছিল সেদিনকার প্রতিটি কথায়। যতই দুর্বার মনে হোক না কেন আমাদের অনুমান-সিদ্ধান্ত, দুরন্ত কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল বাস্তব সত্য।

সবকিছুই আজ জলের মত সহজ মনে হচ্ছে আমার কাছে। অন্য গ্রহজগৎ থেকে সীমাহীন মহাশূন্য পেরিয়ে যদি কোনো আজব যান এসে পৌঁছে থাকে আমাদের পৃথিবীতে, তাহলে সে গ্রহের জ্ঞানৈশ্বর্য নিশ্চয় যে-কোনো পার্থিব ধারণাকে টেক্কা মেরে এগিয়ে গেছে অনেক···অনেক দূরে। এবং শুধু এই কারণেই ঝটিতি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো উচিত নয় আমাদের।

মহাকাশ-ভেষজবিশেষজ্ঞ অ্যাকাডেমির সভ্য আসটাকভ এসে পৌঁছতেই ছেদ পড়লো আমাদের তর্কযুদ্ধে।

সিঁড়ির ওপর থেকেই বাঁজখাই গলায় শুধোলেন উনি—'ইঞ্জিনটা কি ধরনের?'

তারপর কানের ওপর হাত গোল করে রেখে চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে পড়লেন উত্তরের প্রতীক্ষায়।

এ রকম একটা জোরালো প্রশ্ন আমার মুখ থেকে না বেরোনোর জন্যে দারুণ রাগ হয়ে গেল নিজের ওপর। অনেক কিছুই জানা যাবে এই একটি প্রশ্নের উত্তরে! আগন্তুকদের কারিগরি উৎকর্ষের দৌড়, কতদূর থেকে উড়ে এসেছে তারা, মহাকাশে মোট কত সময় কাটাতে হয়েছে তাদের, কোন্ হারের ত্বরণ অর্থাৎ acceleration সহ্য করতে পারে তাদের শরীর…

নিকোনভ বললে—'কোনো ইঞ্জিন নেই। পাথরের তলার ধাতুর চোঙাটা একেবারেই মসৃণ।'

'ইঞ্জিন নেই?' প্রতিধ্বনি করে ওঠেন অ্যাস্টাকভ। বেশ কয়েক মিনিট এই নিয়ে মনে মনে তোলাপাড়া করলেন উনি। সুগভীর বিস্ময় নিবিড় হয়ে উঠল তাঁর চোখের তারায় তারায়। 'কিন্তু সেক্ষেত্রে…সেক্ষেত্রে একটা মহাকর্ষ ইঞ্জিনও তো থাকা দরকার।'

'তা ঠিক', মাথা হেলিয়ে সায় দিলে নিকোনভ। 'এ সমস্যার এইটাই একমাত্র সম্ভাব্য উত্তর।'

আমি শুধোলাম—'মহাকর্ষ দিয়ে জাহাজ চলার শক্তির যোগান দেওয়া কি সম্ভব?'

'খাতাকলমে সম্ভব', জবাব দিলে নিকোনভ। 'এমন কোনো প্রাকৃতিক শক্তি নেই যা মানুষ বুঝে উঠতে পারে না, বা বশে আনতে পারে না। সবই সময়সাপেক্ষ। এটা অবশ্য সত্যি যে আজ পর্যন্ত মহাকর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতে পারি নি। নিউটনের নিয়ম আমাদের মুখস্থ। এছাড়াও, খাতাকলমে আমরা জানি, আলোর

গতিবেগের কাছেই শুধু মহাকর্ষ স্বরণের কোনো জারিজুরি খাটে না। আর কোন খবর আমাদের জানা নেই! এসবের যা মূল্য কারণ, অর্থাৎ মহাকর্ষের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোনো তথ্যই জানি না আমরা।'

আবার ঝনঝন করে উঠল টেলিফোনটা। রিসিভার তুলে নিয়ে সংক্ষেপে কয়েকটি উত্তর দিলে নিকোনভ! তারপর তা নামিয়ে রেখে ঘুরে দাঁড়ালো আমাদের পানে।

'আসুন। ওরা অপেক্ষা করছে।'

করিডোরে বেরিয়ে এলাম আমরা।

এগোতে এগোতে কথা বলে চললো নিকোনভ—'অনেক পদার্থবিদের বিশ্বাস, মহাকর্ষ হচ্ছে 'গ্র্যাভিটন' নামে একটা বিশেষ ধরনের বস্তুকণার ধর্ম। কিন্তু আমি এই অনুমান সিদ্ধান্তকে পুরাপুরি মেনে নিতে পারি না। তাই যদি সত্যি হবে, তাহলে সাধারণ দেহের পরমাণুর নিউক্লিয়স যতখানি ছোট, পরমাণুর নিউক্লিয়সের চাইতে 'গ্র্যাভিটন'এর ঠিক ততখানি ছোট হওয়া উচিত। কাজে কাজেই পারমাণবিক নিউক্লিয়সে এনার্জির ঘনত্ব যতখানি আছে বলে আমরা জানি, এইসব ক্ষুদে ক্ষুদে আকার আয়তনের বস্তুকণার মধ্যে এনার্জির সমাবেশ হবে তার চাইতে অপরিমেয়ভাবে বেশী।'

ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে এলাম আমরা নিচের তলায়। তারপর এগিয়ে চললাম একটা সংকীর্ণ করিডোর বরাবর! একটা অতিকায় ধাতব দরজার সামনে ইনস্টিটিউটের কয়েকজন কর্মচারী অপেক্ষা করছিল। একজন একটা বোতাম টিপে ধরতেই আস্তে আস্তে দরজাটা সরে গেল পাশের দেওয়ালে।

সামনেই দাঁড়িয়েছিল মহাকাশপোতটা! গাঢ় রঙের, কিন্তু বেজায় মসৃণ ধাতুর একটা চোঙা। দুটো ঠেকার ওপর দাঁড় করানো ছিল যানটা। বাইরের পাথরের আবরণের কয়েক জায়গায় ফেটে গিয়েছিল। ফাটা অংশগুলো দেখলাম সরিয়ে ফেলা হয়েছে। চোঙাটার নিচের অংশ থেকে ঝুলছিল তিন গোছা সরু তার।

চোঙার একদম কাছে দাঁড়িয়েছিল নিকোলভ। এক পা এগিয়ে যেতেই ভেতর থেকে ভেসে এল টোকা মারার একটা চাপা শব্দ। কলকব্জার নিয়মিত ছন্দের যান্ত্রিক আওয়াজ নয় এ শব্দ। পরিষ্কার বোঝা যায়, জীবন্ত একটা প্রাণী বসে রয়েছে। জন্তু-টন্তু বলেই মনে হলো আমার। কেননা, আমারাও তো মহাকাশ রকেটে করে বাঁদর, কুকুর, আর খরগোশকে পাঠিয়েছি মহাশূন্যে, তাই নয় কি?

নিকোলভ সরে আসতেই থেমে গেল টোকা মারার শব্দ। থমথমে স্তব্ধতার মধ্যে স্পষ্ট শোনা গেল জোরে জোরে কে যেন শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলছে চোঙার ভেতরে।

আশ্চর্য! ঠিক এই মুহূর্তে বিজ্ঞানের নতুন নতুন কোনো তথ্যই এলো না আমার মগজে। পরে যতবার মনের চোখে দেখেছি এই দৃশ্যকে, ততবার বুঝেছি সেদিনকার প্রতিটি খুঁটিনাটি স্থায়ীভাবে আঁকা হয়ে গেছে আমার মনের পটে। চোখ বুঁজলেও এখনো স্পষ্ট দেখতে পাই প্রখর বিদ্যুৎআলোয় ভেসে যাচ্ছে নিচু সিলিংওলা ছোট্ট ঘরটা! ঠিক মাঝখানে ঝলমল করছে গাঢ় রঙের একটা চোঙা। উদ্বেগ-ঘন উত্তেজিত মুখে অনেক লোক গোল হয়ে ঘিরে রয়েছে এই বিচিত্র চোঙাটিকে।

তৎক্ষণাৎ কাজ শুরু করে দিলাম আমরা। চোঙার ভেতরে কি আছে তা আবিষ্কার করার দায়িত্ব ইঞ্জিনীয়ারদের। আমার আর আসটাকভের দায়িত্ব দু'তরফা জৈব সংরক্ষণের আয়োজন করা। প্রথম, পৃথিবীর জীবাণুর খপ্পর থেকে চোঙার প্রাণীদের রক্ষা করা। দ্বিতীয় স্পেশশিপের মধ্যে যদি কোনো ভয়ানক জীবাণু থেকে থাকে, তবে তার কবল থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখা।

ইঞ্জিনীয়াররা কিভাবে শেষ করলো তাদেব দায়িত্ব, তা হুবহু বলা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। ওরা কি করছে না করছে, তা দেখবার মত সময় আমার ছিল না। এইটুকু শুধু মনে আছে যে চোঙাটাকে ওরা অশ্রুতশব্দ আর গামা বিকিরণ দিয়ে পরীক্ষা করেছিল। আমি

আর অ্যাসটাকভ ব্যস্ত হয়ে রইলাম জৈব দায়িত্ব নিয়ে। কিছুক্ষণ আলোচনার পর স্থির হলো দূর থেকে যন্ত্রপাতির সাহায্য খুলতে হবে চোঙাটিকে। অতি-বেগনি রশ্মি দিয়ে ভরিয়ে রাখতে হবে গোটা চেম্বারটা।

পুরোদমে কাজ করে চললাম আমরা। সবসময়ে মনের মধ্যে এক চিন্তা—কয়েক ফুট দূরেই চোঙার মধ্যে বন্দী হয়ে রয়েছে একটা জীবন্ত প্রাণী; আমাদের সাহায্যের প্রতীক্ষায় ছটফট করছে বেচারী। মানুষের পক্ষে যা যা করা সম্ভব তার কিছুই করতে বাকি রাখলাম না আমরা।

যে ধাতব আচ্ছাদন দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছে স্পেশশিপটার ভেতরকার কলকব্জাকে, যন্ত্রপাতির সাহায্যে একটা হাইড্রোজেন বার্ণার দিয়ে সন্তর্পণে সেই ধাতব বহিরাবরণ কাটতে শুরু করলাম। ঘরের কনক্রীট দেওয়ালের গায়ে ফালি জানালা দিয়ে অবাক হয়ে দেখতে লাগলাম ভেতরকার যান্ত্রিক হাতগুলোর বিস্ময়কর তৎপরতা! চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না যে, কতখানি নিখুঁতভাবে চুলচেরা হিসেবে কাজ করতে পারে এই বিশাল বিশাল কলের হাতগুলো। ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগল বার্ণারের শিখা: এক এক সেন্টিমিটার এগোয়, আর ছুরি দিয়ে মাখন কাটার মতই কেটে যেতে থাকে ভিন্-গ্রহের সেই অদ্ভুত অসাধারণ ঝকঝকে চাদরটা। তারপর এক সময়ে সরিয়ে ফেলা সম্ভব হলো চোঙার তলাটা।

ভেতরে ছিল একটা জীবন্ত বস্তু। প্রাণীও বলা যায় তাকে। একটা মানবিক মগজ। জীবনের স্পন্দনে স্পন্দিত সেই মগজ। 'মগজ' শব্দটা ব্যবহার করলাম উপযুক্ত শব্দের অভাবে। চোখের সামনে সেদিন যে জিনিসটা দেখলাম, তাকে এককথায় বুঝিয়ে বলার মত শব্দ আমার ভাঁড়ারে নেই। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো যেন বিবর্ধিত আকারের একটা মানুষের মগজ দেখছি চোখের সামনে। আরও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে ভুলটা ধরতে পারলাম। একটা মগজেরই

অংশ এটা। এর সঙ্গে যা ছিল না, তা আমরা পরে আবিষ্কার করেছিলাম। মানুষের আবেগ অনুভূতি আর সহজ প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে যে কেন্দ্রগুলি, মগজের সেই বিশেষ বিভাগগুলোই ছিল না ভিন্‌-গ্রহের এই 'মগজে'। আরও একটা প্রভেদ লক্ষ্য করেছিলাম। মানুষের মগজের মত অগণিত 'চিন্তা'-কেন্দ্র ছিল না এর মধ্যে। কয়েকটা মাত্র ছিল এবং তাও রীতিমত বিবর্ধিত আকারে।

সঠিকভাবে বলতে গেলে জিনিসটা আসলে একটা নিউট্রন কম্‌পিউটিং মেশিন। তফাৎ শুধু এই যে, ইলেকট্রনিক ডায়োড আর ট্রায়োড-এর জায়গা জুড়ে রয়েছে একটা কৃত্রিম মগজের উপাদান। ছোটখাট বিস্তর নিদর্শন দেখেই চকিতে আমি তা অনুমান করতে পেরেছিলাম। পরে আমার ধারণাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

অনেক দূরে, কোনো এক অজানা গ্রহে, আমাদের বৈজ্ঞানিক কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে সেখানকার বিজ্ঞানীদের কীর্তিকলাপ। পৃথিবীতে আমরা সবে সহজতম প্রোটিন অণুকে সংশ্লেষণ করতে শুরু করেছি। আর, তারা কিনা এর মধ্যেই সংশ্লেষণ করে ফেলেছে জটিলতম জৈব উপাদানকে। আমরা জৈবরসায়ন বিজ্ঞানীরাও রাশি রাশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছি এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে। কিন্তু তার ধারেকাছেও পৌঁছোতে পারিনি এখনও।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, স্পেশশিপটার ভেতরকার জিনিসপত্র দেখে বাস্তবিকই তাজ্জব বনে গেলাম সবাই। শুধু অ্যাসটাকভ ছাড়া। সবার আগে সে-ই কথা বলার শক্তি ফিরে পেল।

সেকি চিৎকার—'এইবার কি হয়! ঠিক যেরকমটি ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলাম! দু'বছর আগে কি লিখেছিলাম, তা এবার মনে পড়বে নিশ্চয়···মানুষের পক্ষে খুবই বেশী এই আন্তর্নক্ষত্র দূরত্ব। ব্রহ্মাণ্ডের এক দ্বীপ থেকে আর এক দ্বীপে যেতে হলে তাই পুরোপুরিভাবে স্বয়ংনিয়ন্ত্রিত মহাকাশ জাহাজ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। স্বয়ংক্রিয়! স্বয়ংনিয়ন্ত্রিত! ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, তাই নয়? না,

না, সে তো জটিল কলকব্জা। ইলেকট্রনিকের প্রশ্নই উঠতে পারে না। সব কলকব্জার চাইতে বা সেরা, উন্নত আর নিখুঁত—সেই 'মগজ' দরকার এই সব স্পেশশিপে। দু'বছর আগে এই কথাই লিখেছিলাম আমি। কিন্তু কয়েকজন জৈবরসায়ন-বিজ্ঞানী একমত হতে পারেন নি আমার সঙ্গে। তখনই বলেছিলাম আমি, এক নক্ষত্র থেকে আর এক নক্ষত্রে পাড়ি দিতে গেলে দরকার বায়ো-অটোমেটন, স্বতশ্চল জৈবযন্ত্র বা কিনা কোষ সৃষ্টি করে বেঁচে থাকতে সক্ষম হবে...'

বাস্তবিকই বছর দুই আগে এই আইডিয়া নিয়ে একটা নিবন্ধ প্রকাশ করেছিল আসটাকভ। স্বীকার করছি, গোটা আইডিয়াটাই রীতিমত অবাস্তব আর আজগুবি মনে হয়েছিল আমার কাছে। কিন্তু ভুল ওর হয় নি। জটিলতম আর উন্নততম উপাদান—মগজের টিস্যু অর্থাৎ কলা সংশ্লেষণ করবার সম্ভাবনাকে কল্পনার চোখে দেখতে পেয়েছিল ও। বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে একলাফে কয়েক শতাব্দী এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুদূর-প্রসারী স্বপ্নে বিভোর হয়ে গিয়েছিল সে...।

একটা জিনিস আমাদের স্বীকার করা দরকার। আমরা বিজ্ঞানীরা সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে কাজ করতে করতে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ সবার সামনে তুলে ধরার উপযোগী কল্পনাশক্তিকেও হারিয়ে ফেলি। বর্তমান আর হাতের কাজ নিয়ে এত বেশী তন্ময় হয়ে থাকি যে, আগামী যুগ কি রকম হবে, তা দেখবার মত দূরদৃষ্টির প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হই।

আমিও বিশ্বাস করিনি আসটাকভের আইডিয়াকে। বায়ো-অটোমেটন তৈরি করতে গেলে কতকগুলো দারুণ জটিল সমস্যার সমাধান করা দরকার। প্রোটিনের উন্নততম আকারকে সংশ্লেষণ করতে হবে আমাদের, জৈব-ইলেকট্রনিক পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করার কায়দা-কানুন শিখতে হবে, জীবন্ত আর জড় পদার্থকে একই সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার মত অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে। এ সবই নিছক ফ্যানটাসি ছাড়া আর কিছুই মনে হয়নি আমার কাছে। আর তবুও কিনা আমাদের চোখের সামনেই দেখছি সেই দূর ভবিষ্যতকে। এটা

অবশ্য সত্য যে, যা দেখছি তা আমাদের নয়, অন্য কোনো গ্রহের ধীমান মানুষের অপরিসীম প্রচেষ্টার ফল ; কিন্তু তবুও তা একটি মাত্র মহান সত্যকেই সুদৃঢ় করে তুলছে : বৈজ্ঞানিক জ্ঞানাধারের কোনো সীমা নেই ; উপলব্ধি করতে পারা যায় না, এরকম কোনো দুরন্ত দুর্বার আইডিয়াও সৃষ্টি হতে পারে এ ব্রহ্মাণ্ডে।

চোঙার ভেতরকার আবহমণ্ডল সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না আমরা। কৃত্রিম মগজটার ওপর আমাদের আবহমণ্ডলের কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সে সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম। কাজে কাজেই তৈরি ছিল বায়ুপ্রচাপের যন্ত্রপাতি আর গ্যাসের আধারগুলো। চোঙার ভেতরকার আবহমণ্ডলের সঙ্গে সীলকরা চেম্বারের আবহমণ্ডলের কোনোরকম পার্থক্য যাতে না থাকে, সে আয়োজনের ত্রুটি রাখিনি। চোঙাটা খুলে ফেলার পর দেখা গেল ভেতরকার আবহমণ্ডলের পাঁচ ভাগের এক ভাগ হলো অক্সিজেন। বাকী চার ভাগ হিলিয়াম। বায়ু চাপ পৃথিবীর বায়ুচাপের চাইতে দশভাগের এক ভাগ বেশী। তখনও ধুকধুক করে স্পন্দিত হয়ে চলল মগজটা, আগের চাইতে বোধ হয় একটু দ্রুতবেগেই।

গুনগুন্ করে উঠল বায়ুপ্রচারের যন্ত্রগুলো। ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে লাগল সীলকরা চেম্বারের বায়ুচাপ। শেষ হলো আমাদের গুরুদায়িত্বের প্রথম পর্যায়।

ওপর তলায় নিকোনভের অফিসে গেলাম আমি। ওর হাতলওলা চেয়ারটা জানলার কাছে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তুলে দিলাম জানলার খড়খড়ি। বাইরে গোধূলির বিষাদ-আঁধার নেমে আসছিল শহরের বুকে। আবার এসেছে রাত্রি—ইন্‌ষ্টিটিউটে আমার ডাক পড়ার পর এই হলো দ্বিতীয় রাত। কিন্তু মনে হলো যেন মাত্র কয়েক ঘণ্টা হলো এসেছি এখানে।

পৃথিবীর আবহমণ্ডলের মতই স্পেশশিপের আবহমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ শতকরা বিশভাগ। একি নিছক একটা আকস্মিক

কাকতালীয়, না আরও কিছু? না। যে পরিমাণ অক্সিজেনের মধ্যে জীবিত থাকে মানুষের দেহযন্ত্র, এ-ও হচ্ছে হুবহু তাই। কাজেই মহাকাশযানটার ভেতরে কোথাও নিশ্চয়ই সংবহন পদ্ধতির মত একটা কিছু আছে। কিন্তু মগজের একটা অংশের মৃত্যু হওয়া মানেই তো সংবহন ব্যবস্থা ভেঙে পড়া। সেক্ষেত্রে গোটা মগজটারই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটা স্বাভাবিক।

মাথার মধ্যে এই চিন্তা কিলবিল করে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তুরন্তর করে আমি নেমে এলাম নিচের তলায়।

মনে পড়ছে সেদিন কৃত্রিম মগজটাকে বাঁচাবার জন্যে কি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাই না করেছিলাম। কিন্তু সবই হয়েছিল ব্যর্থ। তাইতো আজ যতই ভাবি সেদিনের কথা ততই এক অপরিসীম তিক্ততাবোধ আর অসহায় অক্ষমতাবোধে অসাড় হয়ে উঠতে চায় সমস্ত তনুমন।

এছাড়া কি-ই বা আর করতে পারতাম আমরা? কিছুই না। দূর মহাকাশ থেকে আসা ভিনগ্রহের ধীমান অধিবাসীদের সৃষ্টি সেই আশ্চর্য মগজটাকে চোখের সামনে একটু একটু করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে দেখা ছাড়া করণীয় আর কিছুই ছিল না। অসহায়ভাবে সেই দৃশ্যই দেখতে হয়েছিল আমাদের।

তলার অংশটা শুকিয়ে গিয়ে কালো হয়ে গেল। শুধু ওপরের অংশটাই ধুকধুক স্পন্দন জাগিয়ে বেঁচে রইল তখনও। কাছাকাছি কেউ গেলেই দ্রুত আর এলোমেলো হয়ে উঠতে লাগল এই স্পন্দন। ঠিক যেন কাতরভাবে ক্ষিপ্তের মত সাহায্য প্রার্থনা করছে মগজটা।

ততক্ষণে আমরা জেনেছিলাম কিভাবে অক্সিজেন সরবরাহ করা হয় মগজটাকে। আমার অনুমানই ঠিক। হিমোগ্লোবিনের মতই একটা রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের সাহায্যে শ্বাসপ্রশ্বাস অব্যাহত রাখত সে। কোন্ কোন্ পদ্ধতি দিয়ে খোরাক যোগানো হয় মগজটিকে, তৈরি হয় অক্সিজেন এবং আবহমণ্ডল থেকে সরিয়ে ফেলা

হয় কার্বনডাই-অক্সাইড—সবই খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছিলাম আমরা।

তবুও রোধ করতে পারলাম না মগজের কোষগুলোর নিশ্চিত বিনাশকে। বহু দূরের কোন্ এক নাম-না-জানা গ্রহে চিন্তাশীল প্রাণীরা এক অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিল; সংশ্লেষণ করেছিল জটিলতম দেহযন্ত্রের উন্নতমত জৈব উপাদান—মগজের উপাদান। নকল মগজ তৈরি করে মহাশূন্যে পাঠিয়ে দিয়েছিল তারা। মগজের এই অগণিত কোষে ব্রহ্মাণ্ডের কত বিপুলরহস্যই না জানি লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। না, কোনো সন্দেহই নেই এ বিষয়ে। কিন্তু তবুও সে রহস্যের অন্দরে প্রবেশ করতে পারলাম না আমরা। চোখের সামনেই আস্তে আস্তে মরে যেতে লাগল মগজটা।

সবরকম চেষ্টাই করেছিলাম আমরা। অ্যান্টিবায়োটিক থেকে শুরু করে সার্জারি পর্যন্ত কিছুই বাদ দিইনি। কিন্তু কিছুতেই কাজ হয়নি।

অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের স্পেশাল কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে সহকর্মীদের আহ্বান করলাম একটা সম্মেলনে। উদ্দেশ্য ছিল এ সম্পর্কে আর কিছু করা যায় কিনা, তা নির্ধারণ করা।

ভোর হতে তখন আর বিশেষ দেরী নেই। বিষণ্ণ নৈঃশব্দ নেমে এসেছিল ছোট্ট কনফারেন্স হলটির মধ্যে। অবসাদ-আঁকা মুখ নিচু করে নীরবে বসে রইলেন বিজ্ঞানীরা।

তারপর যেন ক্লান্তিতে মুছে ফেলার জন্যেই মুখের ওপর দিয়ে হাত চালিয়ে নিলে নিকোনভ।

নিরুত্তাপ নির্বিকার স্বরে বললে—'এ-সম্বন্ধে করবার মত আর কিছুই নেই।'

প্রত্যেকেই সমর্থন জানালে এই শোচনীয় সত্যকে।

পরের ছ'টা দিন বিরামবিহীনভাবে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে গেলাম আমরা। নকল মগজের কয়েকটা কোষ তখনও বেঁচে ছিল। এই সময়ের মধ্যে যা জেনেছিলাম তার সবকিছুই বুঝিয়ে বলা খুবই কঠিন কাজ। নতুন একটা পদার্থের আবিষ্কারই হলো এই ছ'দিনের মধ্যে

সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা। বিকিরণের মধ্যে রেখেও সজীব টিশুর মৃত্যু ঘটতে দেয় না এই আশ্চর্য পদার্থটি।

স্পেশশিপের বাইরের আবরণ খুবই পাতলা হওয়ায় তার মধ্যে দিয়ে পথ করে নেওয়াটা মহাজাগতিক রশ্মির পক্ষে এমন কিছু কঠিন নয়। তাই বায়ো-অটোমেটনের কোষের মধ্যে এমন একটা জিনিসের সন্ধান করেছিলাম আমরা যা এই মৃত্যু-বিকিরণ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে কোষগুলোকে। ফলে পাওয়া গেল বিস্ময়কর এই বস্তুটিকে। পদার্থটার এতটুকু কণা কোষের মধ্যে থাকলেই গোটা দেহটার মধ্যে বিকিরণ প্রতিষেধক ক্ষমতা সৃষ্টি করে। আতীব্র বিকিরণের মধ্যেও তখন কোনো ক্ষতি হয় না জীবন্ত প্রাণীর। এই আবিষ্কারের ফলে আমাদের নিজেদেরও কম উপকার হলো না। এবার থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ মহাকাশযানের নক্সার জটিলতা অনায়াসেই পরিহার করতে পারব আমরা। পারমাণবিক রিঅ্যাক্টরের ভারী পুরু বর্মকেও বর্জন করা চলবে। এই একটিমাত্র আবিষ্কারেই আরও কাছে এগিয়ে এল পরমাণুশক্তিচালিত স্পেশশিপে মহাকাশ পাড়ি দেওয়ার যুগ।

অক্সিজেন নবোৎপত্তির পদ্ধতি অর্থাৎ একই অক্সিজেনকে বার বার ব্যবহার করার পদ্ধতিটাও রীতিমত আগ্রহের সঞ্চার করেছিল বিজ্ঞানীমহলে। স্পেশশিপের মধ্যে পাওয়া গেল কতকগুলো সামুদ্রিক উদ্ভিদ। পৃথিবীর মানুষ কোনোদিন নাম শোনেনি এসব উদ্ভিদের। গুল্মগুলো ওজনে এক কিলোগ্রামেরও কম। অথচ কার্বনডাইঅক্সাইড শোষণ করে নিয়ে অক্সিজেন ছেড়ে এরাই যন্ত্রযানের বাতাসের সমতা বজায় রেখেছিল এতবছর ধরে।

কিন্তু এ সবই খাঁটি জৈব আবিষ্কার। ইঞ্জিনীয়ারমহলেও কম চাঞ্চল্য জাগেনি। বাস্তবিকই জৈব আবিষ্কারের চাইতেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেসব তথ্য। অ্যাসটাকভের অনুমানই ঠিক। মহাকর্ষ ইঞ্জিন দিয়েই শক্তি যোগানো হতো স্পেশশিপটাকে। কলকব্জার মূল সূত্রগুলো অবশ্য এখনও বুঝে উঠতে পারেননি ইঞ্জিনীয়াররা।

তবুও বিনা দ্বিধায় আজ বলা চলে যে, মহাকর্ষের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের পদার্থবিদ্‌দের যা ধারণা, তা আমূল পাল্টাবার সময় এসেছে। পারমাণবিক ইঞ্জিনীয়ারিংয়ের যুগের পরেই শুরু হবে মহাকর্ষ ইঞ্জিনীয়ারিংনের মহাযুগ; এনার্জির আর গতিবেগের বৃহত্তর উৎসের হদিশ পাবে মানুষ।

টাইটানিয়াম আর বেরিলিয়ামের একটা সংকর ধাতু দিয়ে তৈরি স্পেশশিপের বাইরের আবরণটা। সংকর ধাতু যে এরকম হতে পারে, তা আমরা এর আগে কোনোদিন জানতাম না। গোটা আবরণটা একটিমাত্র কৃষ্ট্যাল ধাতু দিয়ে তৈরি! মোটামুটিভাবে বলতে গেলে কোটি কোটি কৃষ্ট্যাল জুড়ে তবেই তো তৈরি হয় আমাদের ধাতু। যদিও খুবই শক্ত প্রতিটা কৃষ্ট্যাল, তবুও পরস্পরের মধ্যে সংসক্তিটা তেমন জোরালো হয় না। কাজে কাজেই আমাদের ধাতু-শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এই একক-কৃষ্ট্যাল ধাতুর ওপর-- বিচিত্র এই সংকর ধাতুর সব ধর্ম এখনও আমরা জানতে পারিনি। শুধু তাই নয়, এই কৃষ্ট্যাল কিভাবে তৈরি হচ্ছে, তা যেদিন নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে, সেদিনই তার অপটিক্যাল প্রপার্টি, স্থায়িত্ব আর সংবহনও চলে আসবে আমাদের হাতের মুঠোয়।

সে যাই হোক, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে আবিষ্কারটির রহস্য এখনও আমরা ভেদ করতে পারিনি, তা হলো এই নকল মগজটি সম্পর্কেই। চোঙার গায়ে লাগানো তিন গোছা তার যে মগজের সঙ্গেই লাগানো ছিল, তা প্রমাণ করলাম আমরা বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। খুবই জটিল একটা বিবর্ধন পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে তারগুলো পৌঁচেছিল মগজে। ছ'দিন ধরে বেজায় সূক্ষ্ম অসিলগ্রাফে ধরা পড়ল বায়ো-অটোমেটনের অনেকরকম তরঙ্গ। মানুষের মগজের তরঙ্গের সঙ্গে কোনো মিলই নেই এসব তরঙ্গের। মানুষ-মগজের সঙ্গে নকল মগজের মূল প্রভেদটা প্রকট হয়ে উঠল এই একটি ব্যাপারেই। আসলে নকল মগজটা একটা সিবারনেটিক পদ্ধতি ছাড়া কিছুই নয়;

শুধু যা ইলেকট্রনিক টিউবের জায়গায় রয়েছে সজীব কোষ। যতই জটিল হোক না কেন এর গড়ন, মূলে তা অপরিমেয়ভাবে সহজ। যদিও বিশেষ বিষয়ে মানুষ-মগজের চাইতে তা অনেক বেশী শক্তিশালী। সেই কারণেই এর বৈদ্যুতিক সংকেতের মধ্যে এমন একটা কোড পাওয়া গেল যা আমাদের প্রায়-চেনা হলেও মানুষমগজের নিদারুণ জটিল বায়োকারেন্টের চাইতেও তা অনেক বেশী দুরূহ।

ছ'দিনে হাজার হাজার মিটারের অসিলোগ্রাফ রেকর্ড করেছি আমরা। কিন্তু এসব সংকেতের মর্মোদ্ধার করা কি সম্ভব হবে আমাদের পক্ষে? যদি হয়, তাহলে কি বার্তা শুনবো তাদের কাছে। সম্ভবত মহাকাশ পাড়ির এক রোমাঞ্চকর কাহিনী, তাই নয় কি?

এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন। আমরা কিন্তু আমাদের পর্যবেক্ষণ পর্ব শিকেয় তুলে রাখিনি। এক নাগাড়ে এই নিয়ে মাথা ঘামানোর ফলে প্রতিদিনই নতুন নতুন আবিষ্কারের আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠছে আমাদের মন।

আজ পর্যন্ত পাথরটা সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কিছু জানে, প্রত্যেকেই কিছু কিছু জানে, কিন্তু কেউই সবকিছু জানে না। কিন্তু সেদিন আর বেশীদূরে নেই যেদিন তারার পাথরের শেষ রহস্যগ্রন্থিও খুলে যাবে আমাদের সামনে।

আর, তখনই মহাকর্ষ-ইঞ্জিনের শক্তিতে শক্তিমান স্পেশশিপ রওনা হবে পৃথিবী থেকে ব্রহ্মাণ্ডের সীমাহীন বিস্তারের মধ্যে দিয়ে। মানুষ পরিচালনা করবে না সেসব মহাকাশপোতকে। কেননা, মানুষের জীবন সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত। কাজেই, আন্তর্নক্ষত্র জাহাজের পরিচালনা ভার থাকবে বায়ো-অটোমেটনদের ওপর। মহাকাশের মধ্যে দিয়ে হাজার হাজার বছর ধরে ভেসে যাবার পর পৌঁছোবে তারা সুদূর কোনো দ্বীপ ব্রহ্মাণ্ডে। তারপর ফিরে আসবে পৃথিবীতে, সঙ্গে নিয়ে আসবে জ্ঞানের অনির্বাণ মশাল।

শেষ